দুই বোন

[বিমুগ্ধ আত্মা : আনেৎ ও সিল্‌ভী]

রমাঁ রোলাঁ

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

প্রথম বাংলা সংস্করণ : ১৯৫৩

তিন টাকা চার আনা

প্রকাশক : বিমল মিত্র, ৩ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : শরৎ দাশ, মডার্ণ প্রিন্টিং সার্ভিস, কলিকাতা-১৮

[এক]

জানালায় বসে আছে আনেৎ আলোর দিকে পিঠ দিয়ে—দিন-শেষের আলো, তার অগ্নি-বরণ রশ্মি প'ড়েছে ওর শুভ্র পেশল গ্রীবার 'পর।

এই মাত্র বেড়িয়ে ফিরেছে ও। বহুদিন, অর্থাৎ পুরো কয়েক মাস পরে আজ ও বেরিয়েছিল প্রথম। সারাটা দিন ভবঘুরের মত বাইরে মাঠে ঘাটে মুক্ত প্রকৃতির বুকে ঘুরে ঘুরে কাটাল, বাসন্তী সূর্যের আলো চিত্ত ভরে করল পান ··মাতাল-করা আলো···নির্জলা তীব্র সুরার মত একেবারে নির্ভেজাল, এমন কি নিষ্পত্র গাছেরও ছায়া নেই সে-আলোতে। পলাতক শীতের পেছনে ফেলে-যাওয়া হিমের রেশ-জড়ান-বাতাসে সে-আলো আরো ঝলমল্, আরো স্বচ্ছ। ওর মস্তিষ্কের মধ্যে গানের গুঞ্জন চল্‌ছে, চলছে শিরায় শিরায় গানের উচ্ছল নৃত্য, নযনে ঝরছে আলোর সহস্র ধারা। নিমীলিত চোখের নীচে পড়ন্ত আলো সোনা আর লাল আলপনা এঁকে দিয়েছে—সোনা আর লালের আলপনা ওর সর্বদেহে।

চেয়ারে বসে আছে আনেৎ, ধ্যানলীনা প্রতিমার মত নিশ্চল। মুহুর্তের জন্য চেতনার জগৎ হতে ছিট্‌কে পড়ে আনেৎ···ডুবে যায় স্বপ্নে ··

নিবিড় বনে-ঘেরা সরোবর। জলের বুকে এক টুকরো আলো—যেন কার চোখ! চার পাশে মাথা উঁচিয়ে বড বড় গাছের সারি, শেওলা-ঢাকা তাদের দেহ। হঠাৎ নাইতে ইচ্ছে হয আনেৎ-এর·· নাইবে আনেৎ···

নিরাবণ শুভ্র দেহ···

শীতল জলের স্পর্শ লাগে পায়ে···ওপরে···আরো ওপরে···হাঁটুতে এসে পৌঁছোয়···। কেমন যেন তীব্র মাদকতা—নেশা একটা···তন্দ্রার আবেশের মত। জলের বুকে সোনালী আলোর আলপনা; তারি মাঝে ওর নিরাবরণ দেহের

প্রতিবিম্ব। আনেৎ দেখে…। একটা নামহীন, অস্পষ্ট লজ্জায় ওর চিত্তে যেন শিহরণ লাগে…ও-চোখ যেন ওর নয়, আর কারো, দেখছে আর কেউ ওর এই অনাবৃত দেহ। লজ্জা ঢাকবার জন্য আরো গভীর জলে নেমে যায়। চিবুকের কাছে এসে পৌঁছোয় চঞ্চল জল—জল নয় যেন এ…জীবন্ত উষ্ণ আলিঙ্গন কারো। শেওলার দল দীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে ওর পা। ছাড়াতে চেষ্টা করে। প্রয়াসে কাদায় পা বসে যায়। জলের ঠিক উপর খানিতে সূর্যের আলো ঘুমিয়ে। রাগে পা ছোঁড়ে আনেৎ। ঘোলা হ'য়ে ওঠে জল—নিষ্প্রাণ, পাণ্ডুর… ঘুমন্ত আলোর ঘুম ভাঙ্গে না তবু।

জলের ধারে ঝুঁকে-পড়া গাছ, তারি একটা শাখা ধ'রে আপনাকে মুক্ত ক'রে নেয়…নিরাবরণ পিঠ ছেয়ে যায় পাতায়।

রাতের ছায়া ঘনায়…

অঙ্গে লাগে শীতল বায়ুর স্পর্শ…

স্বপ্ন টুটে যায়। ক্ষণিকের স্বপ্ন।

সেইন্ট, ক্লাউড্ পাহাড়ের পেছনে সূর্য ডোবে।

সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা নামে পৃথিবীতে…নামে আনেৎ-এর চিত্ত-লোকে।

শান্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ায়, ঠাণ্ডায় কেমন কাঁপন ধরেছে।

কি ছেলেমানুষীই করল আজ। নিজের ওপর রাগ হয় আনেৎ-এর। ঘরে অন্য প্রান্তে আগুনের সামনে গিয়ে বসে ও। মিষ্টি আগুন—রূপে চো নেশা লাগে, চিত্তে লাগে সঙ্গ, দেহে উত্তাপ লাগুক আর নাই লাগুক। খোলা জানালার পথে ভেসে আসে প্রথম বসন্ত-সন্ধ্যার শিশির-ভেজা বাতাস আ তার সাথে ঘুম-পাওয়া পাখীর ঘুম-জড়ান কাকলি। আনেৎ কল্প-লোকে ভে যায়। কিন্তু চোখ দুটি খোলাই রয়েছে এবার। এবারে ফিরে এসেছে ও প্রত্যহের পরিচিত আপন জগতে; পায়ের তলায় পেয়েছে ও বাস্তব ভূমি। এ তো ওর আপন ঘর, আপন নীড়। আনেৎ রিভিয়ে ও, আনেৎ আর কেউ নয়…

আগুনের দিকে একটু ঝুঁকে বসে—লাল আভায় তরুণ মুখ খানি দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। কালো বেড়ালটা আগুনের দিকে মুখ ক'রে লম্বা হ'য়ে শুয়ে আছে

পা দিয়ে ওর সাথে খুনসুড়ি করতে করতে মনে প'ড়ে যায়···মনে প'ড়ে যায় সেই বেদনা, একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য যা ও ভুলেছিল···মনে হয় তারি কথা যে হারিয়ে গেছে···একেবারে হারিয়ে গেছে [মনের পট হ'তে তার ছবি একেবারে মুছে গেছে]।

এখনও শোকের কাল উত্তরায়নি···শোকের রেশ ওর অধর-প্রান্তে আর ললাটে এখনও রয়েছে ; ফোলা চোখের পাতায় রয়েছে সদ্য অশ্রু-প্রবাহের স্বাক্ষর···

কিন্তু কাণায় কাণায় ভরা স্বাস্থ্যে, সতেজ লাবণ্যে, প্রকৃতির বলিষ্ঠ যৌবন-শ্রীর মতই রস-সমৃদ্ধা আনেৎ···বেগবতী, প্রাণৈশ্বর্যবতী, চিরশ্যামা। রূপবতী না হ'লেও দেহ-সৌষ্ঠবে, মাথার সোনালী চুলের রাশে, রোদলাগা গ্রীবার বাদামীতে, নিটোল দুটি গালে শ্রী-মতী আনেৎ। ওর চোখে বিস্ময় আর বিষাদের আবছা কুয়াশার ছেঁড়া ছেঁড়া টুক্‌রো। তারি ফাঁকে ফাঁকে ওর নূতন নূতন প্রকাশ, নূতন নূতন বিকাশের ব্যঞ্জনা। দৃঢ়, পেশল কাঁধ দুটিতে নূতন নূতন ভঙ্গী।

চেয়ারে বসে আছে আনেৎ, অপসৃয়মান প্রিয়-স্মৃতির পথ-প্রান্তে চেয়ে-থাকা বিধুরা বিরহিনীর মত। রিক্ত আনেৎ—অন্তরে একেবারে রিক্ত। বাবার মৃত্যুতে একমাত্র অবলম্বন আর আশ্রয় হারিয়ে আজ ও সর্বস্ব-হারা। তাঁরই স্মৃতি ও হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে জড়িয়ে রাখতে চায়। ওর বাবা রাওল রিভিয়েরের স্মৃতি।

ছ'মাস হ'ল এ পারের হিসেব চুকিয়েছেন রিভিয়ে। কিইবা এমন বয়েস হয়েছিল—ইউরেমিয়ায় দু'দিনেই শেষ হ'য়ে গেলেন। দেহটার ওপর অত্যাচার করেছেন সারা জীবন। গত ক'টা বছর অবশ্য সামলে চলেছেন কিছু—ভাবেননি এ পারের পাট তুলতে হবে এত শিগ্‌গির।

প্যারীর স্থপতি রাওল রিভিয়ে—ভিয়লা রোমাঁর শিষ্য। পরম সুপুরুষ—বুদ্ধিতে খর, উচ্চাশায় উদগ্র, ড্রইংরুম জগতের রাজা আর অফিসিয়েল মহলের দেবতা। সারা জীবন পেয়েছেন বহু মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ; পেয়েছেন উচ্চ পদ—খোঁজেননি তবু পেয়েছেন। না খুঁজে অমনি-পাওয়ার মন্ত্র ওঁর জানা ছিল।

খাঁটি ফরাসী চেহারা। সবার চেনা—ছবিতে, পত্রিকায়, কার্টুনে সবাই দেখেছে, সবাই চেনে। উঁচু কপাল, দুই পাশে উঁচু ; তেড়ে-আসা ষাঁড়ের মত মাথাটা সামনের দিকে ঝোঁকা ; গোল বেরিয়ে-আসা চোখ—উদ্ধত তার দৃষ্টি।

সাদা ঝাঁকড়া চুল পরিপাটি ক'রে ব্রাস্ করা। ঠোঁট হাসিতে বাঁকান আর কামনায় তীক্ষ্ণ, আর তারি নীচে ছোট্ট একটু দাড়ি। বুদ্ধির দীপ্তি আর স্পর্ধিত অবজ্ঞা, আকর্ষণী-শক্তি আর স্নেহের বিচিত্র সংমিশ্রন ওর চেহারায়—আকর্ষণ করে, বহু থেকে ওকে আলাদা ক'রে রাখে।

পারীর শিল্প আর বিলাস-লাস্যের জগতে ওকে চেনে সবাই, অথচ জানেনা কেউ। জানবে কি ক'রে? মনে আর বাইরে রাওল ঠিক দুটো মানুষ। কাজ হাসিলের কৌশল ও জানে এবং তার জন্য ও সমাজের ছাঁচে একেবারে খাপ খাইয়ে বসিয়ে রাখে নিজকে, অথচ ব্যক্তিগত মানুষটা থাকে আড়ালে, কুশল-হাতের রচা গোপন দুর্গে।

দুর্দান্ত উদাস প্রবৃত্তি, বিশ্বের যত দুষ্কৃতি সাবলীল পটুত্বে বেপরোয়া রাওলের স্বভাবের অঙ্গ। এই পটুত্ব ও অর্জন করেছে সাধনা আর প্রযাস দিয়ে অনুশীলন ক'রে। কিন্তু হুসিয়ার রাওল আপনাকে ঢেকে রাখে সাবধানে পাছে হটে যায় মক্কেলের দল।

একটা গোপন মিউজিয়ম ছিল রাওলের। এক আধজন নিতান্ত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গেরই কেবল সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল। সাধারণের রুচি বা নীতির ধার ও মোটে ধারত না অথচ সামাজিক রাওল আর ব্যবহারিক জগতের রাওল একেবারে সকলের সাথে খাপ-খাওযা।

কাজেই অতি-চেনা রাওল অতি-অচেনা থেকে যায় শত্রুর কাছে আর মিত্রের কাছেও। শত্রু? শত্রু কোথায়? শত্রু ওর ছিল না। প্রতিদ্বন্দ্বী দু'একজন ছিল বটে যারা ওর অমন মাথা-তুলে এগিযে যাওযাটা সুস্থ মনে গ্রহণ করতে পারে নি। তাদের অন্তরে দাহ থাকলেও ওর ওপরে রাগ বা বিদ্বেষ ছিল না কারো। এমনি অদ্ভুত ছিল ওর মন ভোলাবার কৌশল যে এই পেছনে-প'ড়ে-থাকা, হেরে-যাওয়ার দলও বিরূপ হওয়া তো দূরের কথা মুখে ভীরু হাসি মেখে হাত জোড় করত ওরই কাছে—অর্থাৎ পা মাড়ালে পর সেই ভীরুরাই পাল্টে ক্ষমা চাইত। দুঃসাহসী রাওল শাঠ্যের মূলধনে মৈত্রী কিনেছে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে—যাদের মাড়িয়ে গেছে তাদের আর যে-মেয়েকে ছেঁড়া কাপড়ের মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তারও।

এহেন রাওলের কিছু পরাজয় ঘটেছিল তার গৃহস্থালীর ক্ষেত্রে। স্ত্রীর চোখ এড়ায়নি—স্বামীর দুমুখো চরিত্র তাকে পীড়া দিল। কিন্তু রাওলের কাছে এটা হলো কেবল স্ত্রীর রুচি-বিকার মাত্র! বিবাহিত জীবনের এই সুদীর্ঘ পঁচিশটে বছরের মধ্যে সে স্বামীকে মেনে নিতে পারেনি। রাওলের মতে তা পারাই উচিত ছিল লক্ষ্মী মেয়ের মত। কিন্তু তা পারলে না মেয়েটা—আত্ম-বিলোপ ঘটাতে সে কিছুতে পারলে না ; না পারলে স্বামীকে আয়ত্ব করতে।

শ্রীমতীর নিষ্ঠা-বোধ ছিল ভারী উগ্র। লায়ন-দেশীয় রূপের মতই ওর ব্যবহারে ছিল নিষ্প্রাণ ঔদাস্য। অনুভূতি তীক্ষ্ণ, তীব্র, প্রবল, কিন্তু লাগাম-আঁটা, রাশ-বাঁধা, এক কোঁটা ছল্‌কে পড়বে না এদিক ওদিক। স্বামীকে হাত করার কলা-কৌশল ও শিখলে না, আর শিখলে না যা হাতের বাইরে তাকে অবহেলায় অগ্রাহ্য করতে। প্রখর আত্ম-মর্যাদা-বোধে নালিশ করলে না কোনোদিন, আবার এদিকে ও যে জানে সব এবং জেনে কষ্ট পাচ্ছে এই কথাটাই লুকিয়ে রেখে আত্ম-সমর্পন করতেও পারলে না। রাওলও অভিমানী [অন্ততঃ ওর বিশ্বাস ছিল তাই], অভিমানে ও এদিকটা ভুলে থাকতেই চাইল। অথচ ভুলতে পারল না স্ত্রীর উদগ্র ব্যক্তিত্ব আর তার প্রকাশ। ভুলতে পারলে না আর তাই ক্রোধও জমতে লাগল স্তরের পর স্তর।

গত দু'বছর থেকে বলতে গেলে ওদের দাম্পত্য-জীবন একেবারে পাঁচিল-তোলা মহলে ভাগ হ'য়ে গেছে। কিন্তু সমাজ আর একমাত্র কন্যা আনেৎ-এর দৃষ্টি থেকে অন্তঃপুরের এ-গ্লানিকে সযত্নে প্রচ্ছন্ন রেখে এসেছে ওরা। এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল : আনেৎ ঘুণাক্ষরেও বাবা মার দ্বিধা-ভিন্ন জীবনের এই ট্রাজেডী জানতে পারেনি। জানতে চেষ্টাও করেনি, ওর রুচিতে বেধেছে। তা'ছাড়া ওর কিশোর মনের অবকাশই বা কোথায় অপরের কথা ভাবার!

রাওল বিভিয়ে মেয়ের বেলাও আপনার যাদু খাটালে এবং সে-যাদুর টানে মেয়েকে টেনে নিল নিজের দিকে। অবশ্য এ জন্য তাকে কোন আয়াস বা প্রয়াস করতে হয়নি ; এবেলায়ও তার সহজ চৌম্বক-শক্তির জয় হ'লো। একদিনের জন্যও মেয়ের কাছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি কথা বলেনি কোনোদিন—

তার বিরূপ কোন ব্যবহারের আভাস পর্যন্ত না। মর্যাদায়, রুচিতে অভিজাত রাওল নির্বিকার রইল। ভাবল, মেয়েই দেখে শুনে বুঝে নেবে। এবং মেয়ে বিচার করলে অনুকূলেই। বাবার মায়া-জালের বাইরে আসার সাধ্য কি তার? তা ছাড়া রাওলের মত মানুষের স্ত্রী হ'য়ে যে মেয়ে আপন হাতে নিজের সুখের ঘরে আগুন দিলে তাকে ক্ষমাই বা করা চলে কি ক'রে? সুতরাং এই অসম-সংগ্রামে প্রথম থেকেই মাদামের হার হ'য়ে থাকল; এবং আগে মরে তিনি এই পরম পরাজয়কে একেবারে চরমের কোঠায় উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে গেলেন। অতএব তারপরে রাওল একেবারে একমেবাদ্বিতীয় এবং একচ্ছত্র সম্রাট আপন রাজ্যের, কন্যার চিত্তলোকেরও।

সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ক'রে ছিল রাওল এই পাঁচটা বছর আনেৎকে—ভালবেসেছে বুক ভ'রে আর অজ্ঞাতসারে সেই স্নেহের সাথে ঢেলেছে আপন চরিত্রের যা বৈশিষ্ট্য, আর ওর সহজ সম্মোহনী মায়া। গত দু' বছর স্বাস্থ্য-ভঙ্গের জন্য বাইরে থেকে একেবারেই নিজেকে গুটিয়ে ফেলতে হয়েছিল রাওলকে। অতএব ওর মোহিনীশক্তির ক্রিয়ার ক্ষেত্র যখন সংকুচিত হ'য়ে এল, কন্যাই নিল সে-স্থান।

কন্যা আর পিতার মাঝখানে দাঁড়াবার না ছিল কেউ আর না ছিল কিছু। আনেৎ-এর সুপ্ত অন্তর-লোকের একমাত্র অধীশ্বর হ'লেন পিতা। দেহের বয়স হয়েছিল বটে ওর তেইশ চব্বিশ, কিন্তু মনের বয়স ছিল পিছিয়ে। সে তখনও কৈশোরের পথ ডিঙিয়ে যৌবনের অভিযাত্রায় বেরয়নি—চলছিল সহজ-ছন্দে সহজ পথে, পেছন থেকে ঠেলা মেরে ওকে জোর কদমে চালায়নি কেউ। ওর সামনে সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ আর চিত্তের দুকূল ছাপিয়ে জীবনের ভরাগাঙ্ করছে টলমল্। সুতরাং এমনি অবস্থায় সবার যা হয়, ওর প্রাণাবেগ মূলধনে বেড়েই চলল—খরচ হলোনা, রইলনা হিসেব নিকেশের তাড়া।

পিতা-মাতা দু'জনের কাছে থেকেই ও পেয়েছিল কিছু না কিছু। আকৃতি হ'লো রাওলের—সেই বিশ্ব-বিমোহী হাসি, যে হাসির শক্তির খবর রাখতনা রাওল নিজেই; আর কৌমার্য-শুভ্রা আনেৎ-এর পক্ষে ভালোই হ'তো অত শক্তি যদি না ধরত ওই হাসি। কিন্তু ওই শক্তি-গর্ভ হাসির ওপরে বিছানো

প্রশান্তির আভাসখানি—তা ওর মায়ের। সুমার্জিত পরিচ্ছন্ন ব্যবহার-সৌষ্ঠবের উত্তরাধিকার ও মায়ের কাছ হ'তে। আর নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতার মধ্যেও যে সুস্থির, পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য—তার উৎসও ওই একই। একের চৌম্বক-শক্তি আর অপরের গাম্ভীর্য—এই দুইয়ের সমাবেশে আনেৎ আরো বেশী মোহময়ী হ'য়ে উঠেছিল। ওর চরিত্রের এই দুই ধর্মের মধ্যে কোনটির যে প্রাবল্য বেশী, তা বলা বড় কঠিন। আসলে ও ঢাকা পড়ে রইল—নিজের কাছেও, অপরের কাছেও। ওর ভেতরকার রহস্যময় জগতের হদিস কেউ পেল না। ইডেন উদ্যানের ও যেন আধ-ঘুমন্ত ইভ্; খোঁজ রাখেনা নিজের বুকের মধ্যে যে সহস্র বাসনা বাসা বেঁধে আছে। তাদের শান্তির নীড়ে কোন হাওয়ার দোলা লাগেনি আজও, ওদের ঘুম ভাঙ্গায়নি কেউ। আনেৎ-এর শুধু হাত বাড়িয়ে দেবার অপেক্ষা—অঞ্জলি ভরবে আপনা হতেই। কিন্তু সে-প্রয়াস ও কখনও করেনি—কারণ বুকের তলাকার কামনার দলের সুখ-গভীর, শান্তি-নিবিড় অস্ফুট কাকলিতে ওর আবেশ লাগে, ঘুম পেয়ে যায় যেন। হাত বাড়াবার কথা মনে থাকে না। হয়তো ইচ্ছাও হয়নি। একি আপনাকে ভোলান? ভোলায় কি মানুষ এমনি ক'রে আপনাকে? হয়ত মানুষ চায় না শান্ত চিত্তাকাশে ঝড় ওঠে। আনেৎও হয়ত চেয়েছিল তাই—চেয়েছিল বুকের মধ্যকার গভীর সাগরটির পাশ কাটিয়ে যেতে। সুতরাং যে আনেৎকে ও নিজে চেনে, চেনে সংসারের মানুস, সে-আনেৎ সুস্থিরা, সুধীরা, বুদ্ধি বিবেচনায় বেশ গোছ-গাছ ক'রে তৈরী মানুষ; শক্ত হাতে আপনাকে লাগাম ক'ষে চালায়; আঁট-সাঁট ক'রে নিয়ম-বাঁধা জীবন; ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য আছে—আছে স্বাধীন বিচার-শক্তি। তবু আজও ওর স্বাধীন ইচ্ছা আর মনের কোন সংঘর্ষ বাধেনি ওর চার পাশের সমাজ আর সংসারের সঙ্গে।

সামাজিক জীবনের কর্তব্য ও ভোলেনি এবং সে-জীবনের থালায় যে আনন্দ-রস পরিবেশন করা আছে তার প্রতি ওর ঔদাসীন্য তো নেইই বরঞ্চ আছে অতি সহজ সুস্থ ক্ষুধা, এবং সেই ক্ষুধায় যা কিছু উপভোগ্য তা ও দু'হাত ভ'রে গ্রহণ করে। কিন্তু তারই সাথে ও চায় সত্যকার কর্মময় জীবন। হাওয়ায় ভাসা জীবন নয়। সুতরাং গভীর অভিনিবেশে ও পড়েছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পড়াও পড়েছে, ডিগ্রীও পেয়েছে দু'টো। বুদ্ধি ওর শানিত,

মার্জিত, জীবন্ত। এবং তাই ওর গতিধর্মী মনের অবলম্বন চাই—অর্থাৎ চাই কাজ। পড়তে ও ভালোবাসে, তবে সখের পড়া নয়, পড়ার মত পড়া—বিশেষ ক'রে বিজ্ঞান। এবং এ বিষয়ে মেধা আছে ওর অসাধারণ। ওর সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতির মধ্যে সর্ব অবস্থায় মাঝপথে চলার একটা সহজ ক্ষমতা ও প্রবণতা আছে। হয়তো সেজন্যই ও সর্বদা একটা কড়া নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে থাকতে ভালোবাসে—যেখানে কোন অস্পষ্টতা নাই, শিথিলতা নাই; যেখানে কোন ভাব-ভাবনা-নীতির মধ্যে অস্বচ্ছতা, ঘোরপ্যাচ, ভাঁজ-ভেজাল নাই। সব কিছু অতি স্পষ্ট, অতি সরল। এবং এমনি ক'রে পাঁচিলের ঘেরায় ও পুরে রাখতে চায় ওর অন্তর্জীবনকে, নইলে চার পাশে হাত বাড়িয়ে আর চোখ মেলে মেলে বেড়ায় ওটা—ভয়, কখন ঝড় উঠে সব তচ্‌নচ্‌ ক'রে দিয়ে যায়। কিন্তু ভেতরের মানুষটা শাসন মানে না। সুযোগ পেলেই—অর্থাৎ ছুট্‌তে ছুট্‌তে মন যখনই একমুহূর্ত হাঁফ ছাড়ার জন্য থামে সেই ফাঁকে সে এসে দ্বারে ঘা দেয়। অতএব ওর সুনিয়ন্ত্রিত, সুরক্ষিত দুর্গের আশ্রয় মন্দ লাগে না তখনকার মত। এর পরে কি হবে, অনাগত কালের হিসেবের খাতায় কোন অঙ্ক পড়বে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে ওর ভাল লাগে না একেবারে, চায়ও না। বিবাহে কোন আকর্ষণ নাই, সে-চিন্তা এড়িয়েই যায়। বাবা হাসেন, কিন্তু বাধা দেন না, কারণ সুবিধা নিজেরই।

[দুই]

রাওল রিভিয়ের মৃত্যু আনেৎ-এর গৎ-এ বাঁধা সাজানো জীবনের ভিতখানা একেবারে নেড়ে দিলে। ভেঙে পড়ল প্রধান স্তম্ভটিও। আনেৎ বুঝলনা ওই স্তম্ভ ছিলেন রাওল। মৃত্যুর সাথে অপরিচয় নেই ওর। পাঁচ বছর আগেই পরিচয়টি হয়েছে মায়ের মৃত্যুর সময়। কিন্তু মরণের রূপ তো সব সময় এক নয়। কয়েক মাস রোগশয্যায় কাটিয়ে মা গেলেন নীরবে, অন্ত-কালের ভয়খানিকে চিত্তে নীরবে বহন ক'রে, যেমন ছিলেন নীরবে—জীবনের সংগ্রাম-সংঘাতকে নীরবতার

তলায় চাপা দিয়ে। পেছনে রেখে গেলেন কেবল কন্যার সহজ ব্যক্তিত্বের মধ্যে একখানি মৃদু বিষণ্ণতা বসন্তের প্রথম বারি-ঝরার মতই যা ক্ষণায়ু। আর দিয়ে গেলেন মেয়েকে স্বস্তি যদিও মেয়ে তা স্বীকার করল না, লুকিয়ে রাখল। শোকের যে লঘু ছায়াখানি ফেলে গেলেন পেছনে, জীবনের আনন্দ-প্রবাহে তা দু'দিনেই ভেসে গেল।

কিন্তু বাওলের মৃত্যু এল একেবারে ভিন্ন রূপ নিয়ে। অজস্র সম্ভোগ ও আনন্দের ভরা-গাঙ্গে তখনও পুরোদমে সাঁতার কেটে চলছিল লোকটা। ভেবেছিল আসবে না এই স্রোত, ফুরোবে না এই সাঁতার কাটার শক্তি। অন্ততঃ শীঘ্র তো নয়ই। তাই শেষের পাত্তার হিসেব সে করেনি, না সঞ্চয় করেছে পাথেয়। কাজেই যখন রোগ এল যাবার পরোয়ানা নিয়ে—তখন আস্তিন গুটিয়ে যুদ্ধং দেহি বলে তার মন উঠল তেড়ে, এবং লড়ল সে ভয় নিয়ে, শক্তি দিয়ে—পাহাড় চড়ার সময় তেজী ঘোড়ার মত কঠিন যাতনায় হাঁপিয়ে হাঁপিয়েও; লড়ল শেষ পর্যন্ত যতক্ষণ না নিশ্বাস একেবারে থেমে গেল। বাবার মৃত্যুর এ ভয়ানক ছবি আনেৎ-এর উদ্দীপ্ত মস্তিষ্কের মধ্যে যেন একেবারে গেঁথে রইল। রাতে এ ছবি বিভীষিকা হ'য়ে সামনে এসে দাঁড়ায়—অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে তন্দ্রার মধ্যেও ভেসে ওঠে মুমূর্ষুর অশেষ মর্মান্তিক যাতনার ছবি আর সেই বেদনা ক্লিষ্ট মুখ; হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে চোখের সামনে মনে হয় অন্ধকারের গায়ে আঁকা ওই ছবি। এমনি প্রবল এমনি তীব্র সে-অনুভূতি যে আনেৎ-এর মনে হয় ওই যাতনা-কুঞ্চিত মুখ, ওই মরণাহত চোখ ওরই, ঐ রুদ্ধ নিশ্বাস বেরুবার পথ খুঁজছে ওরই বুক থেকে। যেন আলাদা নয় ছবির ঐ মরণ-পথ-যাত্রী আর বিছানায় শুয়ে-থাকা, সুস্থ জীবিত আনেৎ। গভীর কোটরের মধ্য থেকে ঠিক্‌রে-আসা ঐ দৃষ্টিতে ডুবন্ত মানুষের আকৃতি আর সংগ্রাম। আনেৎ-এর দম বন্ধ হ'যে আসতে চায়। কিন্তু বলিষ্ঠ যৌবনের কী অপূর্ব প্রসার ধর্ম। এর মধ্যেও বলিষ্ঠ যৌবন তার প্রাণধর্মে রস খুঁজে পায়। গুণ যতই টানো, জীবনের তীব ছুটবে ততই দূরে আরও দূরে।

ওই যে চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়, ও স্মৃতি নয়, ছবি নয়, আগুন, আগুন। অসহ্য চোখ-ঝলসান তার দীপ্তি আপন তীব্রতায় আপনি জ্ব'লে জ্ব'লে নিঃশেষ

হ'য়ে এল—তমিস্রায় ঢাকল স্মরণ-লোক। চলে-যাওয়া মানুষটার চেহারা, তার কণ্ঠস্বর, এই তো সেদিনকার সেই দীপ্ত সত্তা, সব মিলিয়ে গেল সেই অন্ধকারে। আনেৎ হাতড়ে হাতড়ে আর এতটুকু টুকরোও খুঁজে পায়না বাবার স্মৃতির। খুঁজতে খুঁজতে শ্রান্ত হ'য়ে ওঠে, হাতে ঠেকে যা, সে হচ্ছে আনেৎ নিজে। আনেৎ তাই আজ একা—একেবারে একা। নিরালা, রুদ্ধ কাননের ইভ আজ জেগে উঠ্‌ছে…জাগছে ইভ্‌…দোসর-হারা ইভ্‌…যে দোসর এত দিন পাশে ছিল…যাকে ও চেনেনি, চিনতে চায়নি, সে আজ পাশে নাই। কখন যেন সেই অস্পষ্ট অচেনা মানুষটা ধীরে ধীরে ভালোবাসার রূপ পরিগ্রহ ক'রে চিত্ত জুড়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ ইডেন উদ্যানের ঘেরা প্রাচীর ধ্বসে পড়ে যায়—বিপদের খবর আসে হাওয়ায় ভেসে। বাইরে থেকে অশান্ত বাতাসে ভেসে আসে মরণের বার্তা আর জীবনের স্বাদ—। আনেৎ চোখ মেলে—যেমন ক'রে মেলেছিল মানুষ সৃষ্টির প্রথম নিশায় বিস্ময়ে, ভয়ে—আসন্ন সংগ্রামের সহজ অনুভূতি নিয়ে —যেন চারদিকে আনাচে কানাচে অসংখ্য অজানা সংকট ওঁৎ পেতে আছে। নিমেষে ভেতরকার সুপ্ত শক্তিগুলি জেগে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে একেবারে তৈরী হ'য়ে দাঁড়ায় হাতিয়ার হাতে। নিরালা দুর্গ দুধর্ষ বীরের দলে ছেয়ে যায়।

মনের সমতা ভেঙ্গে গেছে আনেৎ-এর। পড়া, কাজ সব অর্থহীন মনে হয়, হাসি পায় ওর আজ অর্থহীন নেশায় মাতা জীবনটার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু এই জীবনটারই অপর অঙ্গনের ধূলি-কণায় অন্য খবর পাওয়া যায়। শোকের ছায়ায় ক্ষণিক আগে তার আকাশ ঢেকেছিল। ছায়া কেটে আজ আবার অসীমের খোঁজ গেছে পাওয়া। বেদনার আঘাতে আঘাতে চিত্তের তন্ত্রীগুলি জেগে উঠছে আর বেজে উঠছে। প্রিয়-বিরহে মর্মে যে ক্ষত জেগেছে তারই চার পাশে ঘিরে আসে ভালোবাসার যত দুর্বার শক্তি অচেনা, অ-জানা, অ-দেখা। বাবার মৃত্যুতে মহা-শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছে অন্তরাকাশে, তারই টানে এরা সব ছুটে বেরিয়ে এসেছে ওর সত্তার কোন গহন তল থেকে। আনেৎ বিস্মিত হ'ল, ত্রস্ত হ'ল এই আকস্মিক উৎপাতে, এবং অস্বীকার করতে চাইল এই উৎপাতের আসল পরিচয়কে, বোঝাতে চাইল বার বার মনকে শোকেরই অনুচর পরিচর এরা। এই যে প্রকৃতি শিশির-ভেজা বসন্ত বাতাসে

.ন ভিজিয়ে দেয়—মনকে করে সতেজ, উদ্দীপ্ত—সেখানে আগুন জ্বালে আর আলো জ্বালে—বুকের তলার এই আকুলি বিকুলি—সুখের জন্য—যে-সুখ হারিয়ে গেছে আর যা ইচ্ছা হ'য়ে অন্তরে রয়েছে। এই যে সুখ-চাওয়া—যে চাওয়ারি প্রচণ্ডতাকে ও চিনেছে কিন্তু দেখেনি তার স্পষ্ট রূপ…আর যে দিন চলে গেল দুরু দুরু বক্ষে তারি দিকে [না, অনাগতের ?] এই বারে বারে ব্যাকুল ভাবে হাত বাড়িয়ে দেয়া…আনেৎ বোঝাতে চায়…সব…সব…এ সব ঢেউ-ই উঠেছে ওই একই হাওয়ায়। শোকের, বিরহ বেদনার হাওয়ায়। কিন্তু এই বেদনাকে ও পারল না স্তব্ধ করতে; তা কেবল গলে গলে বিসাদে, আবেগে একটা ছায়াময় অস্পষ্ট আনন্দানুভূতিতে মিলে-মিশে একাকার হ'য়ে কেমন এক রহস্যময় রূপ পরিগ্রহ করল। এই নব-রূপ ওকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে গ্রাস ক'রে ফেল্‌ল—এবং এই পরাভবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল আনেৎ-এর মন…

আজের এই এপ্রিল-শেষের সন্ধ্যায় বিদ্রোহে, বিপ্লবে বিক্ষুব্ধ আনেৎ। ওর চিত্ত তার দ্বার খুলে বহুক্ষণ ভাবনাগুলোকে ঝেড়ে রেখেছিল অনন্ত আকাশে… অবাধ স্বাতন্ত্র্যে সেই পাখীর দল এলোমেলো ভাবে দিক-বিদিকে ছড়িয়ে গেল। আনেৎ-এর সাবধানী, বিচার-শীল মন দেখল বিপদ্‌; উঠ্‌ল চোখ রাঙিয়ে, উদ্ধত ডানাগুলোকে বেঁধে ফেলতে গেল। দেখল সহজ নয় সে-কাজ—খাঁচা-ছাড়া ওই পাখীর দল আজ অবাধ্য; চিত্ত হয়েছে দেউলে; শাসন দণ্ড খসে পড়েছে তার হাত থেকে।

…ঘরে অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে কত স্বপ্নসায়র, বাইরে কুহক জড়ানো রাত্রির অভিসার। আনেৎ ছিনিয়ে নেয় নিজকে এদের রোমাঞ্চ থেকে। আপনাকে ছিনিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। শীত করছে…বাবারই একটা ড্রেসিং-গাউন টেনে গায়ে জড়িয়ে নিল। তারপর জ্বালল্‌ বাতি—আলোয় ভেসে গেল ঘর।

রাওল রিভিয়ের পাঠ-কক্ষ। প্রশস্ত, খোলা বাতায়ন পথে সামনের ওই বিরল-পত্র গাছের ফাঁকে দেখা যায় সীন্‌ নদী…আঁধারের পরিবেশে তার স্থির গম্ভীর স্তব্ধ জল, আর তারি বুকে পড়েছে ওপারের গৃহ-সারির ছায়া। বাতায়নে

বাতায়নে একে একে অলল আলো···সেইন্ট্ ক্লাউড্ পাহাড়ের আড়ালে ওই নিঃশেষ হচ্ছে দিনের দীপ···মুমূর্ষ আলোর ছায়া পড়েছে নদীর কালো বুকে। রাওলের রুচি-বোধ ছিল সূক্ষ্ম। কিন্তু ধনী মক্কেলদের খেয়াল-খুশি আর তাদের বিকৃত জীবন ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাওল তার রুচি-বোধকে ঠেলে দিয়েছিল পরোক্ষে। এবং সেই কারণেই পারীর গেটের সামনে চতুর্দশ লুইয়ের সময়কার ধাঁচের তৈরী একখানা বাড়ী ও বেছে নিয়েছিল। ওর স্বকীয় রুচি তৃপ্ত হয়নি এ-নির্বাচনে—আরাম-বিরামের যথাসাধ্য ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিল যদিও। রাওলের এই পাঠ-কক্ষের উপযোগিতা অন্য দিকেও ছিল—অর্থাৎ এ স্থান ছিল ওর জীবনের গোপন অধ্যায় অভিনয়ের মঞ্চ; এবং তার উপযোগী সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা ছিল এখানে। এ দিক থেকে রাওলের হাতে এ ঘর-খানার ব্যবহার হয়েছে বেশ ভালো রকম। বাগানের দিকে গুপ্তদ্বার পথে বহুবার বহু অভিসারিকা এ কক্ষে স্বাগতা হয়েছেন লোক চক্ষুর অগোচরে। গত দু'বছর মাত্র এ দরজা খোলা হয়নি। নারীর মধ্যে এখানে প্রবেশ করেছে একমাত্র আনেৎ। সে এসেছে গেছে, জিনিসপত্র ঝেড়েছে, গুছিয়েছে, ফুলদানীর জল বদলিয়েছে···অনবরত চলেছে আর ফিরেছে। তারপর হয়ত হঠাৎ আপনার প্রিয় আসনটির কোলে গুটি সুটি হ'য়ে বসে প'ড়ে একখানা বইএর ওপর স্থির হ'য়ে ঝুঁকে পড়েছে। ওখান থেকে দেখা যায় এঁকে বেঁকে ব'য়ে যাওয়া নদীর শান্ত নীরব-শ্রী। আনমনা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আনমনা ভাবে কথা বলেছে মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে। বাবা একটু দূরেই বসা—কেমন যেন ক্লান্ত আর চঞ্চল। দেখা যায় মুখের একটি পাশ—খোদাই করা মুখ। অপাঙ্গের চতুর শানিত দৃষ্টিতে আনেৎ-এর প্রতিটি ছোট খাট নড়া-চড়া ধরা পড়েছে। আব্দেরে দুষ্টু ছেলের মতই বৃদ্ধ খোকাটির দাবী, যেখানে যে-অবস্থায়ই তিনি থাকুন থাকবেন সকলের বাক্য-চিন্তা-দৃষ্টির একেশ্বর হ'য়ে। এর অন্যথা ওঁর বরদাস্ত হয় না। কাজেই মেয়েকে আনমনা দেখলেই হাসি-ঠাট্টা দিয়ে, হাজার প্রশ্ন ক'রে উদ্ব্যস্ত ক'রে মেয়ের মন টানবার চেষ্টা করে এবং সেই সাথে পরখ ক'রে নেয় সত্যি মেয়ের মন কোন্ দিকে আছে। তারপর কতক বিরক্ত হ'য়ে আবার কতক ওকে না হ'লে বাবার চলে না এই আনন্দেও ও ছেড়ে দিল সব

কিছু ; বাবার সেবা আর মনোরঞ্জনে একেবারে নিজকে দিল ঢেলে। রাওল খুশি হয়, নিশ্চিন্ত হয়। ওর বহিঃসংসার আর সমাজ এখন ওই কন্যা। নিঃসংশয় হয়, এই নূতন পৃথিবীর কক্ষপথ ওকে ঘিরেই। অতএব তার ওপর আপন ঐশ্বর্যময় মনের বিভব দুহাতে ঢেলে দিতে ব'সে রাওল এবারে খুলে দেয় মনের দ্বার—আলোর দল হাউই-এর মত ছোটে আকাশে। উন্মুক্ত হয় স্মৃতির ভাণ্ডার। অবশ্য সাবধানী রাওল অতি সাবধানে মেয়ের মন আঁতি-পাঁতি ক'রে খুঁজে দেখে তার রুচি-অরুচি, মনের ভাঁজে সংগোপনে-থাকা কৌতূহল—সব কিছুর একটা পরিষ্কার হিসেব ক'রে নেয়, আবার হঠাৎ যে কখন তীব্র বিরূপতার কালোমেঘে মেয়েটার মুখ ছেয়ে যাবে আর উঠবে আচমকা ঝড়, তারও পূর্বাভাস ওর চতুর মন আর সন্ধানী দৃষ্টি সুপটুভাবে কষে ফেলে। এবং সেই অনুসারেই ভালো ক'রে ঝাড়াই বাছাই ক'রে যা দেবার মেয়ের হাতে তুলে দেয়। ঠিক যেটুকু জানতে চায় মেয়ে তাই কেবল বলে রাওল, এবং মেয়ে শোনে সর্ব সত্তা দিয়ে, সর্ব অঙ্গ আর প্রত্যঙ্গ দিয়ে—যেন ওর গোটা অস্তিত্ব তাদের বিভিন্নতা আর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে একমাত্র শ্রুতি-যন্ত্র হ'য়ে গেছে। শোনে আর গর্বিত হয়। বাবা ওকে বিশ্বাসের পাত্রী বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই স্বীকৃতি ওর কাছে পরম গর্বের বস্তু। এবং সেই গর্বে ওর এমনি বিশ্বাস হ'য়ে ওঠে যে—মা যা জানতেন তার চাইতেও ও বেশী জানল বাবাকে, দেখল তাঁর গূঢ় জীবনকে—যেখানে প্রবেশাধিকার পেল একমাত্র ও এবং সেই জীবনের নিগূঢ় ইতিহাসের একমাত্র অছি ও।

বাবার মৃত্যুর পর আর একটা দায় এসে পড়ল ওর হাতে। সে হলো তাঁর রাশি-কৃত কাগজ পত্র। ওগুলো সম্বন্ধে আনেৎ-এর কৌতূহল নেই। বরঞ্চ মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ওকে বলে ওই বস্তুতে ওর অধিকার নেই। অন্য আর একটা চিন্তা আবার ঠিক উল্টো কথা বলে। আনেৎই ওর বাবার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী—এবং হঠাৎ ওর মৃত্যু যদি হয় তবে এ সব অন্যের হাতে পড়বে। অতএব এগুলোর একটা পাকা ব্যবস্থা দরকার। অন্যের হাতে পড়তে দেওয়া কোন মতেই চলে না। সেজন্যই ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখা প্রয়োজন ওগুলো রাখা দরকার না নষ্ট ক'রে ফেলা উচিত।

ক'দিন হ'লো এই সিদ্ধান্তই পাকা ক'রে রেখেছে আনেৎ। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় যখনই আনেৎ এ-ঘরে এসেছে ঐ উদ্দেশ্যে, সব সাহস গেছে হারিয়ে। মনে হ'তে থাকে ঘরখানার শূন্যতায় ভরে আছে ওর হারানো প্রিয় পিতা। সে তো যায়নি, সে যে জুড়ে আছে ঘরখানার প্রতি অনুতে অনুতে, প্রতিটি জিনিসে। ভয় করে, হাত ওঠেনা চিঠির তাড়া খুলতে—কে জানে কোন্ রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হ'তে হবে তাহ'লে। তাই নিশ্চল স্থির প্রতিমার মত বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় শূন্যতা ভরে-থাকা প্রিয় সত্তার ধ্যানে।

তবু কর্তব্য সাধন করতেই হবে। অতএব আজ সন্ধ্যায় ও মনকে বেঁধে ফেললে। রাত্রি নেমেছে, অপূর্ব স্নিগ্ধ রাত্রি—কোমলতায় বাঁধ ভাঙ্গা। এলো-মেলো ক'রে দেয় সব। আনেৎ চকিতে অনুভব করে শোকের ভরা-স্রোতে ভাটার টান লেগেছে। সঙ্কল্পে স্থির হয় মন, যে গেছে চলে তার উপর আর কারুর অধিকারই মানবে না ও। তার ওপর একান্ত ক'রে ওরই অধিকার। তাকে শিথিল হ'তে দেবে না আনেৎ। এগিয়ে গেল ও পঞ্চদশ লুইয়ের সময়কার পদ্ধতিতে তৈরী গোলাপ কাঠের আলমারীর দিকে। নেহাৎ সৌখীন জিনিস—নারীর মন ভোলান পেশা যাদের তাদেরই সাজে এ—কাজের যোগ্য নয় ঠিক। এটার মধ্যে রাওলের চিঠি আর ব্যক্তিগত কাগজপত্র রাখা আছে। সাত-আটটি দেরাজে ভাগ ভাগ ক'রে সাজান। অতগুলি দেরাজ-ওয়ালা জিনিসটাকে আমেরিকার গগন-চুম্বী সৌধের মত দেখায়। আনেৎ ঝুঁকে প'ড়ে সব চেয়ে নীচু দেরাজটি টানে। ভালো ক'রে দেখবার সুবিধার জন্য দেরাজটা একেবারে বের ক'রে নিয়ে আগুনের পাশে নিজের জায়গায় ফিরে আসে এবং ঝুঁকে প'ড়ে দেখতে আরম্ভ করে। এতটুকু শব্দ নাই বাড়ীতে। মানুষই বা কে আছে! এক ও নিজে, আর বুড়ী পিসী। গৃহস্থালী আর সংসার দেখা শোনা করেন তিনি—আমলেই আনে না তাকে কেউ। এতদিন চাপা প'ড়ে ছিলেন ভাইয়ের আড়ালে। ভাই যতদিন ছিল—সেবা করেছেন তার, আজ সেবা করেন ভাইঝির। পোষা বুড়ো বেড়ালটার মতই অন্তিম বয়সে বাড়ীর আসবাবের সামিল তিনি—বাঁধা পড়ে আছেন এই গৃহের আর প্রতিটি গৃহবাসীর সঙ্গে—দেহে-মনে জড়িয়ে। সন্ধ্যে হ'তে না হ'তেই নিজের ঘরে

গিয়ে ঢোকেন। ওপরের তলায় ঘর। সেখানকার সুদূর অস্তিত্বটুকু, তার ফেল্ট-ছাওয়া শুকতলী-ওয়ালা জুতোর নিঃশব্দ লঘু-সঞ্চার, আনেৎ-এর চিন্তা-স্রোতে কোন বাধা ঘটায় না।

অস্বস্তি আর কৌতূহল মিশিয়ে আনেৎ পড়তে আরম্ভ করে। কিন্তু ওর শান্তি-পিয়াসী মন আর শৃঙ্খলাধর্মী মানসিকতা ওর পরিবেশের সব কিছু বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে, ছিম্-ছাম ক'রে রাখতে চায়। এবং সেই অভ্যাসেই চিঠিগুলো খুলতে গিয়ে হাত চলে ধীরে ধীরে। আর কেমন একটা ঔদাস্যের শীতলতা খানিকক্ষণের জন্য মনকে বিভ্রান্ত ক'রে দিয়ে যায়।

প্রথম চিঠিগুলো ওর মায়ের লেখা। লেখার ভঙ্গী এবং সুরের উষ্মায় ওর মনে পড়ে যায় প্রথমাবস্থায় মায়ের উপর ওর মনোভাব। প্রায়ই মায়ের অনুকূল হয়নি সে-মনোভাব। মাঝে মাঝেই মনটা বিগড়ে গেছে—যদিও করুণাও হয়েছে। যুক্তির সু-উচ্চ চূড়ায় বসে মায়ের ব্যবহারকে দেখেছে ও মনের স্বাস্থ্যহীনতা ব'লে এবং করুণায় দীর্ঘশ্বাসও পড়েছে—'আহা বেচারী মা!…' কিন্তু এক এক ক'রে চিঠিগুলো পড়তে পড়তে ওর দৃষ্টির সামনে থেকে কুয়াশার আবরণটা খসে পড়ে গেল। আজ প্রথম বুঝল মায়ের মনের অসুস্থতা নেহাৎই অকারণ নয়। বিবাহিত জীবনের মর্যাদা বাবা রাখেন নি তার উল্লেখ পাওয়া গেল কোথাও কোথাও। আনেৎ-এর মনটা বিকল হ'য়ে গেল। বাবার প্রতি পক্ষপাতিশয্যেও তাঁর বিপক্ষে রায়ও দিতে পারছে না, কাজেই যেন বোঝেনি কিছু ভালো ক'রে এমনি ভাবে তাড়াতাড়ি চিঠিগুলো প'ড়ে যেতে লাগল। বাবার প্রতি শ্রদ্ধায় ও চোখ ফিরিয়েই রইল এবং বাবার স্বপক্ষে চমৎকার অসংখ্য অকাট্য যুক্তিও দিল। কিন্তু চিঠির পাতায় পাতায় মায়ের পরম ব্যগ্রতা আর ব্যাকুলতা, তাঁর বেদনা-বিক্ষত কোমল হৃদয়খানি নিঃশেষে উদ্ঘাটিত হ'য়ে পড়ে। ওর অন্তর তীব্র গ্লানিতে ভ'রে যায়—বেচারীকে ভুল বুঝেছে ব'লে। ভুল বুঝেই এই শহীদ-বীরের বেদনার বোঝা আরো ভারী ক'রে তুলেছিল আনেৎ। হ্যাঁ শহীদ, ওর মা শহীদ। দুঃখ-দেবতার বেদীতে নির্ভয়ে নীরবে এই সাহসিকা আপনাকে উৎসর্গ ক'রে গেছেন।

ঐ দেরাজেই তাড়ায় তাড়ায় আরো কতগুলি চিঠি ছিল—(কতগুলি আবার আল্গা হ'য়ে ওর মায়ের চিঠির সঙ্গেই মিশে ছিল)—অবহেলায় এলোমেলো ক'রে রাখা—যেমন ছিল এইসব পত্রের লেখিকারা যারা বহু-প্রেম-বিলাসী রাওলের অসংখ্য সংসারের অধিবাসী ছিল।

আনেৎ সংকল্প করেছিল, মনের শান্তি-ভঙ্গ হ'তে দেবে না। কিন্তু সেই সংকল্পের সামনে আজ একী পরীক্ষা! নূতন তাড়াটার প্রতিটি চিঠি হ'তে অন্তরঙ্গ কণ্ঠ সব কথা ক'যে ওঠে—অধিকার-বোধের দৃঢ়তা সেই কণ্ঠে। এবং এই বোধের বলিষ্ঠতায় মাদাম রিভিয়েকে বহু পেছনে ফেলে গেছে। রাওলের ওপর তাদের ষোলআনা মালিকানা স্বত্ব স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত হয়েছে প্রতি ছত্রে। আনেৎ-এর অন্তর বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। চিঠিগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে আগুনে ফেলে দেয়—পরক্ষণেই আবার টেনে বের ক'রে নিয়ে আসে।

কতগুলো চিঠি একেবারে পুড়ে গেছে। কেমন একটা কুণ্ঠায় ও তাকিয়ে থাকে সেগুলোর দিকে। একটু আগেও ওর বাবা মার কলহের ব্যাপারে প্রবেশ করবার প্রবৃত্তি ছিল না। এবং এই না হবার পক্ষে যে সুদৃঢ় কারণ তখন ছিল—তার চেয়ে বড় কারণেই বাবার চরিত্রের এই অবাঞ্ছিত উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে নাড়াচাড়া করার অনিচ্ছা হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সব যুক্তি কারণ ভেসে গেল। ওর মনে হ'ল ও ব্যক্তিগতভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। অপমানটা ওরই, আর কারো নয়, কিন্তু কেন কেমন ক'রে হ'লো, এ প্রশ্নের অবশ্য কোন জবাব নেই। সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে স্থির হ'য়ে রইল ও। নাকের ডগাটা কুঞ্চিত হ'লো, বিরক্তিতে মুখটা গেল বেঁকে; হাতের মঠোর মধ্যে চিঠিগুলো রয়েছে ধরা—স্পর্ধিত অনিয়মের স্বাক্ষর—ওগুলোকে আবার আগুনের মধ্যে ফেলে দিতে ইচ্ছা হয় ওর—। প্রবল উত্তেজনায় ও কাঁপতে থাকে থরথর ক'রে ক্রুদ্ধা মার্জারীর মত। কিন্তু মুঠো আল্গা হ'তেই লোভ হয়—দেখতে হবে কি আছে ওদের মধ্যে। এবং মুহূর্তে সংকল্প স্থির ক'রে দোমড়ান চিঠি খুলে হাত দিয়ে কোঁচকান ভাঁজগুলো সমান করতে করতে পড়তে আরম্ভ করে। এবং এক এক ক'রে সবগুলোই প'ড়ে ফেলে।

[তিন]

একের পর এক চলেছে কেবল প্রেম কাহিনী,—কিছু জানতে পারেনি আনেৎ। প্রবল ঘৃণার সাথে (কৌতূহল যে না হচ্ছে তা নয়) ও প'ড়ে চলে। এইসব নানা রংএর নানা ছাঁদের কাহিনীতে মিলে এক বিচিত্র ইতিহাস। খেয়ালী রাওল শিল্পের মত প্রেমের ব্যাপারেও সময়োপযোগী রং নিয়ে কারবার করেন।

পত্র লেখিকাদের মধ্যে আনেৎ-এর স্ব-সমাজের এবং সম-শ্রেণীর অনেককেই ও চেনে। অনেকের কাছে আদর আপ্যায়নও পেয়েছে বহু। আজ সেসব কথা মনে হ'তেও কেমন হুঙ্কার আসে। এছাড়া আর যারা, তারা সমাজের অনেকটা নীচু ধাপের। লেখার মধ্যে যেমন তাদের বানান তেমনি তাদের ভাব-প্রকাশের স্থূল ও অসংযত ভঙ্গি। আনেৎ-এর মুখ ক্রমেই ঘৃণায় কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। চোখের সামনে এই সব লেখিকাদের ছবি ভেসে ওঠে···কাগজের ওপর উপুড় হ'য়ে পড়েছে মেয়েগুলো···চোখের ওপর এসে পড়েছে এক গোছা চুল···জিভের ডগাটা পড়েছে বেরিয়ে···আর চিঠির ওপর কলমের ঘোড় দৌড় চলছে···ভারী মজার, হাসি পায়। বাবারই মত তীক্ষ্ণ আর ব্যঙ্গ-ভরা মানস-দৃষ্টি দিয়ে এ ছবি দেখে আনেৎ। এই সব প্রেমাভিযাত্রা আর অভিসারের কাহিনী সংখ্যায় যতই হোক, আয়ু আর প্রসার কোনটারই বেশী নেই। দুদিন আগে আর পরে। একটার পর একটা, তার পর আর একটা···যেন শ্লেটের 'পর লেখা মুছে আবার লেখা। এও ভালো···একটা মুছে আর একটা···কিন্তু ওর হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে ওঠে···বিরূপতায় কুঁকড়ে এতটুকু হ'য়ে যায়।

এই-ই সব নয়। আরেকটা দেরাজও আছে। বেশ যত্ন ক'রে রাখা [মায়ের চিঠির চাইতেও বেশী] একটা নূতন তাড়া—আর এক নূতন কাহিনী। অকস্মাৎ অর্ধপথে বিলুপ্তির ছেদ টানা নাই এ কাহিনীর। লেখা থেকে তারিখ ঠিক বোঝা গেল না। তবু যা বোঝা গেল চিঠির কাহিনীর এ অধ্যায় বেশ সুদীর্ঘ

কালের ধারা বেয়ে চলেছে। দু'রকম হাতের লেখা—একটায় অশুদ্ধ ভাষায় আঁকা-বাঁকা শ্রীহীন হস্তাক্ষর; তাড়াটার আধখানা ভরা এমনি চিঠিতে। বাকীগুলোর প্রথম ক'খানার প্রথমটার লেখা কাঁচা। তারপর ক্রমেই সে-লেখা স্থির পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে···বাবার মৃত্যু পর্যন্ত বরাবর চলেছে এ চিঠি। আনেৎ-এর বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে এই আবিষ্কারে। কে এই লেখিকা? একটা পবিত্র নিভৃত জগতের একমাত্র অধিকারিণী ছিল আনেৎ। কে এই মানুষ যে সেই অধিকারের একটা বড় অংশ ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল? সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ ক'রে ওর বাবাকে বাবা ব'লে সম্বোধন করছে!

অসহ্য যাতনার একটা জ্বলন্ত পীড়া ওর অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে। রাগে বাবার ড্রেসিং-গাউনটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। হাত থেকে চিঠিগুলো প'ড়ে যায় মাটিতে। অবশ দেহে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে। চোখ যেন শুকিয়ে মরুভূমি; গাল দুটো জ্বালা করছে। এই মনোবৈকল্যকে ও বিশ্লেষণ করল না। পারল না করতে। মনটা একেবারে ওলট্ পালট্ হ'য়ে গেছে। এই ঘূর্ণিপাকের ওপর দিয়ে ভাবনার থেইটাকে ও খুঁজে পেলে না। বঞ্চনা? হ্যাঁ, বঞ্চনা, বঞ্চনা—ওর সারা মন চিৎকার করে জ্বলন্ত স্বরে: বঞ্চনা—রাওল ওকে বঞ্চনা করেছে।

আবার সেই ঘৃণিত চিঠিগুলো তুলে নিল। এবারে প্রতিটি চিঠির প্রতিটি অক্ষর নিঃশেষে প'ড়ে চলল! ঠোঁট কঠিনভাবে দাঁতে চাপা—নিশ্বাস দ্রুত আর দীর্ঘ—বুকে আগুন···হিংসার আগুন···আরো কি যেন···এখনও অস্পষ্ট, বুঝতে পারছেনা আনেৎ···কি যেন একটা অনুভূতি জেগে উঠে মাথা তুলেছে··· তবু চিনতে পারছেনা ও। ওর একবারও মনে হ'লনা—বাবার গোপন অন্তঃপুরে এমনি ক'রে পা দেওয়ায় কোন অপরাধ হয়েছে বা কোন নীতি-বিরোধী কাজ হয়েছে। না, করেনি কোন অপরাধ। অধিকারের বাইরে ও পা দেয়নি। এ ওর অধিকার···। মুহূর্তের তরেও এ অধিকারে ওর সংশয় জাগল না [অধিকার? কোথায় গেল তোমার যুক্তি আর বিচার আনেৎ···! এ কোন্ স্বৈর-তন্ত্রী, বিদ্রোহী কণ্ঠের ভাষা!]···বরঞ্চ ওর মনে হ'ল ওর দাবী উপেক্ষিত হয়েছে, আর সে-উপেক্ষা করেছেন বাবা নিজে।

শান্ত হয় মন। বুঝতে পারে, বড় আত্ম-বঞ্চনা করেছে আনেৎ। কি অধিকার ছিল ওর বাবার ওপর? ওর কাছেই বা তাঁর ঋণ কি ছিল? স্বাধিকার-দৃপ্ত ওর মন দৃঢ় কণ্ঠে ব'লে ওঠে: 'ছিল, ছিল, পুরো অধিকার ছিল।' কিন্তু বৃথা তর্ক। যুক্তি-হীন বিষম একটা ক্রোধের ঝাপ্‌টায় পাক খায় আনেৎ। বুকের ক্ষতটা টনটন্ ক'রে ওঠে। বেদনায় কাতর হ'য়ে পড়ে,—আবার সেই সাথে একটা তীব্র, তিক্ত উল্লাসে জ্বলে ওঠে মন…কতগুলি শানিত ছোরা যেন বিঁধছে কাঁচা মাংসের মধ্যে নির্মমভাবে…এক বিচিত্র বেদনা—এ বেদনা আজ প্রথম জানল আনেৎ…উল্লাসে ব্যথায় মিশিয়ে এক বিচিত্র অনুভূতি।

চিঠি পড়তে পড়তে রাতের অনেকটা কেটে গেল। তারপর শুতে গেল যদি,—ঘুম এল না। বন্ধ চোখের সামনে চিঠিগুলো ভাসে। চোখ বুজে বুজেই ও প'ড়ে চলে বারে বারে। চমকে ওঠে থেকে থেকে। তারপর কখন ঘুম এসে যায়। তরুণ জীবনের বলিষ্ঠতায় ঘুমও বলিষ্ঠ। গভীর নিশ্বাস—এলিয়ে-পড়া দেহ—নিথর নিস্পন্দ আনেৎ-এর ঘুমন্ত দেহ। একটা নিটোল শান্তি ছেয়ে আছে সেই দেহের সারাদিনের অবসাদ ঘিরে। ঝড় ব'য়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে—ভেঙ্গে চুড়ে দিয়ে গেছে ওকে সেই ঝড়ে।

পরের দিনও আবার পড়ল চিঠি। তার পরও ক'দিন লাগল। অনেক বার ক'রে পড়ল। কেমন চিন্তার সাথে একেবারে জড়িয়ে থাকে কাগজগুলি। ওরই জীবনের সাথে সমান্তরাল স্রোতে আড়াল দিয়ে ব'য়ে চলে আরও দুটি জীবনের মিলিত একটি ধারা। আনেৎ ভাবে তাদের কথা—মা আর মেয়ে। মা ফুল বেচে…রাওলের টাকায় পরে একটি ফুলের দোকান দিয়েছিল। মেয়ে—ঠিক বোঝা গেল না, বোধহয় কোন পোষাকের কারখানায় সেলাই-এর কাজ করে। মা—মেয়ে…ডেলফিন—সিল্‌ভী…মা আর মেয়ে…। আনেৎ ভাবে সমান্তরাল ঐ প্রবাহটার কথা…যবনিকার একধারে ও, আর একধারে ঐ আরেক ধারা—মা-মেয়ের, ডেল্‌ফিন্-সিল্‌ভীর জীবনধারা…ওই ধারাটার মোড় ঘুরিয়ে এনে আনেৎ মিলিয়ে দেবে আপনার জীবন-ধারার সাথে! রচনা করবে নূতন বৃহত্তর স্রোতস্বিনী। অদ্ভুত ঐ যেমন তেমন ক'রে লেখা চিঠিগুলো…অদ্ভুত লেখার ধরন…আর অদ্ভুত প্রকাশ-ভঙ্গী। হেলায় ফেলায় লেখা, কিন্তু তবু কেমন

একটা, বড় রকম মন-ছোঁয়া গোছের ভাব আছে। দুজনের লেখার ধাঁচ প্রায় একরকম। লেখা থেকে ডেল্‌ফিনকে মনে হয় হাসি-খুশি সহজ মানুষটি; অবিশ্যি চিঠির পাতায় মাঝে মাঝে যে গরম না আছে তা নয়; তবে বোঝা যায় দাবী-দাওয়ার ঝড়ে উত্যক্ত ক'রে তোলেনি রাওলকে সে। মা-মেয়ে কেউই জীবনটাকে ট্রাজেডী বলে নেয়নি—নিয়েছে সহজ ভাবেই। তা ছাড়া আরেকটা জিনিস বেশ স্পষ্ট—রাওলের ভালোবাসার ওপর দুজনেরই অসংশয় বিশ্বাস। হয়তো এই লোকটির কেবলি-পিছলে-যাওয়া ভালোবাসাকে ধ'রে রাখার এ ছাড়া উপায়ও ছিল না আর। আনেৎ ভাবে—এ উদ্ধত স্পর্ধা এই একান্ত বিশ্বাস; স্পর্ধা এই মা-মেয়ের চিঠির একান্ত অন্তরঙ্গ সুর। আনেৎ-এর মন আবার আলোড়িত হ'য়ে ওঠে···স্পর্ধা···স্পর্ধা···

বেশী হিংসা হয় সিল্‌ভীর ওপর। তবু সিল্‌ভীই আবার মন টানে। ডেলফিন্ নাই—সে ওপারে। কিন্তু তবু বাবার সাথে তার একান্ত ঘনিষ্টতা, এই একান্ত-কাছে-আসা আনেৎ-এর গর্বে আঘাত করে···মন ঘৃণায় ভরে ওঠে। বাবার এমনি কত গোপন ইতিহাস ওর সামনে এই ক'দিন আগেই খুলে গেছে···আর ঘৃণায় ও অপমানে ও পাগল হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু আজ সে-জ্বালা মিলিয়ে যাচ্ছে। কারণ আজ অধিকতর শক্তিধর, নূতনতর প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। অতএব আজ তুচ্ছ আর সবাই, তুচ্ছ আর সব। ডেলফিন্ ···ডেলফিন্···বিজয়িনী ডেলফিন্। কল্পনায় আঁকতে চেষ্টা করে এই অপরিচিতার ছবি। কিন্তু অপরিচিতা কি? ঘৃণা আর ক্রোধের ফাঁকে তাকিয়ে দেখে আনেৎ—একেবারে অপরিচিতা মনে হচ্ছে না তো। যেন চিনেছে ···চিনেছে ও এই মেয়েকে, অন্ততঃ খানিক চিনেছে। বিশেষ ক'রে সিল্‌ভীকে। কিন্তু চিঠির বুকে সিল্‌ভীর এই হাসি-তরল সহজ-সুর, অন্তরঙ্গতার শান্ত, স্বচ্ছন্দ প্রকাশ; বাবার ওপর অধিকারের নিঃসংশয় নিশ্চয়তা—যেন বাবা ওরই অর্জিত বিত্ত, ওই একমাত্র অধিকারিণী তার। আনেৎ-এর মন আবার জ্ব'লে ওঠে: স্পর্ধা! স্পর্ধা! দৃষ্টির আগুনে ও দাহ করবে আজ এই অপরিচিতা মেয়েকে। কিন্তু বিচিত্র! ভয় পেলেনা মেয়েটা—যে বল-প্রকাশ ক'রে ওর স্বাধিকারের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করেছে! অপরাধিনী বালিকা

মাথা নত করলে না তো ওর দৃষ্টির সামনে। তার ওপর আবার মাথা তুলে স্পষ্ট নির্ভীক কণ্ঠে বলছে : 'আমারও অধিকার আছে, তোমার বাবা আজ আমারও বাবা !'

সত্য, সত্য, সত্য এ-দাবী। আনেৎ ভালো ক'রে মনের তলাটা খুঁজে দেখে—এই তো রয়েছে এ-সত্যের স্বীকৃতি—দেখে, বোঝে আর জ্বলে। যতই দেখে আরো বেশী ক'রে জ্বলে। না, ভাববে না। মনের ত্রিসীমা থেকে সরিয়ে দেবে এ সত্যের সঙ্গে ওর স্বীকৃতির লড়াই। নইলে ধীরে ধীরে হয়তো মেনেই নেবে সত্যটাকে আর এ-সত্যের অধিকারিণীকে, ওর বৈরীকে। কিন্তু আনেৎ পারলে না দ্বন্দ্ব মেটাতে। ভোরে প্রথম চোখ মেলেই দেখলে—সিল্‌ভী এসে জুড়ে বসে আছে ওর মন—সিল্‌ভী, ওর প্রতিদ্বন্দ্বী সিল্‌ভী। প্রভাতের আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে তার সংশয়হীন কণ্ঠ—'আমি তোমারি আত্মীয়া আনেৎ। তোমার আমার দেহে একই রক্তের ধারা।' স্পষ্ট, ঋজু, বলিষ্ঠ, দৃপ্ত কণ্ঠ যেন শোনে আনেৎ।

আনেৎ স্বপ্ন দেখে ওকে—এমনি জীবন্ত সে-স্বপ্ন যে আধো ঘুমে তাকে আলিঙ্গন করতে হাত বাড়িয়ে দেয় সে।

সিল্‌ভীকে চাই, চাই—অধীর আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হ'য়ে ওঠে সে। মন প্রতিবাদ ক'রে চোখ রাঙায়, এমন অসঙ্গত চাওয়া কেন তোমার আনেৎ! হার মানে না তবু মন। আনেৎ বেরিয়ে পড়ে, সে খুঁজে আনবে সিল্‌ভীকে।

[চার]

ঠিকানা ছিল চিঠিতেই। সিল্‌ভীর আস্তানার দিকে চলল আনেৎ। বেলা প'ড়ে এসেছে। সিল্‌ভী তখনও দোকানেই। সেখানে গিয়ে পরিচয় করার সাহস হ'লোনা। ফিরে এল ও। কয়েক দিন বাদে সেদিন ডিনারের পর সন্ধ্যার সময় গেল আবার। সিল্‌ভী ফেরেনি তখনও, বা এসে আবার বেরিয়ে গেছে। আনেৎ আজও ফিরে এল একটা বিরাট নৈরাশ্য

আর উত্তেজনা নিয়ে। প্রতিদিন অমনি করেই ফিরেছে ও। মনের কোণে কেমন একটা ভীরুতাও উঁকি মারতে চায়। কেন বৃথা ঘুরে মরছে! না, আনেৎ ছাড়বে না। কাজ হাতে নিয়ে ছাড়ে না, ছাড়তে জানে না যারা আনেৎ সে-দলের মেয়ে। আনেৎরা ভয় পায় না বাধাকে, পায় না পরিণামকে—এরা কেবল করে, সরে না।

অতএব আর একদিন। সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে প্রায়। জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল বাড়ীতেই আছে সিল্‌ভী। সিঁড়ির পর সিঁড়ি—ছয় ধাপ। ওপর তলায় থাকে সে। আনেৎ ওপরে উঠতে লাগল প্রায় দৌড়ে দৌড়ে—কি জানি হঠাৎ ফাঁক পেয়ে মন যদি ব'লে বসে—'আনেৎ ফেরো!' ওপরে যখন পৌঁছুল ওর হাঁপ ধ'রে গেছে। দম বন্ধ হ'য়ে আসতে চাইছে। শেষ ধাপে এসে দাঁড়াল একবার। এর পর কোন্ যবনিকা উঠবে কে জানে।

অপরিসর লম্বা একটা টালি ছাওয়া প্যাসেজ—শূণ্য মেঝে, কোন কিছুর আবরণ নাই। ডাইনে বাঁয়ে দু'টো দরজা···দুটোই একটু খোলা। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ডেকে ডেকে কথা চলছে। বাঁ দিকের খোলা দরজার পথে পড়ন্ত সূর্যের এক ফালি আলো এসে পড়েছে প্যাসেজের লাল টালির ওপর। সিল্‌ভীরই ঘর এটা।

আনেৎ দরজায় টোকা দিল।

কে একজন আলাপের মধ্যেই 'ভিতরে এসো' বলে হাঁক দিল।

আনেৎ ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। সোনায় রাঙ্গা আকাশের সোনালী আলো ঠিকরে পড়লো ওর মুখে। দেখল এক তরুণী—কেবল অধোবাস পরা। অনাবৃত কাঁধ, পায়ে মোজা নেই—কেবল এক জোড়া লাল চটি, ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ক'রে কি যেন করছে। পিঠটাই দেখতে পাচ্ছিল আনেৎ। সুন্দর মাংসল কোমল পিঠ—হাড় নেই যেন ও-পিঠে, যেমন ইচ্ছে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাঁকিয়ে নুইয়ে দিতে পারো। কিছু যেন খুঁজছিল মেয়েটি আর পাফ্ দিয়ে নাকের ডগায় পাউডার ঘষতে ঘষতে নিজের মনেই বকে চলছিল।

'কি দরকার বলুনতো?' মেয়েটি বললে। চুলের কাঁটা একটা ধরা ছিল ঠোঁটের এক কোণে, তাই স্বরটা শোনাল কতকটা অনুনাসিক।

হঠাৎ চোখ প'ড়ে যায় মেয়েটির জলের জগে রাখা লিলাকের গোছাটার ওপর। অত্যন্ত উল্লসিত হ'য়ে নাক ডুবিয়ে দেয় ফুলের ভিড়ের মধ্যে। তারপর মাথা তুলতেই আয়নার দিকে পড়ে ওর ঝলমলে চোখ আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে—আয়নায় আনেৎ-এর ছায়া প'ড়েছে, দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে সে দ্বিধায়। সোনার আলোর বেষ্টনী রয়েছে ওকে ঘিরে। অপ্রতিভ হয় সিল্‌ভী। 'ওঃ!' ব'লে, অনাবৃত বাহু দু'খানি তুলে ক্ষিপ্র হাতে মাথার কাঁটাটা গুঁজে চুলটা একটু বিন্যস্ত ক'রে নেয়। তারপর হাত বাড়িয়ে সামনে এগিয়ে আসে। এবং পরক্ষণেই হাত গুটিয়ে নিল। হৃদ্যতার সাথেই স্বাগত জানাল কিন্তু রাশ-টানা হৃদ্যতা কতকটা যেন অনুষ্ঠানিক। আনেৎ ভেতরে এল, কিন্তু মুখে কথা সরল না। সিল্‌ভীও নীরব। একটা চেয়ার ঠেলে দিল আনেৎ-এর দিকে। তারপর নীল ডোরা-কাটা পুরানো একটা ড্রেসিং-গাউন পরে বিছানায় এসে বসল ওর সামনে। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে ব'সে রইল প্রতীক্ষায় কে আগে কথা কইবে।

প্রতীক্ষমানা দুটি মূর্তি একেবারে আলাদা মানুষ। কড়া পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ অকুণ্ঠ দৃষ্টি দিয়ে পাতি পাতি ক'রে পর্যবেক্ষণ করছে পরস্পরের চোখ: —'কে তুমি?'—এই প্রশ্ন উচ্চারিত হ'যে আছে দুজনেরই চোখের না-বলা ভাষায়। আনেৎ-এর দীর্ঘায়ত ঋজু দেহ সিল্‌ভীর সামনে। মুখখানা সরস—সদ্য ফোটা ফুলের মত, নাক সামান্য একটু চাপা, তারুণ্য—সরস ধেনুর মত প্রশস্ত এব কপাল—আর দুই ভ্রূ; আয়ত দুই চোখের স্বচ্ছতায় সাগরের নীল, ঈষৎ বেরিয়ে-আসা চোখ আবেগের তরঙ্গাঘাতে কঠিন হ'য়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। ঈষৎ বিস্ফারিত মুখ, নিটোল দুই ঠোঁট [দুই প্রান্তে একটু নুয়ে-পড়া] কঠিন হ'যে চেপে-বসা ঠোঁট-কোণানর ভঙ্গিতে। সে-ভঙ্গিতে লেখা ওর সাবধানী মন আর দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় আর পরিচয় একটা আত্মরক্ষার প্রয়াসের। ওষ্ঠ দুখানি সামান্য ফাঁক হ'লেই সেই অবকাশটুকু একখানি দীপ্ত উজ্জ্বল, ভীরুতায় কোমল স্নিগ্ধ-স্মিতে রূপায়িত হয়, মনে হয় এক ঝলক আলো এসে পড়ল; আর সমস্ত মুখ খানার রং ফিরিয়ে দিল। গাল আর চিবুক পরিপূর্ণ, অথচ মাংসের বাহুল্য নেই—একেবারে পরিচ্ছন্ন ভাবে কেটে ছেঁটে

তৈরী। ঘাড় গলা কাঁধ হাতের রং গাঢ় মধুর মত। মসৃণ ত্বক নিভাঁজ সেঁটে বসা, কোথাও এতটুকু কুঞ্চন নেই, শিথিলতা নেই। খাঁটি, সুস্থ রক্ত বইছে ওই বর্ণ-শ্রীর তলায়, ত্বকে সে-ঘোষণা স্পষ্ট। দেহ-গঠন লঘু নয়; নিটোল প্রশস্ত বক্ষ কাণায় কাণায় ভরা—একটু বেশী ভরাই যেন। সিল্‌ভীর অভ্যস্ত দৃষ্টি আনেৎ-এর পরিচ্ছদ ভেদ ক'রে পরিচয় করে সে-অন্তরালের জগতের। কাঁধ দুটির ওপর সিল্‌ভীর দৃষ্টি হঠাৎ থেমে পড়ে—কি সুন্দর, কোথাও এতটুকু বাহুল্য নেই, একেবারে মাপ-জোক ক'রে সারা অবয়বের সাথে মিল ক'রে তৈরী। দুই কাঁধের মাঝখান দিয়ে উঠে গেছে মর্মর স্তম্ভের মত শুভ্র গ্রীবা। আনেৎ-এর সব খানি সৌন্দর্য যেন স্থির হ'য়ে আছে ওই কাঁধে আর গ্রীবায়। সাজবার আর্ট আনেৎ জানে—ভালো ক'রেই জানে। ওর অঙ্গ-সজ্জায় সেই জানার পরিচয় অস্পষ্ট নয়। চুল উল্টে টেনে আঁচড়ান, কোথাও এক গাছাও আল্গা নেই। একটা বোতাম বা হুকেও সামান্যতম ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যাবে না—একেবারে নিখুঁত পরিচ্ছন্ন সব। সিল্‌ভীর মনে হয় আনেৎ-এর প্রসাধন-প্রয়াস একটু যেন বেশী উগ্র। 'ওর ভেতরটাও অমনি কি?' সিল্‌ভী আপন মনে প্রশ্ন করে।

আর সিল্‌ভী—আনেৎ-এরই মত দীর্ঘচ্ছন্দা তন্বী সে। কৃশই বলতে হয়, তবে বলতে পারো তন্বী। দেহের তুলনায় মাথা কিছু ছোট। ড্রেসিং গাউনের তলায় উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। গলা হ্রস্ব আর কিছু স্থূল। হাঁটুর উপর সুগঠিত হাত দু'খানি যুক্ত ক'রে রাখা। সুশ্রী কপাল, আর সুডৌল অস্থূল চিবুক। ছোট নাকটি সামান্য উপর দিকে উল্টোন। হাল্কা বাদামী রং-এর চুল কপালের দুই পাশে বিরল হ'য়ে এসেছে। তার কয়েকটা দোল খাচ্ছে গালের ওপর। গ্রীবা বেয়ে এলোমেলো দুলছে বাদামী রং-এর অলক গুচ্ছ। ও-তো গ্রীবা নয়—যেন হট্-হাউস-পালিত বৃক্ষ-শিশু।

অদ্ভুত ওর মুখ। দু'দিকের প্রোফাইল দু'রকমের। ডান্ দিক থেকে দেখ মনে হবে—কেমন একটা এলিয়ে-পড়া, ঝিমিয়ে-পড়া উচ্ছ্বাস-প্রবণ ভাব—ঘুমন্ত বেড়ালের মুখের মত। আবার দেখো বাঁ দিক—মৃণায় কঠিন; সংশয়ী আর সাবধানী দৃষ্টি—এক্ষুণি যেন তেড়ে এসে কামড়াবে বেড়ালটা। কথা

বলার সময় ওপরের পাটি দাঁত ঠোঁটের বাধা এড়িয়ে একটু বেড়িয়ে আসে। কি ভাবছে আনেৎ? কামড়ে দেবে ও? হুঁশিয়ার থাকতে হবে?

দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য নাই এতটুকু। একেবারে আলাদা দুটো মানুষ—সিল্‌ভী আর আনেৎ। তবু ওরা চিনে নিল পরস্পরকে—চিনল স্বচ্ছ চোখ আর তাদের ভাষা; কপাল আর ঠোঁটের প্রান্তের কুঞ্চনটুকু···ওযে রাওলের চোখ, রাওলের দৃষ্টি, রাওলের কপাল···সব রাওলের···যে রাওল ওদের জনক।

সংকোচে কুণ্ঠায় আনেৎ আবার যেন নিশ্চল পাষাণ হ'য়ে গেল। তবু সে সাহস করলে এবার; নাম আর পরিচয় জানিয়ে দিলে শীতল ঔদাসন্যর স্বরে। ঔদাস্য। চিত্তে বইছে আবেগের তুফান, কোথায় পাবে কণ্ঠে প্রাণ আনেৎ! সিল্‌ভী তাকিয়েই রয়েছে ওর দিকে। আনেৎ-এর কথা শেষ হ'লে বললে: 'আমি জানি।' কুঞ্চিত ঠোঁটে এক ক্রূর বাঁকা হাসি।

আনেৎ চমকে ওঠে: 'জানো? কি ক'রে জানলে?'

'কতবার তো দেখেছি তোমায় বাবার সাথে—' শেষ শব্দ দুটি উচ্চারণ করতে কেমন থমকে যায় সিল্‌ভী। হয়তে 'আমার বাবা'ই বলতে যাচ্ছিল—কিন্তু ওর চোখে পড়ল আনেৎ-এর সংকিত দৃষ্টি ওর ঠোঁটের ওপর নিবদ্ধ। মায়া হ'ল—সামলে নিলে। আনেৎ বোঝে, চোখ ফিরিয়ে নেয়। অপমানে ওর মুখ লাল হ'য়ে ওঠে।

সিল্‌ভীর চোখে এড়ায় না কিছুই। ওর বেশ আনন্দই হয় আনেৎ-এর এই দুর্দশা দেখে। কিন্তু শান্ত ভাবেই ও কথা ব'লে চলে—হ্যাঁ দেখেছে বইকি আনেৎকে, ওর বাবার সৎকার অনুষ্ঠানে দেখেছে, গির্জার অলিন্দে দাঁড়িয়ে ও সব দেখেছে। অলস নির্বিকার কণ্ঠের সামান্য অনুনাসিক স্বরে বর্ণনা ক'রে চলে সিল্‌ভী···। সিল্‌ভী বলে আর দেখে, আনেৎ শোনে। শেষ হ'লে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা ক'রে:

'খুব ভালোবাসতে বাবাকে?'

দুজনের চোখেই একটা স্নেহের কারুণ্য কথা ক'য়ে ওঠে। কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্য। কারুণ্য ছাপিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বিদ্বেষের কালোতে আনেৎ-এর মুখ ছেয়ে ওঠে।

'তোমায় খুব ভালোবাসতেন বাবা ?'

সিল্‌ভীকে একটু খুশি করতে ইচ্ছেও হয়। কিন্তু সমস্ত প্রয়াস ছাপিয়ে বিরূপতাই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে স্বরে। সিল্‌ভীর মনে হয় আনেৎ-এর ভঙ্গিতে যেন চাল আছে; একটু যেন বড়পনা দেখাতে চাইছে মেয়েটা। ওর থাবা থেকে নখ বেরিয়ে আসে।

'নিশ্চয়, ভালোবাসতেন বৈকি, খুব বেশী বাসতেন...' স্বরটা ধারাল। একটু থেমে আবার শান্তভাবে বলে :

'তোমাকেও খুব ভালোবাসতেন, প্রায়ই বলতেন, আমায়।'

আবেগে আনেৎ-এর মস্ত বড় হাত দু'খানা কাঁপে আর বারে বারে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। সিল্‌ভীর চোখ এড়ায় না।

বাঁধা-গলায় জিজ্ঞাসা ক'রে বসে আনেৎ...

'প্রায়ই বলতেন আমার কথা তোমায় ?'

'প্রায়ই।' নিতান্ত সরলভাবে সিল্‌ভী বলে।

সিল্‌ভীর কথায় কতটা সত্য ছিল কে জানে। কিন্তু আনেৎ মনকে গোপন করার কৌশল জানে না—অপরের কথায় ও তাই সংশয় রাখে না। সিল্‌ভীর কথা ছুরির ফলার মত ওর মর্মে বিঁধে বসে। সিল্‌ভীর কাছে বাবা বলেছেন ওর কথা! ওরা দুজনে এক সাথে আলোচনা করেছে ওর কথা! আর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিনা কিছুই জানে না আনেৎ! কিন্তু বাবার কথায় তো মনে হ'তো ওর কাছেই একমাত্র তাঁর বুকটা খোলা। তা'হলে প্রবঞ্চনা করেছেন তিনি। তাঁর মনের বাইরেই ছিল তা'হ'লে আনেৎ! বোনের কথাও পর্যন্ত জানতে দেননি ওকে। এত অবিচার! পক্ষপাতিত্ব এতটা! আনেৎ-এর চিত্ত যেন হাহাকার ক'রে ওঠে। পরাজয়—পরাজয়—আনেৎ, হেরে গেছ তুমি। কিন্তু না, প্রকাশ করবে না, জানতে দেবে না কাউকে। আত্মরক্ষার হাতিয়ার খোঁজে, হাতের কাছে জুটেও যায়। বলে :

'এ ক'বছর বাবার সাথে তোমার তেমন একটা দেখা হয়নি, না।'

'না, তা হয়নি...' সিল্‌ভীর স্বরে বিষাদ : 'কেমন ক'রে হবে, অসুখে প'ড়ে ছিলেন যে। বাইরে তো আসতে পেতেন না।'

একটা উদ্ধত নীরবতা। দুজনের মুখে একটু হাসি, একই কথা দুজনের মনে। আনেৎ-এর ভঙ্গি কঠিন, একটা প্রয়াসের আয়াসে পর্যুদস্ত। সিল্‌ভীর মুখ যেন জুয়ার টেবিল—সত্য নাই, সব ফাঁকি। মুখে রয়েছে আপ্যায়নের হাসি, সেও যেন ছলনা, ওপরকার পালিশ মাত্র। জুয়ার দান সুরু হবার আগে যেন হিসেব করে দুজনে ব'সে।

তাহ'লে শেষ ক'বছর বাবাকে দেখতে পায়নি সিল্‌ভী, আনেৎ সে-সুযোগ পেয়েছে। সামান্য হ'লেও এই জয়ের আভাসে ও অনেকটা আরাম বোধ করে, লজ্জিতও হয় অন্তরে আপন মনের ক্ষুদ্রতায়। ও সহজ হ'তে চেষ্টা করে। কথা-বার্তায় আন্তরিকতার সুর টেনে আনতে প্রয়াস পায়। বলে, এসেছে কেন? দেখতে ইচ্ছে হয় না বুঝি। বাবা নেই, বোনটার মধ্যে তবু তাঁর স্মৃতি বেঁচে আছে একটুখানিও—তাই এসেছে আনেৎ…। বৃথা…বৃথা…বৃথা প্রয়াস, আর বৃথা আয়াস…। অজ্ঞাতসারে আর অনিচ্ছায় বেরিয়ে এল 'একটুখানি'—ভাষায় ভঙ্গিতে তারই মারফৎ ফুটে উঠল, সমান অংশীদার এরা নয়, এক পিতার সন্তান হ'লে কি হবে। সাগর ব্যবধান এদের মধ্যে, তাই সিল্‌ভী অধিকারী 'একটু'র। ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিলে একথা, বুঝিয়ে দিলে ভাগ্যের দাঁড়িপাল্লার ঝোঁকা দিকটা আনেৎ এরই।

আনেৎ ব'লে যায় রাওলের শেষ-জীবনের কাহিনী; প্রতিধাপে অতি স্পষ্ট ক'রে তোলে বাবার সাথে ওরই নিকটতর সম্বন্ধের ইঙ্গিত। সিল্‌ভীর চাইতে অনেক কাছের মানুষ ও তাঁর। সিল্‌ভীই কি পায়নি পিতার স্নেহ? পেয়েছে বৈকি—কম পাননি। আনেৎ-এর কথার ফাঁকে ফাঁকে ও সেই স্নেহেরই মালা গাঁথে। পরস্পরের ভাগ্য আর ভাগে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ওদের মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলে। দুজনেই প্রাণপণ চেষ্টা করে, আপন অংশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় ক'রে ধরতে! শুনতে চায়না কেউ কারো কথা, তবু শোনে, শুনতে হয়। বলে, শোনে, আর দুজনে দুজনকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত অনু অনু ক'রে খোঁজে, বিশ্লেষণ করে। সিল্‌ভী স্থির ভাবে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তুলনা করে আনেৎ-এর সঙ্গে। ওর নিজের কেমন দীর্ঘ-ছন্দ সুডৌল পা, ছোট্ট সুন্দর গোড়ালী, স্লিপারে ঢাকা মোজা-হীন ছোট এতটুকু পায়ের পাতা। আর আনেৎ-এর পা কেমন?

মোটা ধ্যাবড়া—গোড়ালী দুটো বিশ্রী। কিন্তু সিল্‌ভীর হাত! দেখেছে আনেৎ, ভালো ক'রে দেখেছে—বিশ্রী লাল নখগুলো, তার মধ্যেকার ওই সাদা অর্ধচন্দ্রের মত দাগগুলো, কি বিশ্রী! তাই আবার যত্ন ক'রে পোষা!

প্রতিদ্বন্দ্বী আনেৎ আর সিল্‌ভী, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি মেয়ে, বা দুটি মানুষই কেবল নয়···যেন বিবদমান দুটো গোটা সংসার, দুটো পুরো জাত। সুতরাং কথা বার্তায় সহজ সুর থাকলেও তার আড়ালে রয়েছে ওদের উদ্যত ফণা, আর উদ্যত নখ দন্ত। দৃষ্টিতে ঝরছে আগুন—ঈর্ষ্যার আগুন। প্রথম দেখার ক্ষণেই সেই আগুন দিয়ে পরস্পরের চিত্তের বাইরের আড়ালখানা পুড়িয়ে দিল আর টেনে হিঁচ্‌ড়ে একেবারে বাইরে নিয়ে এল ভেতরটাকে। আপন মনের অলি গলি যে এত ধোঁয়া আর এত ময়লায় ভরা ছিল এতদিন তা টেরও পায়নি ওরা। আজ তাই একেবারে অনাবৃত হ'য়ে পরস্পরের সামনে ধুলোয় ঝরে পড়ল। সিল্‌ভী দেখলে আনেৎ গর্বিতা, অভ্রভেদী তার গর্বের চূড়া আর দুর্ভেদ্য তার নীতির ব্যূহ; স্বৈরতা, আর জুলুম ওর স্বভাবের প্রতি অণুতে। ভাগ্যি ভালো এখনও তেমন ক'রে প্রয়োগ আর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র পায়নি তারা। আনেৎ-এর মনে হয়, ভারী কঠিন সিল্‌ভী, নিষ্ঠুর। সবখানিই ওর ছলনা, হাসির মুখোস পরিয়ে রেখেছে ওই ছলনার ওপর। পরে অবশ্য এ বেড়া ভেঙেছে, আর ওরা সরে এসেছে পরস্পরের বুকের কাছে; তখন দুজনেই ভুলতে চেষ্টা করেছে আজের দিনের দেখা এ-ছবি। কিন্তু আজ এই ক্ষণে ওরা অণুবিক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বসে ছিল। তারই লেন্সের মাধ্যমেই ওদের ক্রূর দৃষ্টি আজ দেখছিল পরস্পরকে। ক্ষণে ক্ষণে ঘৃণাও উঠছিল ফণা তুলে। আনেৎ-এর মনটা ভারী হ'য়ে যায়, ভাবে 'এতো ঠিক হ'লো না, অন্যায়, অন্যায়, অন্যায় করেছি। আমিই এগিয়ে আসি, শুধ্‌রে নি আমিই···'

ঘরের চারদিকে তাকায়—সাধারণ ঘর। চাঁদ উঠ্‌ছে—জ্যোৎস্নায় নাইছে সামনের বাড়ীটা। আনেৎ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ও বাড়ীর জানালা আর তার লেসের পরদা, ছাদ, চিম্‌নি—ঘরের কোণে ভাঙা জগে রাখা লিলাকগুচ্ছ···

আনেৎই এগিয়ে আসে। আত্মীয়তা নিবেদন করে সিল্‌ভীকে। কিন্তু স্বরে প্রাণ ফোটে না। শীতল ঔদাস্যে কঠিন হয়ে থাকে কণ্ঠ; আর তারই

ওপারে আলামুখীর জ্বালা ফোটে টগ্‌বগ্‌ ক'রে। পুড়ে গেছে তাই প্রাণ…। সিল্‌ভী শোনে হেলায়, বিদ্রূপের বাঁকা হাসি নিয়ে…জবাব দেয়না কোন। আনেৎ আহত হয়; ওর রাগ ফেটে পড়তে চায় আহত গর্বে আর বিক্ষুব্ধ আবেগে। ও লুকোতে পারে না রাগ—হঠাৎ উঠে পড়ে, সাধারণ ভাবে সহজ সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নেয় আনেৎ। গভীর বেদনা আর ক্রোধের জ্বালা ব'য়ে বাড়ীর পথে পা বাড়ায়।

টালি-বাঁধান বারান্দাটির শেষ প্রান্তে এসে সিঁড়ির গোড়ায় পা দিতেই সিল্‌ভী এল ছুটে। পায়ের এক-পাটি চটি খ'সে প'ড়ে গেছে পথে। পেছন থেকে দুই হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে আনেৎ-এর। আনেৎ ফিরে দাঁড়ায়; আবেগে দুই চোখ দিয়ে জল পড়ে। দুহাতে গভীর ব্যগ্রতায় সিল্‌ভীকে জড়িয়ে ধরে। সিল্‌ভীরও চোখে জল আর মুখে হাসি। চিৎকার ক'রে ওঠে—ওঃ, কি জোরেই না জড়িয়ে ধরেছে আনেৎ। দু'টি মুখ এক হ'য়ে যায় আকুলতায় আর গভীর ভালোবাসায়। তারপর! কত আদরের সম্ভাষণ,… কত ভালোবাসার কথা…কত ধন্যবাদ…। কথা দিলে আনেৎ আবার আসবে।

আনেৎ সুখে হাসে…জানতেও পারেনি কখন সিঁড়ি শেস হ'য়ে গেছে। ওপর থেকে একটা শিসের মত কণ্ঠ ভেসে আসে, যেন শিষ দিয়ে কুকুরকে ডাকছে কেউ—

'আনেৎ!'

আনেৎ ওপরের দিকে তাকায়, ওপর সিঁড়ির মাথায় এক খণ্ড আলোর মধ্যে একখানা হাস্তোজ্জ্বল মুখ; ঝুঁকে আছে নীচের দিকে সিল্‌ভী।

'ধরো ধরো।'

আনেৎ-এর মুখের ওপর এসে পড়ল এক গুচ্ছ লিলাক্—তার তার সাথে এলো হাওয়ায় ভেসে সিল্‌ভীর দুহাতে উড়িয়ে দেয়া চুম্বন…

আর দেখা যায় না সিল্‌ভীকে। চলে গেছে। আনেৎ চোখ তুলে অনেক্ষণ তাকিয়ে থাকে সেদিকে—তারপর ভেজা লিলাক্ গুচ্ছকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ছেয়ে ফেলে।

[পাঁচ]

দূর নেহাৎ কম নয়, রাতও যথেষ্ট হয়েছে—এ সময় সব রাস্তা ঠিক নিরাপদ নয়। তবু আনেৎ হেঁটেই চল্‌ল। ওর যেন নাচতে ইচ্ছে করে। যখন এসে বাড়ী পৌঁছুল, খুশিতে অস্বস্তিতে মনে ঝড় উঠেছে। ফুলগুলো একটা ফুলদানীতে ক'রে বিছানার কাছে রেখে তবে শুতে গেল। আবার উঠ্‌ল—ফুলগুলো তুলে নিয়ে জলের জগটায় রাখল ঠিক যেমন দেখেছিল সিল্‌ভীর ঘরে। তারপর বিছানায় গেল আবার। আলোটা নেবাল না—ঘুমোবেনা ও। এত তাড়াতাড়ি এই সুখের দিনটাকে বিদায় দিতে পারবে না। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ল কখন। ঘণ্টা তিনেক পরে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় মাঝ রাতে। আছে, ফুলগুলো ঠিক আছে, যেমনি রেখেছিল তেমনিই আছে। স্বপ্ন নয় তাহ'লে, সত্য সিল্‌ভী। সত্য সিল্‌ভীকে ও আজ সত্যি চোখে দেখে এসেছে। স্বপ্ন নয়, একেবারে খাঁটি সত্য। প্রিয়-মূর্তির ধ্যান বুকে নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

তার পরের দিনগুলো কেমন যেন একটা খুশির গুণগুণানিতে মুখর হয়ে রইল। মৌমাছির দল যেন মধুচক্র রচনা করছে—নূতন মধুচক্র—নূতন মক্ষী-রাণী—মৌমাছির দল ভিড় করে তার চার পাশে···সিল্‌ভীকে ঘিরে তেমনি আনেৎ-এর আগামী দিনের মধুচক্র গ'ড়ে ওঠে। পুরানো মধুচক্রখানি ছেড়ে গেছে মৌমাছির দল···তার রাণীও চোখ বুঁজেছে। নূতন চক্র চাই, চাই নূতন রাণী। পুরানো এই জনহীন প্রসাদের হাওয়া তাই চঞ্চল···গুঞ্জন জেগেছে তার চিত্তে···নূতন চক্র···নূতন সৃষ্টি চাই···। আনেৎ-এর আবেগোদ্বেল চিত্ত চাপা দিতে চায় সত্যটাকে। চোখ ঠার দেয় আপনাকে···বাবা নেই, তোমার ভালোবাসার একমাত্র পাত্র ভেঙেছে—তাইতো তোমার ভালোবাসা সিল্‌ভীকে খুঁজছে আনেৎ···ওর মধ্যেই সেই হারানো মানুষকে খুঁজে পাবে ব'লে। ···কিন্তু আনেৎ জানে মিথ্যা এ। এই নূতন খোঁজায় আর নূতন চাওয়ায় সেই হারানো-প্রিয়ের বিদায়ের পালা-গান বাজছে।

নূতন প্রেম…ভাঙে আর গড়ে, গড়ে আর ভাঙে…। ওই তার ধর্ম। আনেৎ-এর নূতন প্রেমের বলিষ্ঠ বাণী আপনাকে ব্যাপ্ত করে ওর সর্ব সত্তায়। নির্মম ঝটকায় পিতার স্মৃতি ছিটকে পড়ে দূরে, দৃষ্টির আড়ালে। ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ, পুরানো পরিচয়ের সাক্ষ্য যা কিছু ছিল, আনেৎ শ্রদ্ধাভরে সযত্নে সরিয়ে রাখল যে-সমস্ত ঘর ব্যবহার হয় না তাদেরই নিভৃত নিরবচ্ছিন্ন একান্তভাবে—অর্থাৎ এমনি স্থানে যেখানে তাদের কেউ নাড়বে না, শান্তির ব্যাঘাত কেউ ঘটাবে না ; যেখানে শ্রদ্ধার পূজার আধারে পবিত্র সুদূরতায়, নিশ্চিন্তে, নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে বেশ থাকবে তারা। বাবার ওভারকোট্‌টা ফেলল পুরানো সিন্দুকটার তলায়। আবার বের করল। ওটার মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। আবেগের এমন এলোমেলো খামখেয়ালী পথ—তার না আছে যুক্তি, না আছে হেতু। কিন্তু এই যে দুইটি বিভিন্ন-মুখী তরঙ্গ উঠেছে আজ, এর মধ্যে কোনটা সত্য ?

আনেৎ আজ ওর বোনকে আবিষ্কার করেছে—এই সুখে ওর মন টলমল। সম্পর্কটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, একই রক্ত বইছে ওদের দেহে। কিন্তু আনেৎ তো এখনও ওকে জানে না, চেনে না এই নূতন-পাওয়া মানুষকে ! নাই বা চিনল। ভালোবাসার রোমাঞ্চই তো এই, যেমনি ভালোবাসলে অমনি জানার আর না-জানার রহস্যে মিলে এক হ'য়ে যায়। ওই রহস্যই প্রেমের আসল অঙ্গ-সজ্জা, তার আত্মা। যে সিল্‌ভীকে আজ ও দেখে এল তার মধ্যে যা কিছু ভালো লেগেছে তাই নিয়ে ও স্মৃতির মালা গাঁথতে বসে। কিন্তু বুঝলে মনের মধ্যেকার ছবি খুব স্পষ্ট নেই। আভাস যা আছে তাকেই ধ্যানের মধ্যে রূপ দিতে চেষ্টা করে। কানে আসে শব্দ…ছোট ছোট চটির শব্দ আসছে হলের মধ্য দিয়ে…তারই পরমুহূর্তে ওর গ্রীবা ঘিরে সিল্‌ভীর অনাবৃত বাহুদুটির কোমল স্পর্শ…

আসছে সিল্‌ভী। কাল বলেছে ও আসবে। অতিথিকে স্বাগত করবে বলে কত আয়োজন আনেৎ-এর। আচ্ছা, কোন্ ঘরে নিয়ে যাবে ওকে আগে ! ওদের নিজের ঘরেই। সিল্‌ভী বসবে জানালার ধারে, ওর প্রিয় আসনটিতে।

জন্ত যে কথার মালা গেঁথেছিল—পরান হ'লো না সে-মালা অতিথির গলায়… প্রিয় আসনটিতেও নিয়ে বসান হ'লো না…। জানালার দিকে পিঠ দিয়ে দুজনে বসল পাশাপাশি—তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে…

'এলে যা হোক—' আনেৎ বলে।

'এলামই তো—' সিল্‌ভী উত্তর দেয়। তারপর আনেৎকে ভালো' ক'রে দেখে বলে : 'বাইরে যাচ্ছিলে ?'

আনেৎ মাথা নাড়ে। ও জানতে দেবে না সিল্‌ভীকে। কিন্তু সিল্‌ভী বোঝে—ঝুঁকে প'ড়ে কানে কানে বলে : 'বুঝেছি, আমার কাছে যাচ্ছিলে, তাই না ?'

আনেৎ চমকে উঠে। বোনের কাঁধে মুখ লুকিয়ে বলে : 'ভারী দুষ্টু তুমি—'

'কেন ?' ওষ্ঠের প্রান্ত দিয়ে আনেৎ-এর সুশ্রী ভ্রূর ওপর চুমু খেয়ে বলে সিল্‌ভী।

আনেৎ জবাব দেয় না। সিল্‌ভী জানে ওর জবাব। আনেৎ-এর দিকে একটা ব্যঙ্গ-ভরা দৃষ্টি ফেলে হাসে ও। আনেৎ দেখতে পায়নি, চোখ ফেরান ছিল। সেই জবরদস্ত মেয়ে ! কোথায় গেল তার তেজ ! অকস্মাৎ একটা কুণ্ঠা এসে আচ্ছন্ন ক'রে দেয় আনেৎকে। কারো মুখে কথা নেই। দু'জনে প্রতিমার মত নিশ্চল হ'য়ে বসে থাকে। আনেৎ হেলান দিয়ে আছে সিল্‌ভীর গায়ে। সিল্‌ভী খুশি, ওর জয় হয়েছে—হেরে গেছে আনেৎ…

ধীরে ধীরে প্রথম আবেগ শান্ত হ'য়ে আসে দু'জনেরই। আনেৎ মাথা তোলে—তারপর হয় কথা শুরু, যেন কত কালের বন্ধু ওরা।

আজ আর ওরা শত্রু নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। বরঞ্চ আজ পরস্পরের কাছে ধরা দেবার, হার মানবার জন্ত ওরা বসে আছে উন্মুখ হ'য়ে…। তবে হ্যাঁ, একেবারে উজাড় ক'রে সব দেয়া চলবে না…। গোপন পুরীর গোপন কথা থাক—বাইরের আলোয় বের করার যোগ্য নয় তা ; প্রেমাস্পদের কাছেও না। না হয় থাকলো। আর সব ? সব উদ্‌ঘাটিত, অবারিত ক'রে দিতে পারো সিল্‌ভী ? পারো আনেৎ ? পারে না, পারে না সিল্‌ভী, পারে না আনেৎ। মনের দুয়ার ওরা খুলল বটে—কিন্তু আগে বুঝে নিল ভালোবাসায় টান সইবে কতটা। বলতে বলতে কখনও আধপথে থেমে যায় সিল্‌ভী। সুন্দর সাজানো

মিথ্যে দিয়ে পাদপূরণ ক'রে আবার চলে কথার স্রোত, তেমনি সহজ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে, তেমনি হাসি দিয়ে, তেমনি কপট অন্তরঙ্গতায়। পরস্পরের কাছে এখনও ওরা অজানা ; বিভিন্ন ওদের প্রকৃতি, আলাদা ওদের জগৎ, আলাদা সব। আজকের ওদের এই যে সাক্ষাৎ, এই যে মিলন, সিল্‌ভীই কি কম আয়োজন করেছিল ব'সে ব'সে! অবশ্য সে স্বীকার করবে না—। সাজ আর প্রসাধনই কি ব'সে ব'সে কম করেছে? ঘষে মেজে চেহারার জলুস বাড়িয়েছে যতটা পারে, কুশ্রী হয়ে যাওয়া চলবে না আজের এই অভিসারে। আনেৎ মুগ্ধ হয় সিল্‌ভীর লাবণ্যে। কিন্তু বড় বিব্রত হয়, বড় হাল্কা সিল্‌ভী। সিল্‌ভী বোঝে কিন্তু শোধরাবার কোন চেষ্টা নেই। মুগ্ধ করে ওকে আনেৎ-এর অনাড়ম্বর সারল্য আর সহজ ভঙ্গি, ওর ব্যাকুল ঐকান্তিকতা আর তার সঙ্গের ওই স্থির গাম্ভীর্য ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্ত সংকুচিত হ'য়ে ওঠে ও—অঙ্গুলি তুলে তিরস্কার করছে যেন আনেৎ ওকে। [কিন্তু যেমন ক'রে কথা বলছে সিল্‌ভী, কে বুঝবে ওর ভেতরে কোথাও কুণ্ঠা জেগেছে!] দু'জনেরই দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ— পরস্পরের এতটুকু ভাব ভঙ্গি, চোখের পলক অবধি ধরা প'ড়ে যায় সে-দৃষ্টির সামনে। তবু অনেক বাকী, অনেক পরিচয় নিতে হবে এখনও। এখনও সংশয় আছে, আছে সন্দেহ, তবু ধরা দিতে চায়, তবু আপনাকে দিতে চায় সঁপে। কিন্তু শুধুই দেবে? বিনা প্রতিদানে? না, অত বেহিসেবী হওয়া চলবে না। গুমর আছে দু'জনেরই—আনেৎ-এর একটু বেশী মাত্রায়ই আছে। ওর মধ্যে ভালো-বাসার শক্তিও প্রচণ্ড ; তা আজ অভিমানের স্তর ডিঙিয়ে মান-মানার কোঠায় এসে পৌঁছেছে। তাই আজ বিশ্বাসঘাতকতা করল ওর হৃদয়। একেবারে ধরা দিয়ে বসল। এতটা দিয়ে বসবে তা এক মুহূর্ত আগেও জানেনি। উল্লসিত হয় সিল্‌ভী প্রতিপক্ষের এই পরাজয়ে। এগিয়ে চলে দু'জনেই, জানতে হবে, চিনতে হবে, বুঝতে হবে—পরস্পরকে ওরা আজ চিনে নেবে। ওদের অন্তর আজ জ্বলছে এই জানার পিপাসায়। তাই এগিয়ে চলে। কিন্তু পা পা ক'রে, সাবধানে—পাকা সংসারীর সংশয়ী মন নিয়ে ; পরস্পরের প্রতিটি নড়াচড়া ভাব-ভঙ্গি পরখ ক'রে, যাচাই ক'রে।

কিন্তু অসম দ্বন্দ্ব। আনেৎ-এর বৃহৎ ভালোবাসার রূপকে সিল্‌ভীর চিনে নিতে দেরী হয়না—হার-মানা আর হার-মানানো দুই রূপ। আনেৎ চেনেনি আপনাকে, চিনল সিল্‌ভী। তাই ভালো ক'রে যাচাই করতে বসল; থাবা গুটিয়ে খেলায় নামল ওর ভালোবাসা নিয়ে। কিন্তু বুঝতে দিল না এতটুকু। আনেৎ বুঝল ওর হার হ'য়েছে—পুরো হার। লজ্জার সাথে আনন্দ মিশে এক হ'য়ে গেল।

সিল্‌ভীর ইচ্ছায় সারা বাড়ীটা ওকে ঘুরে ঘুরে দেখায় আনেৎ। নিজে থেকে হয়ত এগুত না—ভয় ছিল, কি জানি যদি ঐশ্বর্য দেখিয়ে বোনের মনে আঘাত দিয়ে ফেলে। কিন্তু সিল্‌ভীর মনে কোন বিকার দেখা গেল না। পরিষ্কার সহজ মানুষ, যেন বাড়ীরই মানুষ সে; এ ঘরে যায়, ও ঘরে যায়—ছুঁয়ে দেখে, ধ'রে দেখে এটা ওটা সব কিছু। ওর এই সপ্রতিভ সহজ ব্যবহারে আনেৎ বরঞ্চ বিব্রত, অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু ভারী ভালো লাগে, দুই চোখে ওর স্নেহ উথলে ওঠে। আনেৎ-এর বিছানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সিল্‌ভী আদর ক'রে ওর বালিশটাতে হাত বুলিয়ে দিয়ে যায়—প্রসাধনের টেবিলটির কাছে দাঁড়ায়—প্রতিটি শিশি আর কৌটো এক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ক'রে নেয়; অন্যমনস্ক ভাবে লাইব্রেরীতে গিয়ে ঢোকে; কোন দরজার পরদা দেখে লাফিয়ে ওঠে খুশিতে; আরাম-চেয়ারটার সমালোচনা করে, আবার আর একটায় গিয়ে ব'সে পড়ে; আধখোলা আলমারীটা খুলে আনেৎ-এর একটা সিল্কের জামা ভালো ক'রে হাত বুলিয়ে অনুভব করে। তারপর সব দেখা শোনা হ'য়ে গেলে আনেৎ-এর শোবার ঘরে এসে বিছানার পাশের নীচু আরাম চেয়ারটায় এলিয়ে পড়ে। চা খাবে কিনা জিজ্ঞেস করে আনেৎ। না, চা নয়, তবে সরবৎ হ'লে মন্দ হয় না। জিভের ডগা দিয়ে বিস্কীট্‌টা চাট্‌তে চাট্‌তে আনেৎ-এর দিকে তাকায়—কি যেন বলতে চায় আনেৎ। সিল্‌ভীর চোখ বলে—বলে ফেলোনা আনেৎ!

অবশেষে সাহস ক'রে বলেই ফেলে। রুদ্ধ আবেগের আগল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে ওর মুখ দিয়ে কথাটা—আসুক সিল্‌ভী এখানে, থাকবে দুই বোনে এক সঙ্গে। সিল্‌ভী হাসে আর হাসে আঙুল সুদ্ধ বিস্কীটটা গ্লাসে ডুবিয়ে হাসে, মিষ্টি

ক'রে হাসে চোখে ধন্যবাদ ফুটিয়ে। হাসে আর মাথা নাড়ে যেন ছেলে-মানুষের সাথে কথা কইছে। ডাকে : 'দিদি—'

ঐ পর্যন্ত। না, সিলভী আসবে না।

আনেৎ জোর করে, জেদ করে। প্রায় জুলুম করে—হুকুম ক'রে ও ওর সম্মতি আদায় করতে চেষ্টা করে। সিলভী কথা কয় না। সামান্য দু একটা টুকরো কথায় মিষ্টি ক'রে স্নেহ মাখিয়ে বলে : 'না—না' ; একটু বিব্রত যেন, ব্যঙ্গও দেখা যায় যেন চোখে···[তাই ব'লে দিদিকে ভালোবাসেনা তা নয়, বেশ মেয়ে দিদিটা—ভারী সরল, কোনো কিছু মনে হ'লেই হ'লো—]

'তা হয়না,' সিল্‌ভী বলে।

'কেন ?' আনেৎ জিজ্ঞাসা করে।

'আমার বন্ধু আছে একজন।'

হঠাৎ আনেৎ বুঝে উঠতে পারে না। তারপর বোঝে কিন্তু অবাক হয়। চোখের দিকে তাকিয়ে ভালো ক'রে দেখে সিল্‌ভী উঠে পড়ে হাসি মুখে। বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে চুমু খেয়ে বেরিয়ে পড়ে।

[ছয়]

আনেৎ-এর স্বপ্ন-সৌধ ভেঙ্গে গেছে। সেই কথাই সে ভাবছে বসে। টন্ টন্ করছে ভেতরটা। নানারকম ভাব আর আবেগে মিশে ওর মনের মধ্যে রহস্য-লোক সৃষ্ট হয়েছে। কি একটা তীব্র বেদনার অসংখ্য ছায়া-মূর্তি সেই রহস্য-লোকে ঘুরে বেড়ায়। তাদের এড়িয়ে যেতে চায় ও, চেনে না ব'লে পেছন ফিরে থাকতে চায়। কিন্তু ছাড়ে না তারাও, দুই হাতে ওর টুঁটি টিপে ধরে···

আনেৎ ভেবেছিল ওর মধ্যে সংস্কার নেই; অন্ততঃ নিজের সম্বন্ধে ওর সেই ধারণাই ছিল এতদিন। কিন্তু আজ ওরই বোন···এই সৌন্দর্যের প্রতিমা··· না, ভাবতে পারে না আনেৎ। অসহ্য! অসহ্য! বুক ভেঙ্গে কান্না আসে···

কিন্তু কেন?   বড্ড ছেলেমানুষী। এ হিংসে, হিংসে…নিছক হিংসে।   …না না, কক্ষনও নয়, একেবারেই নয়।…গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। আর ভাববে না এ-কথা। মনটার মোড় ঘোরাবার জন্ত লম্বা পা ফেলে এ-ঘর ও-ঘর করে। হঠাৎ খেয়াল হয়, তাইতো সিল্‌ভীর কথাই তো ভাবছে দেখি। ভাবতে পারছেও না অন্ত কিছু। সিল্‌ভী…আর সিল্‌ভীর সেই বন্ধু…নিশ্চয় হিংসে হচ্ছে, আনেৎ।…না…না…না। রাগে মাটিতে পা আছড়ায়। কখনও না। আনেৎ, স্বীকার করো সত্য। না…না…না…না। কখনও না। স্বীকার করুক আর নাই করুক—ওর ভেতরটা কুরে কুরে খেয়ে যেতে লাগল। আত্ম-সমর্থনের জন্ত নীতি-শাস্ত্রের বিধান খোঁজে আনেৎ। মিলেও যায় হাতের কাছে। না, হিংসে নয়—আঘাত লেগেছে ওর আদর্শ-বিলাসী মনে—যা আজও রয়েছে শুচিতার বর্ম দিয়ে ঘেরা। আনেৎ-এর মনের গঠন বড় জটিল। নানা রকম স্ববিরোধী ভাব আর সংস্কার সেখানে একসাথে ঘর বেঁধে আছে। অথচ আজও সংঘর্ষ বাধেনি। অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারে ওর জন্ম এবং এতকাল তার মধ্যেই কেটেছে। তবে ধর্মের গোঁড়ামি নেই ওর। ও নিয়ে ও মাথা ঘামায়নি। ওর বাবা সংসারকে দেখেছিলেন সংশয় আর অবিশ্বাস নিয়ে। আর মা দেখেছিলেন একেবারে খোলা স্বাধীন মন দিয়ে। ধর্মের বালাই ছিল না কারোই। এই দুই বিপরীত স্রোতের মধ্যেই বড় হয়েছে আনেৎ। সব কিছু আলোচনা করে ও অসংকোচে। সামাজিক অন্ধ-বিশ্বাস আর সংস্কারকে পরীক্ষার সামনে এনে হাজির করে অবলীলায়, চুল চিরে বিশ্লেষণ করে। এতে ওর ভয় নেই। স্বাধীন ভালোবাসা ও স্বীকার করে—অবশ্য এ শুধু মতবাদ। এবং সে-দিক থেকে এ স্বীকৃতি ওর খাঁটি। বাবার এবং সহপাঠীদের সাথে আলোচনায় প্রেম-স্বাতন্ত্র্যকে জোরের সঙ্গে সর্বদা সমর্থন করেছে। অবশ্যি এর মধ্যে ওর তরুণ মনের গর্ব-বোধও ছিল। প্রগতির পথে পিছিয়ে নেই ও কারো থেকে একথাটা প্রমাণ করার ইচ্ছে ও চেষ্টা খানিকটা না থাকত তা নয়। তবে সে খুব সামান্ত। আসলে ও মনে প্রাণে বিশ্বাসই করে স্বাধীন-ভালোবাসা রীতিমত আইন ও নীতি সঙ্গত। যথেচ্ছ জীবন-যাত্রার জন্ত

প্যারী-সুন্দরীদের ও দোষারোপ করেনি কখনও। বরঞ্চ এদের জন্ম দরদ আছে।

তবে বাঁধছে আর বিঁধছে কোথায়, আনেৎ? সিলভী তো কই, কোন অন্যায়.কিছু করেনি। যা করেছে এতে ওর অধিকার আছে বৈকি। মালো তো এই অধিকার?...অধিকার? না, না, তা হয় না। লোক অধিকার। অন্যে করুক যা খুশি, কিন্তু তাই ব'লে সিল্‌ভী! না, না, না সিল্‌ভীর নেই এ অধিকার। সে আছে যারা নিতান্ত সাধারণ, তাদের—অর্থাৎ সমাজে যাদের আমরা খুব একটা উঁচু ঠাঁই দিইনি। তাদের জন্য অনেক গ্রন্থি শিথিল করা যায়, রাশ ঢিল দেয়া যায় অনেকটা...তাই ব'লে সর্বত্র তা পারা যায় না; বিশেষ ক'রে সিল্‌ভী যে ওর আপন বোন এবং এ ক্ষেত্রে আনেৎ-এর বাঁধন—লৌহ-বাঁধন, সে ন্যায় হোক আর অন্যায় হোক। এক বিন্দু এদিক ওদিক হ'লে চলবে না, মতবাদ ওর যতই উদার হোক। ওর মতে একজনকে ভালোবাসাই হচ্ছে হৃদয়ের আভিজাত্য। সে হিসেবে সিল্‌ভী নেমে গেছে। তাই আনেৎ-এর মন জ্বলছে। সইতে পারছে না। সিল্‌ভী সিল্‌ভী—সে ভালোবাসবে একজনকে—একজনকে, কেবল একজনকে। তোমাকেই কেবল, না আনেৎ? ...হিংসুটে মেয়ে মিছে ভোলাচ্ছিলে এতক্ষণ?...হিংসের সঙ্গে সঙ্গে সিল্‌ভীর প্রতি আকর্ষণও আরও বেড়ে যায়। এবং যতই রাগ হয় ততই যেন সিল্‌ভী কাছে সরে আসে। ভালো যাকে বাসা যায়, রাগও তার ওপর করা যায়।

মিছে রাগ—মিছে ভাবা...সিল্‌ভী এমনি না হ'য়ে অন্য রকম হলোনা কেন! সিলভী ওকে যেন যাদু করে। এবারে ধীরে ধীরে আনেৎ-এর মনের কোণে রাগের বদলে উঁকি মারে কৌতূহল। কল্পনায় সিল্‌ভীর ব্যক্তিগত জীবন-ধারার ছবি আঁকে। জানে এ অন্যায় কৌতূহল। ঠেকাতেও চায়। তবু মন বসে বসে প্রাণপণে তুলি চালিয়ে চলে...ডুবে যায় আনেৎ ওই এক চিন্তায়। ভাবে আর ভাবে, কেবলি ভাবে। নিজকে সিল্‌ভীর জায়গায় রেখে বুঝতে চেষ্টা করে। কই কোথায় অন্যায়! ও যেন বোকা বনে যায়। ওর মাথা গুলিয়ে ওঠে। রাগ হয় নিজের ওপর। কেবল রাগ নয়—মন বিদ্রোহে জ্বলে ওঠে সিল্‌ভীর বিরুদ্ধে। আর কখনও যাবেনা ও সিল্‌ভীর কাছে।

সিল্‌ভীর কোন মনোবিকার নেই। আনেৎ যে এলনা এতে ওর মনের কোণে এতটুকু আঁচড়ও পড়ল না। ও ঠিক জানে, আনেৎ আসবে। অন্ততঃ দিদিকে এটুকু বুঝেছে ও। প্রতীক্ষা করেনি তা নয়। তবে তেমন একটা কিছু নয়। আনেৎ-এর পথ চেয়ে চেয়ে ওর চোখ ক্ষয়ে যাবার অবকাশ হয়নি। আছে ওর প্রেমাস্পদ—অবশ্য মনের ছোট্ট একটা ফাঁকই রয়েছে মাত্র তার জন্য—আর সেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে নয়। তা ছাড়া আরো হাজার জিনিস আছে ওর ভাবার আর করার। আনেৎকে ও ভালোবাসে বৈকি! কিন্তু এই কুড়িটা বছর তাকে ছাড়াই ওর কেটে গেছে। এখন ক'টা দিনের মাত্র কথা, সে বেশ কেটে যাবে। ও বেশ পারবে অপেক্ষা করতে। আচ্ছা আনেৎ-এর মনের মধ্যে কি হচ্ছে সিল্‌ভী কল্পনা করতে চেষ্টা করে। ভারী মজা লাগে ওর। নখ-দন্ত বের করতে চায় মনটা। জাত-বৈরী ওরা। দুটো মানুষই নয়—যেন দুটো গোটা জাতি, দুটো আলাদা শ্রেণী—চির-বৈরী ওরা। আনেৎ-এর ওখানে যেদিন গিয়েছিল সিল্‌ভী, সেদিন নিজেদের মধ্যে তুলনা ক'রে দেখেছে গোপনে।

আজ সিল্‌ভী ভাবছিল :

'তুমি পেয়েছ বটে আনেৎ? কিন্তু ঠকিনি আমিও। আমার যা আছে তোমার তা নেই…। ভেবেছ তুমি আমায় হাতের মুঠোয় পুরে রাখবে। তা হবে না। কাঁদো, ঠোঁট ফোলাও। কেমন দিয়েছি ভেঙে তোমার নীতির গুমর একঘায়ে। কেমন আনেৎ! কেমন ঘা খানা!'

সিল্‌ভী কল্পনা করে আনেৎ-এর মুখটা কালো হ'য়ে চুপ্‌সে গেল। উল্লাসে হেসে ওঠে ও। হাসতে হাসতে ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে আনেৎ-এর দিকে একটা চুমু ছুঁড়ে দেয়। সিল্‌ভী বুঝছিল আনেৎ-এর কষ্ট হচ্ছে। এত বড় তেঁতো বড়িটা গিলতে পারছে না সে যেন। তবু ওর মনে এতটুকু দরদ নেই। আনেৎ যেন ছোট্ট মেয়ে—, তেঁতো ওষুধ খেতে গিয়ে কাঁদতে বসেছে। কিন্তু খেতে তো হবেই। মনে মনে মিহি গলায় আদর করে : 'লক্ষী মেয়ে, হাঁ করতো দেখি! ঢক ক'রে গিলে ফেলো।'

কিন্তু কেবলি কি আহত নীতি-বোধের কথা, আর আহত সংস্কারের কথা?

সিল্ভী খুব ভালো ক'রে জানে, তা নয়। এ আঘাত আর এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। সহজে পারবে না সে-কথা স্বীকার করতে আনেৎ। কিন্তু সিল্ভীর আনন্দ হয়। ও বুঝে নিল দিদি ওর হাতের মুঠোয় এসেছে…এ সুযোগ ও ছাড়বে না…। দেখে নেবে কতটা ওর ক্ষমতা! বেচারা আনেৎ! পারো নিজের সাথে লড়াই করতে তুমি? পারো আনেৎ? সিলভী ঠিক জানে সে আনেৎকে আয়ত্ত করবেই। আসতে হবেই তাকে ওর হাতে। ব্যঙ্গ আর দরদে মিশিয়ে আনেৎকে ও বলে কল্পনায়:

'না না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি চাইনে কিছু করতে।'

সেকি সিল্ভী…? অন্যের দুর্বলতা নিয়ে খেলা করতে ভালোই লাগে তো তোমার! আর জীবনটাই তো লড়াই। লুটের মাল—যে জেতে সেই পায়। অপর পক্ষকে তা মেনে নিতে হয়। এবং লাভ হবে জেনেই তা মেনে নেয়।

'হোক…হোক্…দেখাই যাক…।'

[সাত]

সেদিন সোমবার। সকাল বেলা সিল্ভী বেরিয়েছিল কি কাজে। চোখ পড়ল আনেৎ-ও চলেছে ওদিকেই। সিল্ভী খানিকটা পেছনে ছিল। ভাবল মজাই করা যাক না। চলল ঠিক তার পেছন পেছন। আনেৎ অভ্যাস মত লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছে। সিল্ভী পা ফেলে ছোট ছোট। দ্রুত, লঘু নাচের ছন্দ তাতে। ওর হাসি পেল আনেৎ-এর খেলোয়াড়ী চালের পুরুষালি হাঁটা দেখে। কিন্তু তবু ওই বলিষ্ঠ প্রাণ-স্পন্দিত দেহের সুসমঞ্জস রূপ ওকে মুগ্ধও করে। মাথাটা একেবারে সোজা, না তাকায় ডাইনে না বাঁয়ে; আনেৎ সোজা চলেছে—মন ডুবে আছে কিসে কে জানে? সিলভী ওর নাগাল ধ'রে পাশে পাশে হাঁটতে লাগল; আনেৎ টের পেল না। ওর হাঁটা নকল করতে করতে আড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল আনেৎকে সিল্ভী। মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে দিদির—একটা বিষাদের ছায়াও যেন। মাথা না ঘুরিয়ে

খুব নীচু স্বরে ডাকে সিল্ভী : 'আনেৎ !' রাস্তার গোলমালে শোনা যাওয়ার কথা নয়—সিল্ভী নিজেই প্রায় শুনতে পেল না। আনেৎ-এর কানে ঠিক পৌঁছোল ডাক। অথবা কি আগে থেকেই টের পেয়েছিল যে দু-মুখো মেয়েটা ওর পেছন পেছন আসছে! তাড়াতাড়ি পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল সেই কৌতুকোজ্জ্বল চেনা প্রোফাইল, কিছু বলছেনা অথচ ঠোঁট দুটি নড়ছে একটা পরম কৌতুকে। ছোট্ট ছোট্ট চোখের বাঁকা দৃষ্টিতে হাসি উচ্ছলান। থেমে পড়ে আনেৎ। এক বিপুল আনন্দের আকস্মিক প্লাবনে ও যেন স্তম্ভিত। সিল্ভী দেখেছে ওর এই আনন্দের বিরাট রূপ—দেখেছে, বিস্মিত হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে। হাত বাড়িয়ে দিলে আনেৎ। ওর সারা দেহ কাঁপছে। সিল্ভী ভাবে নাচ্‌তে আরম্ভ করবে নাকি মেয়েটা।

আনেৎ সামলে নিলে নিজেকে। শুধু বললে: 'সুপ্রভাত, সিল্ভী।' কণ্ঠে শীতল ঔদাস্য। কিন্তু মুখ এর উদ্ভাসিত হ'যে উঠেছে আলোয়। ওদিকে সিল্ভীও ওর ছলনা বুঝতে পেরে হাসছে। আনেৎ-এর মুখোসটাও খ'সে প'ড়ে গেল। হেসে উঠল : 'ওঃ, ভারী দুষ্টু মেয়েতো! হারিয়ে দিলে।'

সিলভী নিজের বাহু জ'ড়িয়ে নিল বোনের বাহুতে। দুজনে হাঁটতে লাগল পাশাপাশি যতদূর সম্ভব গতি মিলিয়ে।

'অনেকক্ষণ আস্‌ছ?' আনেৎ জিজ্ঞেস করে।

'তা আধঘণ্টাখানেক হ'লো বৈকি।' জবাব দেয় সিল্‌ভী।

'যাঃ, কক্ষনও না।' বিশ্বাস করে না আনেৎ।

'আমি তোমার পেছন পেছন আসছিলাম তোমার হাঁটা নকল ক'রে ক'রে আর দেখছিলাম সব। সব দেখেছি, জানো? কি সব বল্‌ছিলে হাঁটতে হাটতে?'

'যত সব বাজে কথা, মিথ্যেবাদী কোথাকার!' আনেৎ বলে।

ওদের হাত আরো দৃঢ় ভাবে জড়িয়ে যায়। কথার জোয়ার ছোটে—কোথায় গিয়েছিল এখন, কি করল—সেসব কথা। ভরা মন। কথা বলতে বলতে রাস্তা পার হয়। সাংঘাতিক ভিড়—প্যারীর মেয়েদের স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় দুটো গাড়ীর মধ্য দিয়ে গ'লে পার হ'তে হ'তে মনে প'ড়ে যায় সিল্ভীর : 'ওঃ, চুমু খাওনিতো, দিদিভাই।'

ভীষণ তাড়াতাড়ি চলেছে আনেৎ। সিল্‌ভী প্রায় পিষে যাচ্ছে ওর হাতের চাপে। ফুটপাথে উঠে হাঁটতে হাঁটতেই ওরা চুমু খেল, তারপর আরো শক্ত ক'রে পরস্পরকে জড়িয়ে নিয়ে চলতে লাগল এবারে একটা অপেক্ষাকৃত জনবিরল রাস্তায়। কি রাস্তা এটা? কোন্ দিকে গেছে…?

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' হঠাৎ থেমে পড়ে ওরা। তাইতো কথায় মত্ত হ'য়ে রাস্তাই যে ভুল হ'য়ে গেল। কিন্তু ভারী মজা। হেসে ওঠে দু'জনে। সিল্‌ভী আনেৎকে জড়িয়ে ধ'রে বলে: 'চলোনা ভাই, আজ এক সাথে লাঞ্চ খাবো।'

একটু ইতস্ততঃ করে আনেৎ, [আকস্মিকের রোমাঞ্চে মুগ্ধও হয়, আবার বিব্রতও হয় ও—নিরসে বাঁধা জীবন ওর] বলে, পিসীমা অপেক্ষা ক'রে থাকবেন,. দুত্তোর ছাই পিসীমা! যত সব বাজে। সিল্‌ভী ঘাড় নাড়ে। আজ আনেৎকে পেয়েছে হাতে, ছাড়বে না সহজে। নিয়ে গেল ওকে একটা পাব্লিক টেলিফোনে, 'করো টেলিফোন পিসীকে।'

তারপর এল একটা জানা ক্রীমের দোকানে। ভারী ভালো লাগছে দু'জনেরই, বিশেষ ক'রে আনেৎ-এর—এই বাইরে এসে লাঞ্চ খাওয়া, আরো সিল্‌ভীর দেয়া লাঞ্চ। জেদ ধরেছে সিল্‌ভী ভাগ্যের দুলালী দিদিকে ঐ খাওয়াবে আজ। বড় আনন্দ, বড় আনন্দ। সব কিছুতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠছে আনেৎ। চমৎকার রুটি তো! কাট্‌লেট্—! চমৎকার রান্না হয়েছে… ষ্ট্রবেরী আসে, আসে ক্রীম…স্ফূর্তি ক'রে খায় দু'জনে।

কিন্তু খাওয়ার চাইতে কথায় ওদের মুখ ব্যস্ত রইল বেশী। কাজের কথা নয়—এ-কথা সে-কথা, অর্থহীন, ভাবহীন কথা। পরস্পরকে যেন ওরা পান করছে—পান করছে চোখের দৃষ্টি, কথা, কণ্ঠস্বর; পরস্পরের মধ্য থেকে আলো ঝরছে, আর সেই আলোর ধারাতে করছে ওরা অবগাহন। মানুষের সহজাত বুদ্ধি আপন পথ চিনে চলে। ওদেরও মন বুঝল আসল কথার সময় আসেনি এখনও। আসল কথার আশ পাশ দিয়েই ঘুরতে থাকে দু'জনে হেসে আর খুশি হ'য়ে।

'আমার কাজে যাবার সময় হ'লো।' সিল্‌ভী উঠে পড়ে।

'বারে, এখনই! কিন্তু চমৎকার লাগছিল।-আমার এখনও আশ মেটেনি যে…'

আনেৎ-এর, মুখে একটা আশা-ভঙ্গের ছায়া পড়ে—ছোট ছেলের হাত থেকে হঠাৎ খাবার কেড়ে নিলে যেমন হয়।

'আমারই বুঝি মিটেছে!' সিল্ভী হাসতে হাসতে বলে: 'আবার আর একদিন! কবে বলো!'

'যত শিগ্‌গির হয়। আজ যে ফুস্ ক'রে ফুরিয়ে গেল।

'বেশ তো আজ বিকেলেই। আমার দোকানে এসো—ছ'টা আন্দাজ।'

আনেৎ ঘাব্‌ড়ে যায়। বলে: 'আর কেউ থাকবে না তো?' আর কেউ মানে ওর ভয় সিল্ভীর সেই বন্ধুকে।

সিলভী বোঝে: 'না গো, না। আর কেউ থাকবে না। হ'লো?' একটু প্রশ্রয়ের সুর ওর স্বরে। একটু ব্যঙ্গও ফুটে ওঠে বলার ভঙ্গিতে। তারপর বলে বন্ধু নেই এখানে। গেছে বাড়ী, সেখানে থাকবে দিন দুই তিন। সিল্ভী বুঝতে পেরেছে দেখে আনেৎ লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে। ওর মনেই ছিল না দিন রাত জপে জপে ও সংকল্প ক'রেছে সিল্ভীকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেবে যে তার চরিত্রের প্রতি কোন নৈতিক সমর্থন নেই ওর। যাই হোক মন্দের ভালো আজ সে লোকটা থাকবে না। সুতরাং পরস্পরকে একান্ত ক'রে কাছে পেয়ে সন্ধ্যেটা নিবিড় হ'য়ে উঠবে।

আনন্দে হাত তালি দেয় আনেৎ। মনের কথাটা বলেই ফেলে। সিল্ভী নাচের ভঙ্গিতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হেসে ওঠে। বলে: 'আজ সবাই খুশি।' কে আরেকজন এসে দোকানে ঢোকে—সিল্ভী একটু সংযত ক'রে নেয় নিজকে। তারপর বিদায় নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

কয়েক ঘণ্টা পরের কথা। আনেৎ এসেছে সিল্ভীর দোকানে। বেরুবার সময় হয়েছে। মেয়ে শ্রমিকদের কথা, হাসি, গল্প, পায়ের শব্দে মুখর হ'য়ে উঠছে ঘর। কেউ ছোট পকেট থেকে আয়না বের ক'রে চুল ঠিক ক'রে নিচ্ছে। কেউ বা অন্য কারুটা দেখে বা দোকানের আয়নাতেই সে কাজ সারছে। সবই পাশ দিয়ে যাবার সময় ঘুরে তীক্ষ্ণ কুতূহলী দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিল আনেৎকে—চোখে তাদের সারাদিনের অবসাদ। খানিক দূর গিয়ে আর একবার ফিরে তাকাল—সিল্ভী তখন আনেৎকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খাচ্ছে।

সিল্‌ভীকে আনেৎ বুল্‌তে নিয়ে গেল,—ও আসতে চেয়েছিল। পিসী আসল পরিচয় জানতে পারলে কি-না-কি ব'লে বসবেন—সেই ভয়ে রাস্তাতেই ঠিক হ'লো সিল্‌ভীকে বুড়ীর কাছে বন্ধু ব'লে পরিচয় দেবে। বুড়ীর বড় ভালো লাগে সিল্‌ভীকে। খাবার পর শুতে যাবার আগেই সিল্‌ভী তাকে পিসী পিসী ব'লে সম্পর্কটা একেবারে কায়েম ক'রে নিল।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা—স্বচ্ছ, সুন্দর। সিল্‌ভী আর আনেৎ বেড়াচ্ছে বাগানে। পরম অন্তরঙ্গতায় হাতে হাত ধরা। দিন শেষের মূর্ছিত ফুল আপনার শেষ দান ঢেলে দিয়েছে বাতাসে। সে-সৌরভ বাতাস ছড়িয়ে দিলে দুই বোনের বুকে মুখে আর মর্মে। তার ছোঁয়ায় ওদের চিত্তের রহস্য-পুরীর দ্বার গেল খুলে। আজ আনেৎ-এর প্রশ্নে সিল্‌ভী চুপ ক'রে থাকে না। অকপটে ব'লে যায় সব—প্রথম থেকে জীবনের যত কাহিনী। বিশেষ ক'রে বাবার কথা। আজ ওরা প্রাণ খুলে এই পরম আত্মীয়ের কথা আলাপ করে। বাধে না কোথাও। আজ কোনখানে এতটুকু জ্বালা নেই। বাবা আজ ওদের দুজনের যৌথ অধিকার। সহজ ভাবে প্রশ্রয় রেখে সমালোচনা করে মানুষটাকে। বেশ লোক—চমৎকার! মজার মানুষ, না! তবে স্বভাবটি যা একটু···[তা পুরুষগুলো সবাই তো অমনি]···আর রাওলের ওপর রাগ নেই ওদের।

'আচ্ছা দিদি—' সিলভী বলে: 'বাবা যদি লক্ষ্মী ছেলেটি হ'তেন আমি আসতুম কোত্থেকে—'

আনেৎ ওর হাতে একটা মৃদু চাপ দেয়।

'উঃ ছাড়ো, হাতটা ভেঙ্গে দিলে যে।' সিলভী ব'লে চলে:

···দোকান, মায়ের ফুলের দোকান। ছোট সিল্‌ভী ব'সে থাকে টেবিলের তলায় ফেলে-দেয়া ফুলের গাদার মধ্যে···সেখানে বসে গাঁথে ওর প্রথম স্বপ্নের মালা। মায়ের কথা আর খদ্দেরদের আলাপ ব'সে ব'সে শোনে—ওই টেবিলের তলায় ব'সে ওর প্রথম প্যারীর জীবন-ধারার অভিজ্ঞতা। ডেলফী যখন মারা যায়, ওর বয়স সবে তের। মায়ের বন্ধু এক, পোষাকের দোকান তাঁর। সেই নিলে ওকে কাজ শিখতে। এক বছরের মধ্যে সেও চোখ বুজল। মরার বয়স তার হয়নি; খেটে খেটে দেহটা ক্ষয়ে গিয়েছিল। প্যারীর মানুষরা অমনি

করেই করে করে অকালে ফুরিয়ে যায়। তারপর···শুধুই কঠিন বাস্তব। আসলে অবিকৃতদেখা জগৎ থেকে কুড়ান কত রকমের কত তিক্ত অভিজ্ঞতা। কিন্তু সিল্ভী হেলায় বলে যায় হাল্কা সুরের হাওয়ায় বাস্তবের তার উড়িয়ে দিয়ে। অদ্ভুত মেয়ে। মানুষের চরিত্র চিত্রনের পদ্ধতি তার অদ্ভুত। কথার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ আলগা ভাবে বসিয়ে-দেয়া একটা টুকরো হাসি, একটা টুকরো কথা বা একখানা মুখ শুধু—বাস্ এর বেশী নয়। যেন কাগজে এলো মেলো ছুঁচের ফোঁড় দিয়ে গেল, আর হ'য়ে গেল একটা গোটা ছবি।

অবশ্য সব কথাই কিছু আর খুলে বল্লেনা ও। যতটুকু বললে তার চেয়ে ওর অভিজ্ঞতার পরিসর অনেক বেশী···এত বেশী যে মনে রাখা কঠিন। হয়ত স্মৃতির ফটো দিয়ে কত বস্তু ঝরেই পড়ে গেছে। ধরে রাখা দরকার মনে হয়নি ওর। ওর বন্ধু—অর্থাৎ সর্বশেষ যিনি মানে বর্তমান যিনি বন্ধু পদবাচ্য, [আরো অধ্যায় থাকলে সে অপ্রকাশই রইল] তার প্রসঙ্গ আসে কথায় কথায়। কৃপণের মত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয় সিল্ভী। ডাক্তারী পড়ে সে। দেখা হয়েছিল এক বল-নাচের আসরে [ওঃ, ভারী নাচ ভালোবাসে সিল্ভী। নাচের জন্য মদ খাওয়াও ছাড়তে পারে ও] চেহারা তেমন কিছু নয়, তবে মন্দও নয়। বেশ লম্বা চওড়া। গায়ের রং পাকা বাদামী। চোখ দুটো ঝলমলে, কিন্তু কোণের দিকে রেখা পড়েছে দু'চারটে। বনেদী কুকুরের মত নাকের ছিদ্র উপরের দিকে উল্টোন। স্নেহপ্রবণ নরম-স্বভাবের মানুষ। হাসতে পারে, হাসাতেও পারে। সিল্ভীর বর্ণনায় উচ্ছ্বাস ছিল না। সাধারণ-ভাবে বলে যায়, ভাল যা তাকে ভালও বলে, টিপ্পনীও কাটে মাঝে মাঝে। তবে নিজের নির্বাচনে ও বেশ আত্মপ্রসন্ন তা বোঝা গেল। পুরনো কোন হাসির কথা মনে ক'রে মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হাসে ও। আনেৎ উদগ্রীব হ'য়ে শোনে। উদগ্র কৌতূহল নিয়ে ওর মনটা ব্যথায় যেন ভরে আছে। দু' একটা সামান্য কথা ছাড়া ও চুপ করেই থাকে। সিল্ভীর এক হাতে ওর হাত ধরা। আর এক হাত দিয়ে সে ওর আঙুলের ডগাগুলিকে পরম স্নেহে নাড়াচাড়া করছে—যেন জপমালা। সিল্ভী বুঝছে অত্যন্ত বিব্রত আর অপ্রতিভ হ'য়েছে আনেৎ। আর এর জন্য আনেৎকে ভাল লাগছে আরো বেশী।

গাছের তলায় একটা বেঞ্চিতে বসে আছে ওরা। অন্ধকার হ'য়ে গেছে। কিছু দেখা যাচ্ছেনা—পাশের লোকওনা। অন্ধকারে দুষ্টু সিল্‌ভীর সুবিধাই হয়েছে। যত রাজ্যের যত অত্যুগ্র প্রেমের অশ্লীল লীলা সবিস্তারে ব'লে যায় ও—শুনতে ভদ্র রুচিতে বাধে। আজ ও আনেৎ-এর ওপরে এক হাত নেবে। সেদিনের দিদিপনা দোখানোর শোধ তুলবে আজ। আনেৎ ওর অভিসন্ধি বোঝে। কিন্তু বুঝতে পারেনা এ ক্ষেত্রে সায় দেবে, না, ধমক দেবে সিল্‌ভীকে। গাল দেয়াই উচিত। কিন্তু কি সুন্দর মিষ্টি মুখ মেয়েটার, কথায় আর গলার স্বরে কি স্ফূর্তির ঝঙ্কার—মনে তো হয়না ওর ভেতরকার স্বতোৎসার এই আনন্দের মধ্যে পাঁক মেশনো আছে। এসব কাহিনী শুনে আনেৎ-এর ভেতরে যেন ঝড় ওঠে। ঝড়ের ঝাপটা চাপা থাকে না। ওর হাতের স্পর্শেই আলোড়িত চিত্ত উদ্ঘাটিত হ'য়ে যায় সিল্‌ভীর কাছে। উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে সিল্‌ভী, বানিয়ে বানিয়ে আরো হাজার খানা ক'রে বলে। হঠাৎ এক সময় কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞাসাই ক'রে ফেলে, কাউকে ভালবাসে আনেৎ? আনেৎ চমকে ওঠে—লাল হ'য়ে ওঠে। এ অতর্কিত আক্রমণের জন্য ও প্রস্তুত ছিল না। সিল্‌ভীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অন্ধকারের আড়াল থেকে আনেৎ-এর মুখ দেখতে চেষ্টা করে। কিন্তু দেখা যায় না কিছু। অতএব হাতখানা বুলিয়ে দেয় ওর মুখের ওপর।

'উঃ, আগুন বেরুচ্ছে যে মুখ দিয়ে, আনেৎ! ব্যাপার কি?' হাসে সিল্‌ভী।

অপ্রতিভ ভাবে হাসতে থাকে আনেৎ এবং আরো লাল হ'য়ে ওঠে। সিল্‌ভী ওর গায়ে এলিয়ে পড়ে।

'কি বোকা আর ছেলেমানুষ দিদিভাই তুমি! না না, কে বলে বোকা! তোমার মত অমন মেয়ে শ'য়ে একটা মেলে না। রাগ করো না। আমার কিন্তু কান্না পেয়ে যাবে। আমায় আবার রাগ ক'রে সরিয়ে দিও না যেন। তোমার মত ভালো মেয়ে আমি নই বটে—কিন্তু যাই হই, বোন তো তোমার। আনেৎ, আনেৎ, আমার দিদিভাই···দাও দেখি মুখটা—'

ব্যাকুল ভাবে আনেৎ জড়িয়ে ধরে সিল্‌ভীকে—চাপে ওর দম বন্ধ হ'য়ে যায়। সিল্‌ভী ছাড়িয়ে নিয়ে বলে:

'বেশ তো চুমু দিতে জানো দেখছি! কে শেখালে বলো না!' ও নিজে যেন জানে এমনি ভঙ্গি কথার।

তাড়াতাড়ি ওর মুখ চেপে ধরে আনেৎ। 'কেবলি বাজে বকিস্ না।'

সিল্‌ভী ওর হাতে চুমো খায়।

'আচ্ছা, আচ্ছা এবার মাপ কর, আর করব না।'

গালটা আনেৎ-এর বাহুর ওপর রেখে ও চুপ ক'রে পড়ে থাকে, শোনে আনেৎ-এর কথা। আনেৎ ওর মুখের ওপর ঝুঁকে কথা ব'লে চলে নীচু স্বরে। গাছের ডালের ফাঁকে আবছা এক ফালি আকাশ তরল অন্ধকারের ভেতর থেকে আপনাকে আড়াল ক'রে রেখেছে। তারই পটভূমিতে আনেৎ-এর মাথা। মুখখানা পড়তে চেষ্টা করে সিল্‌ভী।

আনেৎ নিজের কথা বলে—অপূর্ব, অজস্র বৈভবে ভরা ওর নিরালা যৌবন—ঘুম-ভাঙ্গা-ডায়েনার প্রথম আলো-দেখা-যৌবন—প্রাণময়, জীবন্ত, দীপ্ত। কিন্তু আজও তার বুকে হাওয়া লাগেনি, এতটুকু ঢেউ জাগেনি সেই প্রাণ-সমুদ্রে। যা কিছু ওর আছে, আর যা আছে ওর কামনায় ভরা মনে, আনন্দ দিয়ে অভিষেক ক'রে রেখেছে তা। কারণ, যা ও চায় আর যা পেয়েছে তার মধ্যে ব্যবধান শুধু রাত আর প্রভাতের। ও জানে রাতের শেষে প্রভাত আসবেই। অতএব থাক, ফুল বোঁটায়ই। সেখান থেকেই ঢালুক সুবাস। তুলে আনার তাড়া নেই ওর।

ঘটনাহীন, একটানা সেই আত্ম-কেন্দ্রিক দিনগুলি আর তার নিরুদ্বেগ প্রশান্তি; বৈচিত্র-হীন অথচ স্বপ্নের রাগে রাঙ্গা। বাবাকে ভালোবেসেছে নিজকে একেবারে ঢেলে দিয়ে, ভুলে গিয়ে। ওর জীবন সবখানি জুড়ে ছিলেন তিনি।

আজ নিজের কথা বলতে গিয়ে নিজকে আবিষ্কার করে আনেৎ। তার আগে অতীতকে ঘেঁটেঘুটে দেখার অবকাশ আর হয়নি। মুহূর্তের জন্য শংকিত হ'য়ে ওঠে ও। থেমে যায় কথা। বলতে বাধে, প্রকাশের ভাষা জোটে না···আবার অকস্মাৎ উথলে ওঠে চঞ্চল আবেগের জোয়ার; ব্যঞ্জনায় রংএর খেলা জাগে।

সিল্‌ভী বোঝে না সব। তবু কৌতুক বোধ করে। ও কেবল আনেৎ-এর মুখ দেখে; নিরীক্ষার দৃষ্টিতে দেখে ওর গলা, দেহ সর্ব অবয়ব। কি যে বলছে আনেৎ, ওর কানে বড় একটা যায় না।

বলে গেল আনেৎ সেদিনের কথা যেদিন আবিষ্কার করলে আড়ালে বাবার আরও এক সংসার আছে—আছে তাঁরই এক আত্মজা ওরই আপন বোন, ওর প্রতিদ্বন্দ্বী, ওর অংশীদার। সেদিন দেখে ও জ্বলেছে, পীড়িত হয়েছে। ওঃ কি কষ্ট পেয়েছে আনেৎ—আজ অকপটে বলে গেল সব। কিছু লুকোল না, সংকোচ রইল না এতটুকু কোন। চিত্তের প্রতি কোষ ওর বাষ্পায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে···বলে যায়···হ্যাঁ, বলো আনেৎ, ঘৃণা করেছিলে তুমি সিল্‌ভীকে—ঘৃণা···। 'ঘৃণাও করেছি তোমায় জানো!' বলে আনেৎ তীব্র স্বরে! নিজের স্বরের উগ্রতায় চমকে থেমে যায়। সিল্‌ভীর কিছু বিকার নেই। ও ব্যগ্র কৌতূহলে শুনে যায়। আনেৎ-এর হাতের ওপর ওর গাল—ও টের পায় হাতখানা কাঁপছে থর্‌ থর্‌ ক'রে। 'আগুন জ্বলছে ওর মধ্যে—' ভাবে সিল্‌ভী।

ছিন্ন সূত্রের খেই টেনে বলে যায় আনেৎ। নিভৃত লোকের আঁধারের বস্তু, তাকেই আজ বাইরে টেনে আনলে ও বহু আয়াসে। সিল্‌ভী ভাবে—অদ্ভুত মেয়ে, আমাকে কেন বলছে এসব কথা? কিন্তু এই অদ্ভুত বোনটার ওপর শ্রদ্ধা হয় সিল্‌ভীর। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটু ব্যঙ্গ মেশান বটে—কিন্তু স্নেহে সরস। সিল্‌ভী আদরে গলে গিয়ে ওর হাতে গাল ঘষে। আনেৎ ব'লে চলেছে: ···দেখেনি সিল্‌ভীকে, কিন্তু দুর্বার টানে সে টানলে ওকে। ভেসে গিয়েছিল আনেৎ। ডুবে গিয়েছিল। তারপর সেই প্রথম দেখা···। কিন্তু এবারে আর পারে না। আবেগে ওর কথা ডুবে যায়···মুখে ভাষা জোগায়না—শেষে হাল ছেড়ে বলে ওঠে: 'না, আর পারবনা···।'

মৌন পরিবেশ···সিল্‌ভী হাসছে শুধু। মাথা তুলে আনেৎ-এর মুখের কাছে মুখ নিয়ে ওর চিবুকে একটা চিমটি কেটে বললে: 'তুমি যে প্রেমের সাগর গো!

'আমি?' আনেৎ অপ্রতিভ হ'য়ে প্রতিবাদ করে···।

সিল্‌ভী উঠে দাঁড়িয়েছে। আনেৎ-এর হাতটা নিজের বুকে চেপে বলে: 'বেচারা।'

[আট]

দু' বোনের এখন দেখা হয় প্রায়ই। সপ্তাহে একবার অন্ততঃ ধরা আছেই। সিল্‌ভী প্রায়ই সন্ধ্যা বেলায় এসে ওকে চমকে দেয়। আনেৎ আজকাল ওর ওখানে কম যায়, এবং গেলেও সিল্‌ভীর বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়না,—হবেনা এমনি বন্দোবস্ত দু'বোনে ক'রে নিয়েছে। একটা দিন ঠিক করা আছে যখন ওরা সেই ক্রীমের দোকানে গিয়ে লাঞ্চ খায় তারপর ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গটাই ওদের আসল্ আনন্দ—প্রয়োজনও। যেদিন দেখা না হয় সেদিনটার দৈর্ঘ্য দু'জনের কাছেই দুঃসহ। এমনিতে আনেৎ-এর মুখে কথা নেই; বুড়ী পিসী চেষ্টা করেও ওর মুখ খুলতে পারে না; আর সিল্‌ভীর মেঘাচ্ছন্ন মুখও তার কাছে হ'য়ে ওঠে অকারণ রহস্য। দু'হাতে কথা জমিয়ে মনের ডালি ভ'রে ওরা প্রতীক্ষার ফাঁক ভরায়, আর দেখা হ'লে সেই ডালি ঢেলে দেয় ওরা দু'জনের সামনে। তবু ফাঁক ভরেনা পুরো।

সেদিন রাত দশটার পরে ঘণ্টা বেজে ওঠে। দমকা হাওয়ার মত সিল্‌ভী এসে ঢোকে ঘরে: 'ও আনেৎ, একটা চুমু না খেয়ে আর কিছুতেই থাকতে পারলাম না, সকাল পর্যন্তও না। তাই এসেছি।'

এত আনন্দ আনেৎ একদিনও আর পায়নি। ওকে থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। 'বাপ্‌রে পাঁচ মিনিটের বেশী এতটুকুও না। সময় নেই। কেবল একটা চুমু খাবার জন্য সব ফেলে ছুটে এসেছি, দিদি ভাই।' থাকলে না কিছুতে অথচ কথায় কথায় একটি ঘণ্টা কাটিয়ে গেল।

আনেৎ চায় সিল্‌ভী এসে ওর সর্ব সৌভাগ্যের অংশী হ'য়ে থাক এখানে। কিন্তু কিছুতেই ধরা দেয় না মেয়েটা। কোনো লোভ ওকে টানতে পারে না। ওর খেয়ালী মন পণ করেছে দিদির কাছ থেকে টাকা নেয়া চলবে না। ঋণ হিসেবেও না। অথচ ছোট খাটো এটা সেটা, প্রসাধনের জিনিস দু'একটা নিতে ওর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। অবশ্য নেয় 'ধার' ব'লে। [শোধ দিতে

যদিও মনে থাকে না কোনোদিন]। দু' এক সময় বলেও ফেলেছে—ও আর এমন কি, ভারী তো একটা জিনিস…! কিন্তু টাকা সত্যি কোনদিন নেয়নি। ও পবিত্র বস্তু কি ছোঁয়া যায়! কিন্তু ছোট খাটো সাধারণ গয়নাটা আসটার লোভ ও সংবরণ করতে পারে না। আনেৎ ওর এই ছল লক্ষ্য ক'রে অপ্রতিভ আর বিব্রত হয়—কেন সিল্‌ভী চায় না? আনেৎ-এর যে কত আনন্দ হয় দিতে। কিন্তু উপায় কি? অগত্যা ও না দেখার ভান করে। মাঝে মাঝে ওরা জামাটা এটা সেটা বদল করে। আনেৎ-এর এতেই আনন্দ ধরে না। ওর ভালোবাসা এটুকুর মধ্যেও অনেকটা স্বার্থকতা খুঁজে পায়। আনেৎ-এর জামা কাপড় সিল্‌ভী নিজের উপযোগী ক'রে নেয় কুশল হাতে। আবার ওদিকে ওর সংযত-রুচিবোধের উপর সিল্‌ভীর ছাপ পড়ে অজ্ঞাতসারে। অনুকরণটা উৎসাহ-প্রাবল্যে প্রায়ই একটু বেশী দূরে চলে যায় অনেক সময়। ফলে ওর নিজস্ব ষ্টাইল যেটা, আর একমাত্র যা ওকে মানায়, সেটা ধার করা রঙ চঙ মেখে কুমোরের সস্তা দামের পুতুল হ'য়ে ওঠে। সিল্‌ভী হেসে কুটিপাটি হয়। ওকেই আবার উঠে প'ড়ে লাগতে হয় দিদির উৎসাহের মাত্রা খাটো করতে। সিল্‌ভী হুঁসিয়ার মেয়ে, আনেৎ-এর ভদ্র রুচি-জ্ঞান ও বেমালুম আত্মসাৎ ক'রে নেয় কোনো ঋণের স্বীকৃতি না রেখে। কিন্তু এমনি ওর পরিষ্কার হাত যে কে যে আসল আর কে নকল তা ঠাহর করতে পারে না বাইরের লোকে।

এত কাছাকাছি থেকেও আনেৎ সিল্‌ভীর জীবনের একটা অধ্যায়েরই পরিচয় পেল শুধু। সিল্‌ভী তার স্বাধীন দুনিয়ায় পরিতৃপ্ত। আনেৎকে সে একথা বুঝিয়ে দিতে চায়। কিন্তু মনের তলায় শ্রেণী বিদ্বেষ ওর জমাট বাঁধা। আনেৎকে ও বুঝিয়ে দিতে চায় ওর স্বাধীন এলাকায় কারো হস্তক্ষেপ বা কর্তৃত্ব চলবে না। ও নিজে যাকে পাসপোর্ট দেবে সে ছাড়া কারো কোনো সময় সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। আত্ম-বিলাসী সিল্‌ভী বুঝেছিল অনেক কিছুই আনেৎ সমর্থন করে না। বিশেষ ক'রে ওর প্রেম-ঘটিত ব্যাপার মেনে নিতে চেষ্টা সে করে বটে। কিন্তু ভেতরকার প্রতিবাদ চাপা থাকে না। এ সব প্রসঙ্গ ও এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু এক এক সময় বাধ্য হ'য়ে আলোচনায় যোগ

দিতে হয়। তখন সিল্‌ভী আঘাত না পায় এই থাকে ওর লক্ষ্য, সুতরাং ওর কথায় জোর থাকে না। সিল্‌ভীর চোখ এড়ায় না। চতুর সে, মুহূর্তে কথার মোড় ঘুরিয়ে নেয়। আনেৎ-এর মন এতেও ব্যথা পায়। ও সারা বুক দিয়ে চায় সিল্‌ভী সুখী হোক—যা নিয়ে হোক, যেমন ক'রে হোক, কেবল সুখী হোক। কিন্তু ও ওকে জানতে দেবে না ওর মনের সত্য, জানতে দেবে না, সিল্‌ভী যে-পথে চলেছে সে-পথকে মেনে দিতে ও পারছে না।

কিন্তু যত সংকল্পই থাক, সত্য বেরিয়ে পড়ে। আবেগের মুখে তীক্ষ্ণ অনুভূতি বাধা মানে না। সিল্‌ভী এতে আবার দুঃখ পায় এবং চুপ ক'রে থেকে শোধ নেয়। এমনি করেই দিন চলে। কিন্তু একদিন সিল্‌ভীর জীবনের এক বিশেষ অধ্যায় আনেৎ-এর চোখের সামনে খুলে গেল।

বিশেষ অধ্যায়—কিন্তু সিল্‌ভী তার এতটুকু গুরুত্ব দেয়নি। হয়তো ওর বেগ আর ব্যাপ্তিধর্মী মন সব কিছুকে ঝেড়ে ফেলে অতি সহজে। নয়তো বা বাস্তবের গুরুত্ব মেনে নিতে ওর গর্বে বেঁধেছে। এবং সেই কারণেই ও হেসে লাঘব করতে চায় যা লঘু নয় তাকে। এটা ওর আত্মছলনা। এবং এই কারণেই ও ব্যাপারটা আনেৎকে এতদিন জানতে দেয়নি। ঘটনা চক্রে সেদিন লক্ষ্য করল আনেৎ যে বেশ 'কিছুদিন হলো' [ঠিক কতদিন তা বলা শক্ত—প্রায় 'প্রাচীন ইতিহাসে' দাঁড়িয়ে গেছে] সেই ভদ্রলোক অর্থাৎ সিল্‌ভীর বন্ধুটি আর আসছেন না। ওদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। এত বড় ঘটনায়ও সিল্‌ভীর কোন বিকার হয়নি। কিন্তু আনেৎ-এর হ'লো। একটু অপ্রতিভ ভাবেই ও ব্যাপারটা জানতে চেষ্টা করল। সিল্‌ভী কাঁধটা একটু নেড়ে হেসে জবাব দিল: 'কি আবার হবে। ফুরিয়ে গেছে, বাস্!' আনেৎ-এর উল্লসিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হ'তে পারল না। সিল্‌ভীর শেষের কথাগুলোয় ও মনে আঘাত পেল...। কি অদ্ভুত মেয়ে! কি অদ্ভুত মন! কিন্তু কি অন্যায়... ভাবে আনেৎ। 'ফুরিয়ে গেছে!' অন্তরের জগতে ফুরোয় নাকি আবার কিছু... আর অত সহজে!...অমন ক'রে হাসতে পারলে কি করে ও!

এই মস্ত বড় [আনেৎ-এর কাছে বড় বৈকি!] সংবাদটার অল্প পরেই আরেকটা নতুন খবরও পাওয়া গেল...। প্রায় আবিষ্কারই বলো। সেদিন

আনেৎ দোকানে এসে সিল্‌ভীকে বলল ছুটির পর সে আসবে সিল্‌ভীর ওখানে।

সিল্‌ভী শান্তভাবে বলল: 'ওখানে যাবে কি, আমি ওখানে থাকি না এখন আর।'

'অর্থাৎ? কবে থেকে?' আনেৎ অবাক হ'য়ে যায়।

'তা কিছুদিন হ'ল বৈকি।' [ঠিক সময়টা কিছুতেই বললে না। কালও হ'তে পারে, অথবা গতবছর, না সিল্‌ভী?]

'কেন, কি হয়েছিল?'

'নূতন কিছু নয়। যা প্রতিবার হয়। গ্র্যাণ্ড প্রিকস রেসের পর। আমাদের মালিকরা ভুল ঘোড়া ধরেন আর রেসে হেরে তল্পী গুটোকেন আর আমরা ছাঁটাই হই।'

'কোথায় আছিস তাহ'লে?'

'এই এখানে সেখানে! থাকলেই হ'লো। ঘুরি ফিরি, এটা সেটা করি।'

আনেৎ হতভম্ব হ'য়ে গেল।

'তাহ'লে কাজও নেই। আর আমাকে বলিসনি!'

একটু ভারিক্কী চালে সিল্‌ভী জানায়, (মনে মনে খুশি হয় যে ওর জন্য আনেৎ এতটা ব্যস্ত হয়েছে) কিছু করে না তা নয়—করে এদিক ওদিক ছোট খাট কাজ—এই কিছু বাচ্চাদের জামা—নিজে সেলাই করে, টেকে টুকে দেবার অর্ডারও নেয়, প্যান্ট ইত্যাদিও সেলাই করে দু'চারটে। খুব হাসতে হাসতে নেহাৎ হেলায় কথাগুলো বললে, যেন খুব হাসির কথা, নেহাৎ বাজে হাল্কা কথা। আনেৎ হাসে না। হাসতে পারে না। নানা প্রশ্ন ক'রে এটুকু বের ক'রে নিলে যে সিল্‌ভী কাজের জন্য খুব চেষ্টা করছে এবং আয় না থাকাতে খুব অসুবিধায় পড়েছে। এবং মাঝে মাঝে তাকে এমন কাজও করতে হয় যা করতে ওর রুচিতে বাধে, ভালোও লাগে না এবং খাটুনিও অমানুষিক।

আনেৎ বুঝতে পারে কেন সিল্‌ভীর চেহারা অমন এবং কেন কিছুদিন হ'লো ওর ওখানে আসেওনি। জিজ্ঞাসা করলে নানান ওজর দেখিয়েছে। আসলে রাত

জেগে ও সেলাই করেছে, বুঝেছ আনেৎ? যেন কিছুই হয়নি এমনি ক'রে সিল্ভী নিতান্ত লঘুভাবে ওর চাকুরী খোঁজার দুচারটে ব্যর্থ কাহিনী বলে যায়, আর হেসে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ওর চোখ এড়ায় না, আনেৎ-এর ঠোঁট কাঁপছে রাগে। 'অন্যায়, অন্যায়, নিতান্ত অন্যায়,' আনেৎ হঠাৎ ফেটে পড়ে: 'আমি কিছুতেই সহ্য করব না। এদিকে বলো আমায় ভালোবাস? নিজেই এগিয়ে এসে আত্মিয়তা করতে—আর কি ক'রে আমার কাছ থেকে এত বড় ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতে পারলে…'

'ছোঃ ভারী তো ব্যাপার!' ঠোঁট ফুলিয়ে জবাব দেয় সিল্ভী। আনেৎ ওর মুখ চেপে ধরে, ওর চোখে বন্যা নেমে এসেছে ততক্ষণে…।

'আমি বিশ্বাস ক'রেছিলাম তোকে। ভেবেছিলাম আমি যেমন আমার সুখ দুঃখের সব কথা তোকে খুলে বলি, তুইও বলবি। বিপদে পড়লে অন্ততঃ লুকোবিনা। আমি জানি, যা হয় আমরা দু'জনে ভাগ ক'রে নেব—সুখ দুঃখ সব। আর তুই কিনা নেহাৎ পরের মত আমায় এক পাশে ঠেলে রাখলি। কিছুই জানতে দিলিনে আমায়। আজ কথায় কথায় হঠাৎ না বেরিয়ে পড়লে তো কিছুই জানতে পারতাম না যে এত কষ্টে পড়েছিস আর চাকুরির জন্য এমনি ক'রে হন্যে হ'য়ে ঘুরে ঘুরে শরীরটার মাথা খাচ্ছিস। এমনি করতে করতে হয়ত হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে বসতিস্ যা তা একটা। আমি জানতেই পারতাম না কিছু। তুই জানিস না, তোর এতটুকু করতে পেলে আমার কত আনন্দ হয়! না, এ তোর বড় অন্যায়, অবিচার…জানিস্না সিল্ভী, কত বড় আঘাত আমায় দিলি আজ…। এই তোর আমাকে আপন মনে করা! আমাকে ভালোবাসা! সব তোর বাজে কথা। এ আমি বরদাস্ত করব না কিছুতে…। যাক, যা হয়েছে। এখন প্রথম কথা হ'লো—তুই আসছিস্ আমার সঙ্গে, এবং থাকছিস আমার কাছে যতদিন না মন্দার এসময়টা উৎরে যায়…।

সিল্ভী মাথা নাড়ে।

'খবরদার, মাথা নাড়া-টাড়া নয় বলছি, সিল্ভী। ভালো চাসতো কথা শোন্। নইলে বুঝবি। কথা না যদি শুনিস্, এজন্মে, খবরদার, মাথা নড়া

টগ্গা নয় বলছি। ভালবাসতো কথা শোন্‌। নইলে বুঝবি। কথা না যদি শুনিস এজন্মে আর তোর মুখ দেখব না।'

'না গো না, তা হয় না!' কেন হয়না সিল্‌ভী তা বলে না, কেবল ঘাড় নাড়ে আর জোরে জোরে হাসে। আনেৎ-এর ভাবনা দেখে ওর খুব ভালো লাগছে। ওঃ দিদিটা কেমন একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে। কেঁদে ফেল্‌লে দেখছি—মেরেই বুঝি বসে! উত্তেজিত হ'লে বেশ দেখায় দিদিকে—সিল্‌ভী ভাবে।

রাগে আনেতের মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে···কখনও অনুনয় বিনয় করে, কখনও শাসায়।

'বল্‌ সিল্‌ভী, তুই আসবি। বল্‌ থাকবি···বল্‌···আমি যে বলছি রে··· থাকবি কেমন? ঠিকতো? না না···থাকবি বল্‌না···হঁ্যা বল্‌···'

ঠিক তেমনি হেসে দুষ্টু মেযেটা জবাব দেয়:

'হঁ্যা নয়? না,না-গো, না—'

হাসি দেখে গায়ে জ্বালা ধরে। আনেৎ এক ঝটকায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

'বেশ, তাহলে এখানেই শেষ।'

পেছন ফিরে ও জানালায় গিয়ে দাঁড়ায় এমন ভাবে যেন সিল্‌ভী যে ওখানে আছে সেকথা ওর মনেই নেই। সিল্‌ভী খানিক ক্ষণ চুপ ক'রে থাকে তারপর তোষামোদের সুরে বলে:

'আসি দিদি ভাই তাহলে।'

আনেৎ ফিরল না। বলল: 'এসো।'

ওর হাত দুটো শক্ত মুঠো হ'য়ে ওঠে। ফেরেনি ভালই, নইলে কি হতো কে জানে। হয়তো ফুপিয়ে কেঁদেই উঠতো। কিন্তু ও ফিরলনা, নড়লনা, চুপ ক'রে শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল রণং দেহি ভঙ্গিতে। সিল্‌ভী কেমন বিব্রত বোধ করে, অস্বস্তি লাগে বড়। আবার মজাও লাগে ভারী। চলে গেল ও।

কেমন চমৎকার ভঙ্গিতে ও মাথা উঁচু ক'রে দিদিকে ঠেকিয়ে চলে এল। বেশ একটু আত্মশ্লাঘা বোধ হয় সিল্‌ভীর। আনেৎ-এর নিজের উপর রাগ হয়। নাঃ, ঠিক হয়নি এমন ভাবে রাগ করা! এখন করা যায় কি। ও পথ পায় না—

জলে নেমে নৌকোটা পুড়িয়ে দিয়েছে—এখন ডাঙ্গায় আসায় উপায় কি। একটু ধৈর্য্য ধরে থাকলেই কলকৌশল ক'রে জেদী মেয়েটাকে ফেরান যেত। তা না ক'রে তাড়িয়ে দিলে ওকে। আর কি আসবে ফিরে? কক্ষনও না—যে মেয়ে বাপ! আনেৎ হিত করতে বিপরীত ক'রে বসল। এখন ওকে ফেরান যায় কি বলে! এখন কি বলে আর তার পেছনে ছুটবে। গর্বে ঘা লাগবে যে! মনও বলছে ঠিক হয়েছে—যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

না না কক্ষনও না, যাবেনা আনেৎ।

কিন্তু তক্ষুনি টুপীটা পরে সোজা সিল্‌ভীর আস্তানার দিকে ছুটল।

বাড়ীতেই এসেছে সিল্‌ভী। বসে ভাবছে একটু আগের বিশ্রী কাজটার কথা—তলিয়ে বুঝে দেখতে চেষ্টা করছে। অনর্থক এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল যার কোন মানে হয় না। এখন কি করা যায়? মাথা সে নোয়াতে পারবে না আনেৎ-এর কাছে। আর আনেৎই কি মাথা নোয়াবে? উঁহু। কখনও না। ও ভেবে দেখল, অন্যায় হয়নি। কিন্তু তবু ও পারবে না মাথা নীচু করতে। সম্পদের মাহাত্ম্য সিল্‌ভী বোঝেনা তা নয়। আর ওর অজ্ঞাতসারে আনেৎ-এর সৌভাগ্য ওর মনকে নাড়াও দিয়েছে—হিংসে হয় সৌভাগ্যের ওই বরপুত্রীর ওপর—মনকে টানেও ওই ভরা ঐশ্বর্য। (এতো হবেই, লাভ না হলেও হিংসে এক আধটু হবেই)। বিশেষ ক'রে জীবনের খর মধ্যাহ্নে, ছোট বড় কামনা, স্বপ্নের আলো ছায়া দুলছে ওই মধ্যাহ্নের বুকে। মন ঘোড়া ছুটিয়ে দিগ্বিদিকে অভিযানে ছোটে—সে দুহাতে ঐশ্বর্য ছড়াবে আর আর ঐশ্বর্য আহরণ ক'রে আনবে। কিন্তু তুমি সর্বহারা, দীন, রিক্ত। তোমার সামনে ওই রয়েছে পরগাছার দল যারা বিনা আয়াসে পায়, অথচ আয়েস ক'রে ভোগ করতে জানে না। হয়ত ভাবছ ওই ঐশ্বর্যবতী মূঢ়ের ঐশ্বর্যের সদ্ব্যবহার হতে পারতো তোমার হাতে। কিন্তু কথাটা নিজের কাছে কবুল করতেও ওর লজ্জা করে। তবু একটু খোঁচা মনে না লাগে তা নয়। আনেৎ-এর ওপর একটু হিংসে হয়। কিন্তু আনেৎ-এর দোষ কি? যদিই বা থেকে থাকে সে-দোষ স্খালন করার চেষ্টা তো সে করছেই।

তবু যে ঐশ্বর্য থেকে ও বঞ্চিত হয়েছে তার প্রতি একটা অবজ্ঞা আর ঘৃণার ভাব ফুটিয়ে রাখতে ওর ভালো লাগে। এ ওর একটা বিলাস, এবং এই পরম

বিলাসকে ও উপভোগ করতে চায়। কিন্তু এ বিলাসে জলুসও নাই, নিজের স্বার্থেরও বিরোধী। এ কথাটা অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠল সিল্‌ভীর কাছে। তা ছাড়া একটা আপাতঃ জয় হয়েছে বটে। কিন্তু তাতে কি! লাভই বা এমন কি হলো! জয় যদি হ'য়েই থাকে তার দামও ওকে দিতে হ'য়েছে। ওর নিজের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা ওর আরো বেশী মনে হয় এবং আরো বেশী পীড়া দেয়। এ সংকট থেকে উদ্ধার পাবার পথ কোথায়? প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, তবু কিছু জোগাড় হ'ল না। অসংখ্য মেয়ে বেকার হ'য়ে আছে, আর মালিকেরা এ সুযোগ নেবেই, নিচ্ছেও। স্বাস্থ্যও ওর তেমন নয়। আর জুলাইএর এই দুধর্ষ গরম! তার ওপর হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি রাত পর্যন্ত। পুষ্টিকর খাবার অভাব, ভালো পানীয়ের অভাব—সবে মিলে ওর পেটের যন্ত্রগুলোকে একেবারে বিকল ক'রে দিয়েছে। ঐ ধাক্কায়ই এন্‌টারাইটিস্‌-এ ভুগে উঠল। এখনও তার ধাক্কা সামলাতে পারেনি ও। শরীরটা ভারী দুর্বল হ'য়ে গেছে। চালের লোহার কাঠামো গরম উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে—তাপ বেরুচ্ছে তা থেকে··· জানালা দরজা বন্ধ···সিল্‌ভীর মাংস যেন জলছে। জামা খুলে চারধারে হাতড়াচ্ছে—একটা ঠাণ্ডা জিনিসও যদি হাতে ঠেকে যাতে হাতটা অন্ততঃ রাখা যায় একবার। আর ভাবছে আনেৎ-এর বুর্জঁ প্রাসাদের কথা,—আঃ, কি ঠাণ্ডা সেখানে এখন! আর নিজের বোকামীর জন্য নিজকে কঠিন অভিশাপ দেয়। আর কিছু পারুক আর না পারুক মুখ ভ্যাংচাতে জানে সিল্‌ভী। চমৎকার সিল্‌ভী, বেশ করেছ, ভালো করেছ···। আনেৎ-এর সঙ্গে মুখ দেখা অবধি বন্ধ হ'লো। কিন্তু কই এমন তো ছিল না, দু'জনের প্রাণে মনে বিরোধ তো কোথাও ছিল না। কি মূর্খ, মূর্খ—দু'জনেই নিরেট মূর্খ। কেউ এতটুকু মাথা নীচু করবে না···

না, না, না—সিল্‌ভীও নোয়াবে না মাথা, নোয়াতে পারে না, এ ও ঠিক জানে। বোকামী? হ্যাঁ তাই করবে ও শেষ পর্যন্ত। ওর বর্ণহীন শুক্‌ন ঠোঁটের কোনে বাঁকা হাসি ফোটে—। ঠিক এমনি সময় এল অতি পরিচিত পায়ের শব্দ। আনেৎ নইলে কার পা অমন ক'রে পড়বে মাটিতে একেবারে জানান দিয়ে। লাফিয়ে ওঠে সিল্‌ভী···আনেৎ আসছে···ফিরে এসেছে সে···।

ততক্ষণে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে আনেৎ। রাস্তার গরম হাঁটার ক্লান্তি আর মনের উত্তেজনায় এত ব্যতিব্যস্ত আনেৎ যে এতক্ষণ ভাবেইনি কেনই বা ও আসছে, আর এসে কি করবে। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই ওর সব সংশয় কেটে গেল। ঠিক হ'য়ে গেল পথ। আধা অন্ধকার ঘর, ভেতরটা যেন অগ্নিকুণ্ড—ওর দম বন্ধ হ'য়ে আসতে চায়। রাগে সর্বাঙ্গ কাঁপে। সিল্‌ভী চিত হ'যে শুয়ে ছিল। ছুটে গিয়ে ওর ঘামে ভেজা কাঁধ ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে উত্তেজিত স্বরে চিৎকার ক'রে উঠল :

'শিগ্‌গির ওঠ ? ওঠ বলছি ? কাপড় প'রে নে এক্ষুনি। আমি তোকে নিয়ে তবে যাব। না, কোন কথা শুনব না, একটিও না।'

অভ্যাস মত প্রতিবাদ করে সিল্‌ভী। একটু জেদেরও ভান করে। শেষটায় হাল ছেড়ে দিলে। আনেৎ জোর ক'রে ওকে কাপড় পরিয়ে দিলে। জামার বোতাম লাগিয়ে দিলে। টুপীটাও মাথায় তুলে দিলে—এক কথায় বলতে গেলে পার্শেলের মত প্যাক ক'রে নিয়ে চলল।

সিল্‌ভী নেহাৎ মান রক্ষার জন্য কেবলি না না করে। রাগও দেখায় খানিকটা ; দুর্বল ভাবে চিৎকার ও খানিকটা ক্ষীণ প্রতিবাদও করে। কিন্তু আজ ওর উপরে এই জুলুমে ও খুশি হয। আনেৎ-এর হ'য়ে গেলে ওকে দু'হাতে জড়িয়ে সিল্‌ভী চুমো খেল আনন্দের আতিশয্যে। তারপর ভরা হাসির ঢেউ তুলে বলল :

'হয়েছে বাবা হয়েছে! এই নিন্, চরণে হাজির দাসী তব, নিয়ে চলো মোরে যথা ইচ্ছা তব হে দেবী!'

আনেৎ একরকম ওকে তুলেই নিয়ে গেল। কুমতি যেমন মানুষকে কঠিন পাকে জড়িয়ে ধরে, ঠিক তেমনি শক্ত ক'রে দুইহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এল টানতে টানতে রাস্তায়। তারপর একটা ট্যাক্সী ক'রে বাড়ী এল।

বাড়ী পৌছে সিল্‌ভী বলল : 'বাপ্‌স্ বাঁচালে, এখন বলছি, দিদি ভাই, আসার জন্য আমি মরে যাচ্ছিলাম।'

'তবে এমন জেদ করছিলি, কেন দুষ্টু মেয়ে ?' প্রসন্ন মনে আনেৎ বলে।

সিল্‌ভী আনেৎ-এর হাতটা টেনে নিয়ে তার মধ্যমা দিয়ে নিজের কপালে আস্তে আস্তে ঠুকে ঠুকে দেখাল…

'হ্যাঁ ঠিক ওখানে পোকার বাসা আছে !'

আয়নায় দু'ইজনেরই ছায়া পড়েছে। সেখানে দু'জনের কপালের দিকে দেখিয়ে সিল্‌ভী বলে : 'ঠিক তোমার মত, না ভাই !' দু'জনের চোখেই কোমল হাসির দ্যুতি। পোকাগুলো কোথেকে এসেছে জানোতো ! সিল্‌ভী আবার বলে হাসতে হাসতে।

[নয়]

ঘরখানা যেন সিল্‌ভীর প্রতীক্ষায় বসে ছিল এতদিন। সিল্‌ভীর কথা জানার আগে থেকেই তার জন্য আসন ছিল পাতা কিন্তু আসেনি সেই মানুষ… হাত বারে বারে তার ছাযা খানি কেবল ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে। আনেৎ-এর ব্যক্তিত্ব, বিশেষ ক'রে ওর স্ব-প্রধান বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, কখনও ঔদাস্যে কঠিন, কখনও ব্যগ্রতায় উদ্বেগ। নিগড়-বাঁধা আত্ম-সংস্থিত চিত্তের এই খামখেয়ালি চেহারাকে ভয় পায় ওর সঙ্গিনীরা ; ভয় পায় তারা কেমন। ভয় পায় ওর অদ্ভুত প্রকৃতিকে, তার প্রভুত্বের প্রবল ব্যঞ্জনাকে—কড়া মনিব যেন আনেৎ—ওর হিসাব না চুকিয়ে উপায় নেই তোমার। অদ্ভুত ওর স্বভাবের এদিকটা। চেনেনা নিজের এ-রূপকে, জানেনা ক্ষণে ক্ষণে মুখোস খুলে বেরিয়ে পড়ে ওর ভেতরের এই অদ্ভুত মানুষটা—এমন কি আপনাকে একেবারে নিঃশেষে দিয়ে দেবার উন্মুখ মুহূর্তেও। ভয় পায় ওর সহপাঠিনীরা। তবু তারা কাছে আসে। ওকে তারা ভক্তি করে, সম্ভ্রম করে। ওর ভেতরে চুম্বক আছে। তার টান এড়াতে পারে না ওরা। তবু দূরের মানুষ আনেৎ, ভক্তের পূজা পায় দূর থেকে। ভালো বেসে কাছে এসে বসবে যে সে-মানুষের পায়ের চিহ্ন এখনও ওর ঘাটে পড়েনি। সিল্‌ভী প্রথম এল সেইখানে। অবশ্যি সিল্‌ভীর মনে বিশেষ কোন চিহ্ন পড়লো না। ও জানে যেদিন খুশি হবে আবার খেয়ালের হাওয়ায় ভর

ক'রে এ নীড় ফেলে উড়ে যাবে ও ; ব্যথা বাজবে না এতটুকুও। আনেৎকে ওর তাই ভয় নেই। এই বিশেষ ঘরখানা—যেখানে পরম আদরে আনেৎ ওকে প্রতিষ্ঠা করেছে, তা দেখে ও অবাক হয়নি। কারণ, যেদিন প্রথম ও এ-বাড়ীতে এসেছিল, সেইদিনই ওর মন বলেছিল, এ ঘর ওর। আনেৎ-এর হাবে ভাবে, ও বুঝতে পেরেছিল। বিশেষ ক'রে এ ঘরটা দেখাবার সময় আনেৎ কেমন যেন বিব্রত হ'য়ে পড়ছিল। সেদিনই ও জেনেছে এই কক্ষ একদিন ওরই হবে।

সিল্‌ভী হার যখন মেনেছেই তখন আর বিদ্রোহ করল না। সেই অসুখের পর শরীরটা ওর ভারী দুর্বল। সারেনি এখনও। সুতরাং ও ছেড়ে দেয় আপনাকে দিদির হাতে। আনেৎ ওকে আদরে, আপ্যায়নে, প্রশ্রয়ে ঘিরে রাখে। ডাক্তার বলে গেছে, শরীরে রক্ত নেই ; হাওয়া পরিবর্তন প্রয়োজন কোনও পাহাড়ী জায়গায়। তেমন ব্যগ্রতা দেখা গেল না দু'জনের কারো—দু'জনের যুক্ত জীবন-ধারার এ সংগম-তীর্থ ছেড়ে যেতে ওদের মন সরে না। দু'জনেই আব্দার ক'রে মিষ্টি কথা ব'লে কাজ হাসিল করতে ওস্তাদ—সুতরাং ডাক্তারকে একদিন বলতেই হবে যে বুর্লঁর হাওয়াও বেশ ভালো, এমন কি সিল্‌ভীর পক্ষেও তা বিশেষ ভাবে উপযোগী। আর পাহাড়ে যাবার আগে বিশ্রাম ক'রে একটু শক্তি সঞ্চয় ক'রে নেয়া ভারী দরকার। ডাক্তার বলবে মানে ডাক্তারকে বলিয়ে ছাড়বে ওরা—সে-কৌশল ওদের জানা আছে বেশ।

সুতরাং এখন নিশ্চিন্ত মনে শয্যা-বিলাসী হ'তে পারে সিল্‌ভী। ওঃ, কত দিন হলো ও প্রাণ ভ'রে শুতে পায়নি, দুপুরে ঘুমোয়নি কত কাল ! এখন প্রাণ মন ভরে ঘুমোনোর সময় এসেছে ওর। এতদিনকার ঘুমের ঘাট্‌তি বাজেট ও পুরন ক'রে ছাড়বে। না ঘুমিয়ে বিছানায় এলিয়ে প'ড়ে থাকাও ভারী চমৎকার ! ধব্‌ধবে সাদা নরম চাদর—হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে ও প'ড়ে থাকে—আর পা দিয়ে বিছানার ঠাণ্ডা জায়গা খোঁজে—তন্দ্রার আবেশের মত একটা সুখ, খালি আরাম নয়—সুখ, ছেয়ে থাকে ওর সর্বাঙ্গে, ভেসে যায় ও স্বপ্নের তরঙ্গে—মন পবনের নায়ে পাল তুলে···কিন্তু বেশী দূর যায় না তো ওর নাও ! ছাদে বসেছে ওই যে মাছিটা—ওরই মত কেবল একই জায়গায় ঘোরে আর ঘোরে। সে-ঘোরার আর যেন শেষ নাই···ওই দোকান···টুপী···ওর প্রেমিক

বন্ধু…তারই মধ্যে এক একবার লাফিয়ে উঠে ওর মন ঝাঁপ দেয় সুপ্তির পারাবারে…

'শুনছ সিল্‌ভী…শোন…' [ঘুমের ঘোরেই প্রতিবাদ জানায় ও]… 'শোন…এই কি জীবন ?…বেরিয়ে এস তোমার ওই খাঁচা ভেঙ্গে…' আধখানা চোখ খুলে দেখে—আনেৎ ঝুঁকে আছে ওর ওপর। বলতে চেষ্টা করে [মুখ দিয়ে কথা বেরুতে চায় না]: 'দিদি জাগিয়ে দাও আমায়, ভাঙ্গিয়ে দাও আমার ঘুম—' আস্তে আস্তে নাড়া দিয়ে আনেৎ বলে: 'ওঠ খুকু মুখ ধোও…' সিল্‌ভীও যেন খুকুই হ'য়ে পড়ে।

'ও: মা এত ঘুম পায় কেন কেবলি !'

আনেৎ-এর স্নেহের পারাবারে বাৎসল্যের তরঙ্গ খেলে। বিছানায় উঠে ব'সে সিল্‌ভীর তন্দ্রাচ্ছন্ন মাথাটা বুকে চেপে ধরে। ওর মনে হয় সিল্‌ভী যেন ওর মেয়ে…ছোট্ট এতটুকু মেয়ে। সিল্‌ভী অমনি ক'রে সর্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে মাঝে মাঝে ক্ষীণ প্রতিবাদ করে…

'এমনি করলে আমি গিয়ে কাজ কর্ম করব কি ক'রে আবার ?'

'কাজ আর করতে হবে না, সে আমি দেব না।'

'হুঁ, তাই বৈ কি ! মাথা খারাপ তোমার।' সিল্‌ভী বিদ্রোহ ক'রে ওঠে। চোখ খুলে যায়। ওর ঘুম টুটে গেছে। আনেৎ-এর কাছ থেকে নিজকে ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা হ'য়ে উঠে বসে এবং জলন্ত বিদ্রোহী চোখে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।

'কি জ্বালা, সবাই কেবল জুলুমই করে। তোকে এখানে বেঁধে রাখা হচ্ছে, নারে সিল্‌ভী ? তাই ভাবছিস্, না ? দুষ্টু কোথাকার !' আনেৎ হাসতে হাসতে বলে: 'যা না চ'লে তোর খুশি হয় তো—কার দায় পড়েছে তোকে বেঁধে রাখতে ?'

'তাহ'লে আমায় এখান থেকে নড়ায় হেন সাধ্য কার ?' সিল্‌ভী আবার ফোঁস ক'রে ওঠে। প্রতিবাদ তো ওকে করতেই হবে। সামান্য একটুকু শ্রমেই ও অবসন্ন হ'য়ে এলিয়ে পড়ে আবার বিছানায়।

ওর এই অবসন্ন ভাবটা কেটে গেল ক'দিনের মধ্যেই। প্রাণ ভরে, দেহ

জরে ও ঘুমিয়ে নিয়েছে। এখন ওকে রোখে কার সাধ্য। এক মুহূর্ত স্থির হ'য়ে ওকে বসানো যায় না। সারাদিন ও লাফাঝাঁপি ক'রে বেড়ায় অর্ধাবৃত দেহে, ঠিক ক'রে জামা কাপড় পরার কথাও ওর মনে থাকে না ; খালি পায়ে দিদির মস্ত বড় চটিটা প'রে দিদির গায়ের চাদরটাকে আলখাল্লার মত ক'রে গায়ে ঝুলিয়ে খোলা হাত আর খোলা পায়ে তিনি ঘুর ঘুর করেন এ-ঘর আর ও-ঘর। আর ঘরের জিনিসপত্র নেড়ে বেড়ায়, যেন কিছু আবিষ্কারের আশায়। আত্ম-পরের বিশেষ বিভেদ নেই ওর কাছে। বিশেষ ক'রে আনেৎ যখন ব'লেই দিয়েছে: 'তোর নিজেরই বাড়ী, সিল্‌ভী—' তখন তো আর কথা নেই। দিদির কথা ও গুরু-বাক্য ব'লে শিরোধার্য করেছে! অতএব সর্বত্র ওর অভিযান, সর্বত্র ওর আনাগোনা, জলের টবে জল নিয়ে খেলা ঘন্টার পর ঘন্টা। এমন একটা কোন্ বাদ রইল না যেখানে সিল্‌ভীর হাত না পড়েছে। আনেৎ-এর বই কাগজ পত্রও বাদ গেল না, তবে ভাগ্যি ভালো বেশীক্ষণ ওর মন টিকল না। অবাক হয় বুড়ী পিসী—ধারী মেয়েটা আধখোলা গায়ে ঘরের মধ্যে ছুটোপাটি ক'রে বেড়াচ্ছে সারা দিন, আস্‌বাব গুলোকে নাড়ছে, ওল্টাচ্ছে, সরাচ্ছে [টিক্‌টিক্ করছে সারাদিন বুড়ী ওর পেছনে]···ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকে ওর তাণ্ডবের দিকে সে। কখনও বা সিল্‌ভী খানিকটা মিঠে কথা, খানিকটা হাসি ছুঁড়ে দেয় বুড়ীর দিকে···পরক্ষণেই মুহূর্তে প্রলয় জাগিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বুড়ীর রাগও হয়, আবার ভালোও লাগে।

সারাদিন কেবলি বকে চলে দু'জনে···মাথা নাই মুণ্ড নাই, আদি নাই অন্ত নাই···কেবল কথা—কথা—কথা···স্থান কাল পাত্রের ভ্রূক্ষেপ নাই, চেয়ারের হাতলে ব'সে কথা, চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে, আসতে আসতে হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে কথা, নেয়ে ভিজে-কাপড়েই কথা···কেবলি কথা। একবার আরম্ভ হ'লে আর শেষ নেই···চলে ঘন্টার পর ঘন্টা···দিনের পর দিনও বা। শুতে যেতে ভুল হয়—ওপর থেকে পিসী মেঝের ওপর লাঠি ঠক্ ঠক্ ক'রে, কেশে নোটিশ দেন ওদের। চোখ কুঁচ্‌কে একবার মাত্র স্বরটা একটু নামিয়ে নেয় দু'জনে। ছাদের ওপর আরো জোরে শব্দ হয়···না এবার বাতি নেবাতেই

হচ্ছে···না, থাক আর একটু, কাপড়টা ছাড়তে হবে তো—পাশা-পাশি ঘর দু'জনের···মাঝের দরজা খোলা। অনবরত ওরা আসছে যাচ্ছে···কাপড় ছাড়তে ছাড়তে কথা চলছে, চলছে ছাড়ার পরে···বিছানায় গিয়ে হাঁকাহাঁকি ক'রে চলেছে কথা। সারা রাতই বুঝি চলবে এমনি ধারায়। কিন্তু গভীর সুপ্তি এসে জোয়ারের মুখে বাঁধ বাঁধে। তরুণ বয়সের নিদ্রা, অমনি আসে অতর্কিতে, বলিষ্ঠ ডানায় ঝাপ্টা মেরে পড়ে হুমড়ি খেয়ে ওদের ওপর। ঢলে পড়ে বালিশে; ঈষৎ ফাঁক হ'য়ে যায় ঠোঁট দু'টি···মুখের কথা মুখেই থাকে, নিঃসাড়ে ঘুমোয় আনেৎ, ওর সমস্ত দেহ পাথরের মত প'ড়ে থাকে—কি যেন স্বপ্ন দেখে চমকে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে, এ পাশ ও পাশ করে, বিছানার চাদরটা দুমড়িয়ে মুচড়ে যায় ওর ভারী দেহের নড়া চড়ায়। কথাও বলে স্বপ্নের ঘোরে, কিন্তু জাগেনা। সিল্‌ভীর হাল্কা ঘুম, সামান্য নাক ডাকে [বলো একে সে-কথা, সাপের মত ফোঁস ক'রে উঠবে]। মাঝে মাঝে জেগে উঠে পরম কৌতুকে আনেৎ-এর প্রলাপ শোনে। কখনও চ'লে যায় আনেৎ-এর বিছানায়। আনেৎ এলিয়ে প'ড়ে আছে: চাদরে ঢাকা ভাঁজ করা খাড়া হাঁটু দু'টো পাহাড় রচনা ক'রে আছে। ছোট্ট স্তিমিত রাতের বাতিটা [আনেৎ বাতি ছাড়া ঘুমোতে পারে না] তুলে তাকিয়ে থাকে ঘুমন্ত মুখ খানার দিকে···বিচিত্র মুখ আর বিচিত্র রূপ···নিষ্প্রাণ, চেতনাহীন কিন্তু অদ্ভুত আবেগ-ব্যঞ্জিত মুখ—ক্ষণে ক্ষণে কি যেন বিসাদের ছায়া ঘন হ'য়ে ওঠে, গভীর···গভীর··· গভীর স্বপ্ন-সায়রে ডুব দিয়েছে ওই ঘুমন্ত আত্মা। বিভোর হ'য়ে, আত্মহারা হ'যে দেখে সিল্‌ভী ··এ যেন প্রত্যহের সেই চেনা মানুষ নয়··· সিল্‌ভী চেনেনা ওকে···ভাবে, ওই কি আনেৎ! ওরই বোন আনেৎ!···

ইচ্ছা হয় আচমকা জেগে উঠুক আনেৎ। দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে সিল্‌ভী। চমকে ওঠে আনেৎ। 'লক্ষ্মী ছাড়ি, তুই?'

জানে আনেৎ, সিল্‌ভী কেন এসেছে। পরখ করবে। ওর ওই সাংঘাতিক দিদির মত অত শুচিবাই-গ্রস্ত নয় ও, ও স্বাভাবিক রক্ত মাংসের মানুস। সিল্‌ভী আগুন নিয়ে খেলা করে কিন্তু হাত পোড়ে না ওর।

কাপড় পরা ও ছাড়ার সময় দু'জনেরই সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরে বেড়ায় পরস্পরের নিরাবরণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। আনেৎ-এর সেকেলে লজ্জা যায়নি এখনও। মাঝে

মাঝে তা আবার সাড়ম্বরে আত্ম-প্রকাশ করে। সিল্‌ভী হেসে কুটি পাটি হয়। ওর ভারী মজা লাগে। ওর নিজের অত লজ্জার বালাই নেই। আনেৎ মাঝে মাঝে কেমন জানি হ'য়ে ওঠে, পাথরের মত হিম-শীতল, বিদ্রোহে কঠিন। কখনও মুখে চাপা মেঘের ভার, কখনও অকারণে কেঁদে ভাসায়। ওর লাযন-দেশীয় মার্জিত ভঙ্গি, এক কালে যা ওর গর্বের বস্তু ছিল, আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ-ক্ষতির জন্য আজ আর দুঃখ হয় না ওর।

ওদের সব দূরত্ব ঘুচে যায়। পূর্ণ বিশ্বাসে অন্তরের দ্বার ওরা পরস্পরের কাছে খুলে দেয়। ওদের হৃদয়-ঢালা আলাপনের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। ওদের অন্তরঙ্গ আলাপের মধ্যেই বোঝা যায় কত আলাদা ওরা মানসিক গঠনের দিক থেকে। একজন শিশুর মত সরল, হাসি-খুশি-চঞ্চল-উচ্ছল, নীতি দুর্নীতির হিসেব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত সে। আর একজন আবেগ-গভীর, গম্ভীর ; তার গাম্ভীর্য বিদ্যুত-শক্তি সম্পৃক্ত। বড় অশান্ত ওর মনের ভেতরটা। অতএব বিরোধও বাধে। প্রেম-ঘটিত বিষয় সম্বন্ধে সিল্‌ভীর হাংলাপনা, তার অসংযত উলঙ্গ ভাষা—ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে আনেৎ। আত্মার গভীরে ভয়-শূন্য ও। বাইরে সংযত-বাক্। দেখে মনে হয় ও যেন ভয়ে ভয়ে থাকে, পাছে ওর বুকের ভাষা ওর কানে পৌঁছোয়। প্রায়ই ভয়ংকর একটা দুর্ভেদ্য নীরবতায় কঠিন হ'য়ে ওঠে ও, তখন ওর ইচ্ছে হয় লোকালয় থেকে দূরে সাত-প্রস্থ পাঁচিলে ঘেরা কোন দুর্গে গিয়ে আগল্ এঁটে ব'সে থাকে। ও নিজে বোঝে না কি এ। সিল্‌ভী বোঝে।

অথচ মানসিক গঠনে প্যারীর সাধারণ খেটে-খাওয়া মেয়েদের পর্যায়েই পড়ে ও। তা ছাড়া সাধারণত ও চলে খেয়ালে। তবে ব্যাবহারিক-বুদ্ধি ওর অত্যন্ত প্রখর। এবং এই বুদ্ধির দৌলতেই ওর যা প্রতিষ্ঠা। নইলে গণ্ডী থেকে কখনও ও বাইরে আসতে পারত না। সব কিছুই ওর কাছে কৌতুকের, অথচ কৌতূহল নেই কিছুতে, এক ফ্যাশন ছাড়া। ছবি, বই, গান কিছুতেই সূক্ষ্ম বিচার ক্ষমতা নেই। কখনও কখনও নেহাৎ মামুলী দৃষ্টিটুকুরও অভাব হয়। ওর অসংস্কৃত রুচি দেখে আনেৎ ব্যথা পায়। সিল্‌ভী বোঝে, সন্ধির চেষ্টা করে।

আবার কখনও ঘাড় বাঁকিয়ে ওঠে। খবরের কাগজের পাতায় ধারাবাহিক

কোনও বাজে উপন্যাসের নায়কের পক্ষ সমর্থন ক'রে তর্ক বাঁধায়। এই সব সস্তা রোম্যান্সই সিল্‌ভীর কাছে সব চেয়ে বড় আর্টের নিদর্শন। সিনেমার নির্বিচার পূজারী ও। আনেৎ-এর কোনও অভিজ্ঞতা নেই এ বিষয়ে। না জেনেই ও সিনেমা-বিরোধী। সিল্‌ভীর জেদ আর কৌশলে বাধ্য হ'য়ে সিনেমা-শিল্পের মূল্য ও শিল্প-সম্ভাবনা আনেৎকে স্বীকার করতে হয়।

এক সাথে বই পড়তে বসে অনেক সময়। কালির আখরে রূপের নৈবেদ্য সাজান রয়েছে, স্বাদ পায়না তার ভাড়াটে ঘরের মেয়ে সিল্‌ভী; কিন্তু যে জীবন-সত্যের পরিচয় রয়েছে সেখানে তাকে চিনে নিয়েছে ওই জনতার মেয়ে। প্রাসাদের মেয়ে আনেৎ বিস্মিত অপরিচয়ের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। চেনেনা ও দেখেনি এই সত্যকে আর তার এই দৃপ্ত, বলিষ্ঠ রূপকে। চিনেছে সিল্‌ভী আপন জীবন দিয়ে, পড়েছে বাস্তবের পুঁথির পাতায়। ওই তো আসল পুঁথি, পুঁথির সেরা পুঁথি। সবাই চেনেনা ওর হরফ, বোঝেনা ওর ভাষা। অথচ ও পুঁথি রয়েছে তোমার আমার বুকের তলায়, রয়েছে দিন আর রাত। প্রথম থেকে শেষ পাতা কেবলি লেখা, ফাঁক নেই কোথাও। পড়তে পারো আর না পারো, ও পুঁথি তোমাকে ব'য়ে বেড়াতেই হবে অনন্তকাল। পাঠ নিতে হবে গুরুর কাছে। সেরা মাষ্টার 'অভিজ্ঞতা' বেত হাতে তোমায় শেখাবে, তবেই ওই পুঁথির ভাষা পড়তে পারবে তুমি। আশৈশব ওই পাঠ পেয়েছে সিল্‌ভী, তাই আজ আর ও ঠেকেনা, পড়ে যায় গড় গড় ক'রে। আনেৎ আরম্ভ করেছে দেরিতে, পাঠ শিখতে তাই সময় লাগছে। কিন্তু শেখা পাঠ একেবারে গেঁথে যাচ্ছে ওর অন্তরের গভীরতম গভীরে।

[দশ]

বড় গরম পড়ল এ বছর। অগাষ্টের মাঝামাঝিই বাগানের সুন্দর গাছগুলো ঝলসে গেল। রাত্তিরগুলো গুমট, সিল্‌ভী যেন এক ফোঁটা বাতাসের জন্য আঁকু পাঁকু করে। অনেকটা সেরে উঠেছে; কিন্তু এখনও দুর্বল। খেতে

পারে না, ক্ষিদে হয় না। এমনিতেও খাওয়া ওর কম। আর এখন তো আরো। পারলে ও ফল আর বরফ খেয়েই থাকে। কিন্তু আনেৎ সারাদিন ওর পেছনে লেগে থাকে। এখন ঐ ওর কাজ। অনেক দিন থেকেই পাহাড়ে যাবার কথা হ'য়ে আছে। কিন্তু আনেৎ চাইছিল, সারা গরমটা বোনকে একেবারে নিজের কাছে রাখতে। তাই সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাওয়ার কথাটা ও পিছিয়ে দিয়েছে; যদি শেষ পর্যন্ত না গিয়ে পারা যায়। কিন্তু এখন দেখল আর চলে না; সুতরাং যাওয়া স্থির ক'রে ফেলল।···

অনেক দিন আগে এখানে এসেছিল আনেৎ। তখন ভারী সুন্দর, ভাল অথচ আড়ম্বরহীন হোটেল ছিল একটা—পুরানো সুইজারল্যাণ্ডের শান্ত পরিবেশ সবুজ প্রকৃতির সহজ সুরটিকে বুক ভ'রে পাওয়া যেত। কিন্তু এ ক'বছরে সব বদলে গেছে। হোটেলটি গিস্‌গিস করছে মানুষে। কোথায় গেল সেই শান্ত প্রকৃতি। মস্ত শহর এখন, প্রাসাদের মত বড় বড় বাড়ীগুলি উদ্ধত ভাবে মাথা উঁচিয়ে আছে। মাঠের বুক চিরে পাকা রাস্তা চলে গেছে; বড় বড় গাছের মেলার মধ্যে দিয়ে গর্জন ক'রে ছুটছে ইলেকৃট্রিক ট্রাম। ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে আনেৎ-এর। চল্লিশ ঘণ্টার পথের ক্লান্তি—ইচ্ছে করছে একটানা বিছানায় প'ড়ে থাকতে নড়া চড়া না ক'রে। আর যাবেই বা কোথায়! সব বদলালেও আগের দিনের স্ফটিক-স্বচ্ছ হাওয়াটি আছে। সিল্‌ভী বুক ভরে নিশ্বাস নেয়, আরাম ক'রে একটু একটু ক'রে জিভ দিয়ে রসিয়ে রসিয়ে কাঁচের পাত্রে ক'রে বরফ খাওয়ার মত ক'রে। ক'দিন থেকেই তারপর না হয় যাওয়া যাবে আর একটু ঠাণ্ডা পড়লে। ধীরে ধীরে জায়গাটা খানিকটা অভ্যাসও হ'য়ে গেল এবং থাকতে থাকতে ভালও লেগে গেল।

ভারী সুন্দর সময়। টেনিসের ধুম পড়ে এই সময়। নানা দেশের নানা জাতির তরুণ তরুণীর দল এসে জোটে টেনিসের মাঠে। তা ছাড়া নাচগান, অভিনয়েরও আসর বসে। কিছুই না ক'রে ঘুরে বেড়ানোর দল, ফ্লার্ট-করা আর চাল-মারার দলেরও আসর সরগরম। এসব আড্ডা আনেৎ-এর বেশী ভালো লাগে না। সিল্‌ভীর খুব ভালো লাগে। ওর চোখ মুখ দেখে বেশ

বোঝা যায় তা। আনেৎ বোঝে। তাজা জীবন-রসে ভরপুর মন দু'জনেরই। তরুণ বয়স। তারুণ্যের ধর্মে নিজকে ছড়িয়ে দিতে আর আনন্দ লুকতে ওরাও চায়।

ওদের ঘিরে মধুচক্র গড়ে ওঠে দুদিন না যেতে। উঠ্‌বে না-ই বা কেন, উদ্দীপ্ত যৌবনে ঝলমল্‌ করছে দু'জনেই—, হাসিতে খুশিতে টগবগ করছে —চোখে লাগার মত। আনেৎ যেন বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ছে দল মেলে। খেলার মাঠে আর ঘরের বাইরে প্রকৃতির উন্মুক্ত আকাশের তলে ওর আসল পরিচয়। বলিষ্ঠ, ঋজু, সুগঠিত দেহ—ও হাঁটতে ভালোবাসে, খেলতে ভালোবাসে। চমৎকার টেনিস খেলে—স্থির অব্যর্থ দৃষ্টি, সহজ-নমনীয় হাতের কব্‌জি—হাত চলে বিদ্যুতের মত—বল মাটিতে পড়তে পায়না! স্বভাবতঃই সংযত ওর ভঙ্গি, বেগের মধ্যেও চমৎকার একটা শাসন আছে। কিন্তু প্রয়োজন হ'লে ও অসাধারণ শক্তি আর গতির পরিচয় দেয়। সিল্‌ভী অবাক হ'য়ে দেখে ওর খেলা। চমৎকার লঘু ভঙ্গিতে, স্প্রীংএর মত স্বচ্ছন্দে লাফান দেখে হাত তালি দিয়ে ওঠে; দিদির এই অসাধারণত্বে গর্বে আর গৌরবে ওর বুক ভ'রে ওঠে। ও নিজে পারে না, তাই দিদির ওপর ওর বেশী শ্রদ্ধা। খেলাধূলো ছুটোপাটি ও পারেও না আর রসও খুঁজে পায়না এর মধ্যে কোন। ওর দুর্বল শরীরে সয়ও না। দূরে বসে দেখাই ওর বরং ভালো লাগে। আর দর্শক হ'য়ে থাকাটা ওর পক্ষে সুবুদ্ধির কাজও। কিন্তু কেবল খেলার দর্শক হ'য়েই এর সময় কাটে তা নয়…।

ওর চারদিকে গড়ে উঠল মধুচক্র। ও তার মৌ-রাণী। ওকে দেখলে মনে হয় ও যেন চিরকালের মৌ-রাণী। আশ-পাশের বিলাসিনীদের দেখে ও ফ্যাসান-জগতের কলা-কৌশল নকল ক'রে ক'রে রপ্ত ক'রে নেয়। চতুর মেয়ে। অনুকরণে ওর সহজ দক্ষতা আছে।

কিন্তু দেখলে মনে হয় সাদা-সিধে আপন-ভোলা মানুস; কোন দিকে খেয়াল নেই। ওর চোখ দুটোয় যেন গেরুয়া রং লাগা। আসলে ওটা ওর বাইরের খোলস। ওর সব কটা ইন্দ্রিয় সর্বদা শুধু সজাগ থাকে না, প্রহরায় থাকে; নেবার মত বস্তু সামনে এলেই ও গ্রহণ করে। ওর বর্তমানের আদর্শ

আনেৎ। কিন্তু আনেৎকে অনুকরণ করলেও সর্বতোভাবে আনেৎ হ'য়ে ওঠে না সিল্‌ভী। সামান্য একটু যোগ, সামান্য একটু বিয়োগে নকলটাকে আপনার ক'রে নিতে জানে ও। ওর কুশল হাতের আর্টে নকল মৌলিকের মর্যাদা পায়। তার জৌলুসে সিল্‌ভী আরো ঝলমল ক'রে ওঠে; বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে তারওপরে ঔদাস্যের পালিশ লেগে।

এই ধারের মূলধনেই সিল্‌ভীর কারবার ফেঁপে ওঠে। আনেৎ-এর বেশ লাগে। ওর কাছে আগের দিনের শোনা কথা, পরের দিন পরম বিজ্ঞতা দিয়ে তোতা-পাখীর মত দরবারী আসরে আওড়ায় সিল্‌ভী। আনেৎ প্রায় হেসে লুটিয়ে পড়ে। সিল্‌ভীর চোখ মিনতি করে।

কিন্তু কথা বার্তা আর একটু এগোলেই মুস্কিল বাধে। সিল্‌ভীর বুদ্ধি খর, প্রখরা ধী হ'লেও যেখানে শুধু ফাঁকির কারবার সেখানে সামান্য হিসেবের ভুল হ'লেই বিপদ। কিন্তু অত ভুল সিল্‌ভীর হয় না। চোরা বালিতে ওর পা পড়ে না কখনও। তা ছাড়া সঙ্গী নির্বাচন ও হিসেব করেই করে। এদিকেও ওর অসীম দক্ষতা। বিদেশী তরুণ খেলোয়াড়দের দিকেই ওর টান। খেলার ভুল ত্রুটির দিকেই নজর বেশী। কথার ভুলকে এরা গ্রাহ্য করে না।

বর্তমানে এক ইতালীয় তরুণকে নিয়ে এখানকার নারী-মহল মেতে উঠেছে। নাম তুল্লীও; গাল-ভরা পদবীটা কোনও প্রাচীন লম্বার্ড পরিবারের পরিচয় বহন করে [বংশটি নেই কয়েক শতাব্দী হ'ল, নামটা অমর হ'য়ে আছে।] চেহারাটা সুদর্শন। লম্বা, ঋজু, সুগঠিত দেহ, গোল মাথা, ক্ষৌর-মসৃণ মুখ, গভীর বাদামী রং, অতি দীপ্ত চোখ, উদ্ধত নাক, আর তার ঈষন্নীল রক্ত। চোয়াল দু'খানা ভারী। নমনীয় কটির ওপর চওড়া বুকখানা উঁচিয়ে হাঁটে তুল্লীও অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে। ঔদ্ধত্য, হিংস্রতা আর মাথা-লোটান বিনয় মিশিয়ে ওর ব্যবহার। দুর্বার ওর আকর্ষণ। আপনাকে ডালি দেবার জন্য উন্মুখী হৃদয় ওর চারপাশে ভিড় ক'রে থাকে। ওর শুধু একটু হাত বাড়ানোর অপেক্ষা। কিন্তু হাত বাড়ায় না তুল্লীও। জানে, তারা আপনি এসে ধরা দেবে।

নিজে এসে ধরা দেয়নি আনেৎ। বোধহয় এই কারণেই তাকে ভালো লাগল ওর। ভালো টেনিস খেলোয়াড় তুল্লীও। আনেৎ এর বলিষ্ঠ দেহের বলিষ্ঠ ভঙ্গিমা ওর মনকে ছোঁয়। নানা খেলার বিষয় আলোচনা করে ও আনেৎ-এর সঙ্গে। দু'জনেরই ভালো লাগে এমনি খেলার আয়োজন করে। বিশেষ ক'রে ঘোড়ায় চড়া আর নৌকো-বাওয়া পেলে আনেৎ চায়ও না আর কিছু। ও মেয়ের কুমারী দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শিরায় উপশিরায় প্রাণ-প্রবাহ উপচে পড়ে—প্রখর ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে তা তুল্লীও, কামনাও করে ওই দেহকে। আনেৎ বোঝে, অপমানে বিক্ষুব্ধ হয় কিন্তু প্রতিপক্ষের ওই দুর্বার সম্মোহনী শক্তিকে ঠেকাতে পারে না। আনেৎ-এর প্রখর জৈবিক-জীবন সুদীর্ঘ বছর শুচিতার নিগড়-বাঁধা হ'য়ে প'ড়ে ছিল; আজ এতকালের সেই ঘুমন্ত প্রাণের যেন ঘুম ভাঙছে মদির বসন্তের ছোঁওয়ায়, স্ফূর্তি-পাগল, প্রাণোচ্ছল এই তরুণদলের মধ্যে, আর শ্রম-সাধ্য খেলার উন্মাদনায় ওর ঘুম টুটে যায়। ক' সপ্তাহ ধ'রে সিল্‌ভীর সাহচর্য, তার সাথে ওর অবারিত আলাপ, এবং তা ছাড়া সিল্‌ভীর ওপর ওর গভীর ভালোবাসায় ও যেন ডুবে আছে। এইসব মিলে একেবারে তচনচ্ ক'রে দিয়ে গেল ওর প্রকৃতিকে। অবিশ্যি নিজের প্রকৃতিকে চেনেনি ও, বোঝে নি তার গভীরতা কতখানি। ইন্দ্রিয়ের এই অতর্কিত অভিযানের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত ছিল না ওর দুর্গ। আজ প্রথম আনেৎ-এর যৌনসত্তা আপন পরিচয় জানিয়ে দিয়ে গেল। আনেৎ-এর মনে হ'ল যেন চড় খেল ও মুখের ওপর। রাগে দুঃখে লজ্জায় ও মরে গেল, কিন্তু মরল না ওর নব-জাগ্রত পিপাসা। পালাল না ও, পৃষ্ঠভঙ্গ দিল না। উদ্ধত গর্বে, কঠিন ঔদাস্যে ও শত্রুর সম্মুখীন হ'লো কম্পিত বক্ষে। অসংযত কামনার মুখে শ্রদ্ধার মুখোস পড়িয়ে রাখে তুল্লীও। ও বুঝল আনেৎ বুঝেছে এবং রুখে দাঁড়িয়েছে। আরও মুগ্ধ হ'ল ও। বাইরে দেখা বা বোঝা গেল না কিছু, নিঃশব্দ লড়াই চ'লল। পুরুষের সুমার্জিত সৌজন্যে নত হ'য়ে তুল্লীও ওর হাতে চুম্বন করে, আনেৎ স্মিত হাসে, বিচিত্র উদ্ধত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে ওর হাসিতে। পড়ে নেয় তুল্লিওর চোখের ভাষায়:

'তোমায় জয় করব আমি, আনেৎ।'

আনেৎ-এর দৃঢ় ওষ্ঠে নীরবে গর্জিত হয় : 'অসম্ভব !'

সিল্‌ভীর তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি ওদের পেছনে ফেরে। ও ভাবে, কেবল দর্শক হয়েই থাকবে কি এই রণ-লীলায় ? আসরে নামলে মন্দ হয় না। কিন্তু কি ভূমিকা নেবে তুমি সিল্‌ভী ! তাই তো…সে-কথা তো ভাবিনি। এই একটা কিছু…যাতে বেশ হেসে নেয়া যায়…অবশ্য আনেৎ-এর পক্ষেই ও থাকবে—তা বলাই বাহুল্য ! ছেলেটি বেশ ভালোই দেখতে। আনেৎও তো মন্দ নয়…ওর ভেতরকার আবেগ ওর সৌন্দর্যে আরো মাধুরী ঢেলে দিয়েছে…তাই দেয়। একখানি গৌরবোন্নত মহিমা, রণোন্মত্ত ঋষভের ললাটের মত উদ্ধত স্পর্ধিত ললাট, সাদায় লালে ঢেউ খেলে যাচ্ছে একখানি শুভ্র দেহ…সিল্‌ভী যেন দেখতে পায়…স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পায়…

বর্ম পরে দাঁড়িয়েছে ঐ লোকটাও…

আশা নাই, কোনও আশা নাই, শুনছ ! আনেৎকে পারবেনা তুমি আয়ত্ব করতে, স্বেচ্ছায় যদি না সে হার মানে। আচ্ছা, সে চায় কি ? চায় না ? আনেৎ মন ঠিক ক'রে নাও, দেখছ জালে পড়েছে লোকটা—বাস্ শেষ করে দাও, ফাঁস দাও কষে…আচ্ছা বোকা মেয়েতো !…কিচ্ছু জানেনা…আচ্ছা দাঁড়াও আনেৎ, আমি আসছি…

আনেৎকে অবলম্বন ক'রেই ওদের পরিচয়ের শুরু। দু'জনের আলোচনার বিষয় আনেৎ। দু'জনেই ভালোবাসে, দু'জনেই প্রশংসায় মুখর হয়। লোকটা একেবারে ডুবেছে আনেৎ-এর প্রেমে। চোখে আলো দুলিয়ে তুলীওর সুরে সুরে মেলায় ; উচ্ছ্বসিত হ'য়ে আনেৎ-এর কথা বলে ও, আর একদিকে ছলা, কলা, লীলা দিয়ে সুসজ্জিত হ'য়ে দাঁড়ায়। কোষ হ'তে এসব অস্ত্র বেরুলে আর রক্ষা নাই আর ফেরান চলবে না—চলবে না। বল : 'হুসিয়ার—আর না, অনেক দূর গেছ…'

কিন্তু বাঁধন-হারা রিপুর দল অস্বীকার করে ওর শাসন। এখন আর উপায় নাই—। কিন্তু মজাই বা মন্দ কি ! নির্বোধ লোকটা বাস্ অমনি জালে ফাঁসল ! পুরুষ গুলো কি বোকা ! ও ভেবেছে কিনা, ওরই জন্য যত মেয়ে রূপের ঝাঁপি সাজায়…রূপ ওর আছে তা বলতেই হবে…। তাতো হলো—

দুটো বঁড়শী, মাছ বাছাধন কোন্ টোপ গিলবেন। দুটোই একসঙ্গে? ...না ...আচ্ছা, কোনটা তা'হলে।...বেছে নাও বন্ধু বেছে নাও...

সিল্‌ভী পথ ছেড়ে দাঁড়ালে তুল্লীওরও সুবিধা হ'ত। কিন্তু সে গেল না। আনেৎও গেল না। বরঞ্চ নিজের অজ্ঞাতসারেই আরো উঠে পড়ে লাগল সিল্‌ভীকে প্রতিযোগিতায় হারাবার জন্য।

অথচ দু'বোনের ভালোবাসায় কোন খাদ নেই। অত্যন্ত গভীর অন্তরঙ্গ খাঁটি ভালোবাসা। পরস্পরের প্রশংসা পরস্পরকে আনন্দ দেয়। একসঙ্গে পরামর্শ ক'রে ছাড়া ওরা কোন কাজ করে না। পরস্পরের সাজ সজ্জা প্রসাধনে পরস্পরকে সাহায্য করে। অথচ পরস্পরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবার আকাঙ্খা লুকিয়ে থাকে মনের গোপনে। সন্ধ্যার আসরে সকলের দৃষ্টি ওদের দুজনের ওপরে, যদিও প্রতিযোগিতার কোন প্রয়াস, কোন আভাস ওদের বাইরের ব্যবহারে নেই। তবু সকলে জানে ওরা প্রতিদ্বন্দ্বী। নাচের সময় পরস্পরের নৃত্য-কুশলতায় ওদের চোখে মুখে অভিনন্দন ফুটে ওঠে তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও। তুল্লীওর সাথে নাচার বেলাও ব্যতিক্রম হয় না। অথচ ও লোকটাকেই নিয়ে কাড়াকাড়ি চলেছে দু'বোনের মনে। বড্ড বেশী জুড়ে আছে সে ওদের মন। এতটা হবে ভাবেনি ওরা। আরো বেশী হচ্ছে যখন নির্বাচনের প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে এবং তুল্লীওর মন এখনও রায় দেয়নি। নাচের সময় সিল্‌ভীর প্রতি তুল্লীওর ব্যগ্রতা দেখে নিজের অজ্ঞাতসারেই আনেৎ-এর মন ভারী হ'য়ে ওঠে। নাচে দু'জনেই ভাল আপন আপন ধারায়। তবু আনেৎ যে সিল্‌ভীর চেয়ে ভাল নাচে তা প্রতিপন্ন করতে প্রাণপনে চেষ্টা করে ও। নৃত্যবিদের চোখে আনেৎই বেশী নম্বর পায়। সিল্‌ভীর নাচে তাল ভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু অত্যন্ত সহজ সাবলীল তার ভঙ্গি। যে মুহূর্তে ও টের পায় আনেৎ এগিয়ে যেতে চাইছে, সিল্‌ভী দুর্বার হ'য়ে ওঠে। তুল্লীও বাধা দেয় না। সিল্‌ভীর সঙ্গে খানিকক্ষণ নেচে হাসতে হাসতে ওকে সঙ্গে নিয়ে তুল্লীও বেরিয়ে পড়ে বসন্ত-রাত্রির জোয়ার-জাগা বাইরে। আনেৎ তাকিয়ে দেখে— সে একা একা। সইতে পারবেনা ও—পারবেনা আপনাকে সংযত করতে। ঘর ছেড়ে চ'লে যেতে হয় ওকেও। ওদের অনুসরণ করতে

সাহস হয় না। বাগানে যাবার কাঁচে-ঘেরা রাস্তাটায় গিয়ে দাঁড়ায়…সেখান থেকে দেখা যায় ওদের…ওই তো ওরা বেড়াচ্ছে হাঁটতে হাঁটতে…ওইতো তুল্লীওর মাথা নত হ'য়ে এল সিল্‌ভীর মুখের ওপর…মিলে গেল দুই জোড়া অধর।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়? আরো আঘাত বাকী ছিল আনেৎ-এর জন্যে। ওপরে নিজের ঘরে গিযে অন্ধকারে ব'সে থাকে আনেৎ। সিল্‌ভী ফিরে আসে আনন্দে টগবগ করতে করতে। আনেৎকে অমনভাবে বসে থাকতে দেখে ওর স্বভাব মত ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধ'রে চুমো খায়, আদর ক'রে ওকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে সহজ ভাবে। আনেৎ ওজর দেয, মাথা ধরেছে হঠাৎ—তাই যায়নি। 'কি কর'লিরে সারা সন্ধ্যেটা? বেড়াতে গিযেছি'লি? কার সঙ্গে গেলি? তুল্লীওর সঙ্গে?' জিজ্ঞাসা করে ও সিল্‌ভীকে। দূর, বেড়াতেই যাযনি সিল্‌ভী। কে জানে তুল্লীও কোথায়! বিশ্রী লোকটা, মোটেই ভালো লাগে না এখন। আর পুরুষ মানুষের অত চোখ-ধাঁধান রূপ তো ওর আরোই ভালো লাগে না। তা ছাড়া বেজায় গুমর লোকটার, রংটাও কালো…

একটা ওয়াল্‌ট্‌স্‌ নাচের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সিল্‌ভী শুতে যায়।

আনেৎ-এর ঘুম আসে না। সিল্‌ভীর চেতনা নাই, অঘোরে ঘুমায়। জানে না ও, ভাবেনি ও স্বপ্নেও—কি এক সর্বনেশে ঝড়ের তাণ্ডব এনে ছেড়ে দিয়েছে ও এই ঘরের মধ্যে। সেই তাণ্ডবের দাপটে ওলট্‌ পালট্‌ হচ্ছে আনেৎ… ভাঙ্গছে, গুড়োচ্ছে। সর্বনেশে অঘটন ঘটে গেল—একেবারে সর্বনেশে, দ্বিগুণ সর্বনেশে। সিল্‌ভী আজ ওর প্রতিদ্বন্দ্বী। মিথ্যে বলে গেল সিল্‌ভী। সিল্‌ভী! যে সিল্‌ভীকে ও ভালোবাসে। যে সিল্‌ভী ওর আনন্দ, সুখ বিশ্বাস…গেল, গেল, ভেঙ্গে গেল সব, ধ্ব'সে পড়ল…না, না আর নয়…হাওয়ার মত, বাষ্পের মত উবে যায় প্রেম…। না…সিল্‌ভীর প্রতি ভালোবাসা ওর শুকিয়ে গেছে। কিন্তু কি ক'রে থাকবে তাকে না ভালোবেসে ও? মর্মের গভীরতম গভীরে চ'লে গেছে এ স্নেহের শিকড়—এত গভীরে তা কি জানা ছিল? কিন্তু ঘৃণা যাকে করা যায় ভালো কি বাসা যায় তাকে? সিল্‌ভীর প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা এমন কিছু নয়।…তা নয়…তা নয়…অন্ত

কিছু…। বলো, বলো, থেমোনা, বলে যাও…থামলে কেন…বলে যাও… হ্যাঁ…তা নয়…ওই লোকটা…না? ওই লোকটা যাকে আগে আনেৎ শ্রদ্ধা করতে পারে নি আর এখন যাকে ভালোবাসে, না!…ভালোবাসা?…না। ভালোবাসা নয়। আনেৎ ওকে চায়, শুধু চায়।

উদ্ধত, গর্বিত, ঈর্ষায় উত্তপ্ত বাষ্প আনেৎকে ঠেলে দেয় সামনে…চাই ও-লোকটাকে ওর…তাকে পেতেই হবে, কেড়ে আনবে ছিনিয়ে আনবে তাকে… আনতেই হবে ঐ ওর হাত থেকে…কখনই দেবে না তাকে ওর মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে…। [সিল্‌ভীর নামও আর উচ্চারণ করতে পারে না আনেৎ, অনামা সর্বনাম স্থান নেয় নামের]।

সারা রাত এক ফোঁটা ঘুম এলো না আনেৎ-এর চোখের পাতায়। জ্বলছে দেহ, জ্বলছে মন। বিছানার চাদরটা অবধি যেন তেঁতে উঠেছে। পাশের বিছানা থেকে অনাবিল শান্ত গভীর সুসুপ্তির লঘু কোমল শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে।

ভোর বেলা ছ'জনের চোখাচোখি হ'তেই সিল্‌ভী বুঝে নেয়—পুরানো পৃথিবী ওলট্ পালট্ হ'যে গেছে, কিন্তু বোঝেনা, কেন—বোঝেনা এই এতটুকু একটা রাতের মধ্যে এমন কি প্রলয় ঘ'টে গেল। আনেৎ-এর চোখের চার ধারে কালি, বর্ণে পাণ্ডুরতা…আর মুখে এক বিচিত্র কাঠিন্য, চোখে বিদ্রোহ…আরো সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে—অদ্ভুত সুন্দর…[একই সঙ্গে বেশী সুন্দর আর বেশী সাধারণ। যেন ওর আহ্বানে আজ ওর সমস্ত গোপন শক্তির সমাবেশ হয়েছে]।

…সিল্‌ভী অন্যদিনের মত কথা বলে চলেছে। অনর্গল রোজকার মত… আনেৎ শুনছে…দেখছে সিল্‌ভীকে…দৃষ্টি হিম-কঠিন…উদ্ধত গর্বে মাথা উন্নত, স্থির, সর্বাঙ্গে বিদ্বেষ আর বিদ্রোহ…চারদিকে ওর ছুর্ভেদ্য প্রাচীর ঘেরা… তারপর হঠাৎ খাপ্ছাড়া ভাবে সুপ্রভাত জানিয়ে বেরিয়ে যায়। সিল্‌ভী থমকে গেল…মুখের কথা ওর মুখেই থেকে গেল। ও-ও আনেৎ-এর পেছন পেছন বেরিয়ে এল—অবাক হ'য়ে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আনেৎ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল…।

বুঝতে বাকী রইল না আর। তুল্লীও এসে হলে বসেছে, আনেৎ দেখতে পেয়েছে। ও সোজা দরজা পেরিয়ে চলে গেল ওর কাছে। তুল্লীওর চোখ এড়াল না, হাওয়া অন্য দিকে বইছে। আনেৎ গিয়ে ওর পাশে বসে। নিতান্ত সাধারণ একথা সেকথা হয়। আনেৎ-এর মাথা সোজা, চোখে ঘৃণা-মেশান বিদ্রোহ। ও সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, তুল্লীওর দিকে ওর চোখ নেই। কিন্তু তুল্লীও বোঝে যে ওকেই আনেৎ লক্ষ্য করছে। গোপন করতে চায় বটে আনেৎ। এমনভাব দেখায় যেন আলো লাগছে চোখে। কিন্তু ওর ঈষৎ নীলাভ চোখের পাতা ভেদ ক'রে ওর দৃষ্টি বলছে :

'চাও তুমি আমাকে, তুল্লীও ?'

আর তুল্লীও ! একটা বাজে কাহিনী ব'লে যায় সে অলস, পরিতৃপ্ত ভঙ্গিতে আর দেখে মনোযোগ দিয়ে নিজের নখগুলো। কিন্তু বেড়ালের মত অপাঙ্গ দৃষ্টি ওর বিঁধে আছে আনেৎ-এর দেহে, তার দৃঢ় উন্নত বক্ষে। 'তাহ'লে রাজী তুমি ?' দৃষ্টি বলে : 'আমি চাই তোমার কামনা আমাকে ঘিরেই জ্বলবে।'

সিল্ভী বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত না ক'রে হলটা ঘুরে একটা চেয়ার এনে ওদের দু'জনের মাঝখানে ব'সে পড়ে। আনেৎ ভয়ানক বিরক্ত হয়। মনের বিষ ওর ঝরে পড়ে। সিল্ভীর সারা মুখে তার ঝাঁঝ লাগে। যেন কিছু দেখেনি এমনি ভাবে বসে রইল ও, কিন্তু ভেতরে ভেতরে বিদ্যুতের ধাক্কা খাওয়া বেড়ালের মত ফুলতে লাগল। মুখে মৃদু হাঁসি এবং কামড়াবার জন্য একেবারে প্রস্তুত বেড়ালটা। এবারে আর দ্বন্দ্ব নয়, যুদ্ধ—হাতিয়ারের লড়াই নয়—মিঠে মাজা-ঘষা, পালিশ করা কথার লড়াই। আনেৎ সিল্ভীর ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে তুল্লীওর সঙ্গে কথা ব'লে চলে—সিল্ভীর অস্তিত্বকে একেবারে উপেক্ষা করে ও। তুল্লীও বিব্রত হয়। এদিকে সিল্ভী কথা ব'লেই চলে এবং মাঝে মাঝে উপেক্ষা ভেঙে ওর কথা বাধ্য হ'য়ে শুনতে হয় আনেৎকে। উত্তরে সে মৃদু হেসে বাঁকা খোঁচা-দেওয়া ভাষায় ওর ব্যাকরণের ভুলগুলোকে কটাক্ষ করে। [বেচারা সিল্ভী, অত মাজা ঘষা সত্বেও ভুল থেকে যায় ওর] আহত সিল্ভীর চোখের আয়নে থেকে ওর ছিঁছি বাষ্প হ'য়ে উড়ে যায়—যে থাকে সে ওর শত্রু। 'তোমার পালাও আসবে গো আসবে—' ভাবে সিল্ভী। অমনি ছাড়ব ? ঢুকে আসলে

শোধ তুলে ছাড়ব···দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ···না এক চোখের বদলে দুই চোখ···দাঁতে দাঁতে ঘষে যেন বলে ও।

কোমর বেঁধে লড়াইয়ে নামে। হায় নির্বোধ আনেৎ! আজ আর সিল্‌ভীর গর্বে আঘাত লাগে না। হাতের কাছে যে হাতিয়ার পায়, তুলে নেয়। লড়তে হবে এবং জিততে হবে—এই হলো একমাত্র লক্ষ্য। তুল্লীও ওর মনের কথা জানবে, জানবে—ও চায় তাকে, ভাবতেও অপমানে মাথা নুয়ে যায় আনেৎ-এর। কিন্তু সিল্‌ভীর ও-সব বালাই নেই। ও লোকটাকে ওর জয় করতেই হবে। সুতরাং যে-খেলায় সে ভুলবে সে-খেলাই খেলবে ও।

কি চাও সিল্‌ভী? কি নেবে? বেশ চমৎকার পালিশ-করা, চিক্কণ অভিজাত একটুখানি ঘৃণা? না পূজা? কোনটা চাও?

সিল্‌ভী পুরুষ চেনে। জানে ওরা কত বড় ফাঁপা। তুল্লীও-ও প্রশংসা ভালোবাসে। দেহ মনে সজ্জায় যেখানে যেটুকু সুন্দর আছে, খোলা হাতে তার প্রশংসা করে। চালাক মেয়ে। বিশেষ ক'রে ওর পোষাকের। ঠিকই বুঝেছে সিল্‌ভী তুল্লীওর-ও সব থেকে বড় গর্বের বস্তু ওর পোষাক। প্রশংসা মাত্রই অবশ্য ওর ভালো লাগে। কিন্তু চেহারার তারিফ ও বহু শুনেছে। আর মন, সে তো বংশগুণে। একমাত্র সজ্জাই ওর নিজস্ব। ওখানেই ওর আসল কৃতিত্ব। সুতরাং একজন প্যারী-তরুণীর প্রশংসা কি কম কথা ওর পক্ষে! সিল্‌ভী পাকা বিশেষজ্ঞের ভঙ্গিতে ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির শতমুখে প্রশংসা করে। আনেৎ রাগে ফোলে। ওর মনে হয় বড় স্থূল সিল্‌ভীর রুচি। ভাবে, তুল্লীও বরদাস্ত করে কি ক'রে এমেয়েকে? শুধু বরদাস্ত করে না তুল্লীও—মনে হয়, সে দুধের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছে। প্রশংসা করতে করতে কমলা রংএর গলাবন্ধটা থেকে আসে লিলাক রংএর বেল্টএ; সেখান থেকে সোনালী সবুজে মেশান জুতোয় এসে হঠাৎ থেমে যায় সিল্‌ভী—একটা মৎলব আসে মাথায়। তুল্লীওর পা দুখানি বাস্তবিকই ভারী সুন্দর; এ তুল্লীও জানতো এবং গুমরও আছে এ সম্বন্ধে। সিল্‌ভী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওর পায়ের বর্ণনা করতে করতে নিজের সুন্দর পা দুখানাও খুলে ধরে এবং খানিকটা ন্যাকামির ভান ক'রে ইচ্ছে ক'রে তুল্লীওর পায়ের পাশে রাখে। তারপর হাঁটু পর্যন্ত স্কার্টটা তুলে পায়ের তুলনা

করে ওর সঙ্গে। আনেৎ তার দোলনা-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে জ্বলছিল রাগে আর ক্ষেপে। সিলভী ওর দিকে ফিরে ভারী মিষ্টি হেসে বলে : 'দিদি ভাই, দেখানা তোর পা টা—'

এবং উত্তরের অপেক্ষা না করে খ। ক'রে ওর স্কার্টটা সরিয়ে দেয়। আনেৎ-এর মোটা মোটা থামের মত পা আর ভারী গোড়ালি বেরিয়ে পড়ে। তক্ষুণি খপ ক'রে ওর হাতটা ধরতে যায় আনেৎ, কিন্তু হাত সরিয়ে নেয় সিল্‌ভী। ওর কাজ হাসিল। তুল্লীও দেখতে পেয়েছে···

ওখানেই থামল না দুষ্টু মেয়ে। সারা সকাল এমনি ক'রে ও এটা সেটা তুলনা ক'রে বেড়াল যেন নিছক খেয়ালেই। ব্লাউস, কলার, স্কার্ফ—তুল্লীওর অভিমত চায়। সূক্ষ্ম রুচি তার। কৌশল ক'রে আনেৎ-এর ভালো আর নিজের খারাপ দিকগুলো এড়িয়ে যায়। আনেৎ বেচারা ভারী অসুবিধায় পড়ে। ভেতরে ভেতরে ও রাগে ফোলে। ইচ্ছে হয় গলা টিপে মেরে ফেলে শয়তান মেয়েটাকে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে। এমনি ভাব দেখায় যেন কিছু বোঝেনি। দুষ্টু সিল্‌ভী একটা অনর্থ ক'রে তক্ষুণি সহজ সারল্যের হাসি মুখে মেখে ঠোঁটের উপর আঙুল ছুঁইয়ে আনেৎকে চুমু ছুঁড়ে মারে। কিন্তু কখনও কখনও দুই জোড়া চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। 'আমি ঘৃণা করি তোমাকে···' আনেৎ-এর চোখ বলে।

'বয়ে গেল। কিন্তু তুল্লীও ভালোবাসে আমায়। বুঝেছ!'

'কখনও না, মিথ্যে কথা···' আনেৎ-এর চোখ যেন চিৎকার করতে চায়।

'মিথ্যে নয় গো মিথ্যে নয়, একেবারে তিন সত্যি।' শ্লেষ সিল্‌ভীর চোখে।

'যুদ্ধং দেহি।' গর্জে ওঠে চার চোখ।

আনেৎ হাসি দিয়ে মনের আগুন ঢাকতে জানে না, পারেও না, অত শক্ত নয় ও। সিল্‌ভী পারে। ও তো মানুষ নয়, ও যেন ফুল-ঢাকা সাপ। আর খানিকক্ষণ ওখানে থাকলে আনেৎ হয় তো কেঁদেই ফেলত। সুতরাং সিল্‌ভীকে একেশ্বরী ক'রে দিয়ে ও হঠাৎ ঘর ছেড়ে চ'লে যায় মাথা উঁচু ক'রে, উদ্ধত গর্বিত দৃষ্টি শত্রুর দিকে হেনে। 'শেষের হাসিই আসল হাসি।' জবাব দেয় সিল্‌ভীর ব্যঙ্গভরা চোখ।

[এগার]

লড়াই চলে পরের দিনও, তার পরের দিন এবং তার পরেও আরো অনেক দিন। হোটেল ভরা মানুষগুলোর কৌতুকের খোরাক জোটে। বিশ জোড়া অলস সন্ধানী চোখ ওদের পেছন পেছন ফেরে। তারা দেখেছে এবং বুঝেছে সব ; বাজিও ধরেছে নানা সম্ভাবনার ওপর। সিল্‌ভী আর আনেৎ নিজেদের খেলায় এত ব্যস্ত ছিল যে এসব কিছুই ওরা লক্ষ্য করেনি।

আসলে, শুরুতে যা খেলা ছিল আজ আর তা খেলা নেই। শয়তান ভর করেছে ওদের কাঁধে। বিজয়ী তুল্লীও আরও আগুন জ্বালে। রূপ আর বুদ্ধি ওর দুটোই আছে প্রচুর। বাসনার যে আগুন ও নিজে জেলেছে তাতে ও অহরহ জলছে। যোগ্য বলেই জয় হয়েছে ওর। এ কথা ওর মত এত ভাল ক'রে কেউ জানে না।

সন্ধ্যাবেলায় দুবোনের ঘরে দেখা হবেই। অসহ্য এ সান্নিধ্য। না বোঝার ভান ক'রে আপনাকে ওরা চোখ ঠার দিয়ে রাখে। নইলে রাত্তির বেলা পাশাপাশি ঘরে শোয়াটুকু চলত না। তা ছাড়া লোক জানা জানি হওয়াও অনভিপ্রেত। সুতরাং আলাদা সময়ে ওরা ঘরে ঢোকে, কথা কইতে হয় না— সাক্ষাৎটাও এড়ান যায়। কিন্তু সব সময়ে তা সম্ভব হয় না, রাত ভোরে দেখা হবেই। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে শীতল কণ্ঠে সুপ্রভাত বা শুভরাত্রি জানিয়ে পাশ কাটিয়ে যায়। খোলাখুলি কথা ব'লে একটা বোঝা-পড়া হ'লে ভালো হ'ত। কিন্তু ওরা চায়ওনি, চাইলেও পারত না। মেয়েদের রাগ হ'লে তারা কাণ্ড-জ্ঞান হারায়, খোলাখুলি কথা বলবে কে ?

আনেৎ-এর আবেগ বিষের কাজ করল। তুল্লীও সেদিন জোর করেই পথের বাঁকে একা পেয়ে অহংকারী মেয়েটার ওষ্ঠে একটি চুম্বন এঁকে দিলে। ওর শিরায় শিরায় কামনার জোয়ার উথলে উঠল। রাগে অপমানে আনেৎ রুখে দাঁড়াল। কিন্তু পারল না ঠেকাতে ওর কুমারী জীবনের এই প্রথম বর্ষার ঢল।

বদ্ধ ঘরের নিরাপত্তায় আগলে রাখা মনগুলোর এই দশাই হয়। প্রবৃত্তির মুখে শুদ্ধ-সত্ত্ব-ব্রহ্মচারীর দল সব থেকে বেশী অসহায়।

রক্তের আগুন ওর রাতের ঘুমকে শুদ্ধ পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে গেল। সেদিন অনেকক্ষণ ছট ফট ক'রে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল আনেৎ। কিন্তু ওর মনে হ'ল ও ঘুমোয়নি। চোখ খুলেই শুয়ে আছে, অথচ হাত পা নাড়তে পারছেনা—কে যেন বেঁধে রেখেছে। সিলভী ওর পাশে শুয়ে…ঘুমোয়নি, ঘুমের ভান ক'রে আছে, ক্লুনীও আসবে। হঠাৎ বারান্দায় মচ মচ শব্দ। কে যেন সাবধানে পা টিপে টিপে আসছে। সিল্‌ভী মাথা তুলে সন্তর্পণে চাদরের ভেতর থেকে পা বের ক'রে খাট থেকে ঝুলিয়ে দেয়, তারপর উঠে চুপি চুপি দরজার দিকে যায়। দরজাটা অর্ধেক খোলা রয়েছে। আনেৎও উঠ্‌তে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সিল্‌ভী চমকে ওঠে, আনেৎ বুঝি টের পেল। ফিরে আসে খাটের কাছে, ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর আরো ভালো ক'রে দেখবার জন্য ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে।…কিন্তু একে? সিল্‌ভীর মত তো দেখতে নয়, একটুও নয়। এতটুকু সাদৃশ্য নেই। তবু সিল্‌ভীই তো। দাঁত বের ক'রে শয়তানীর হাসি হাসছে সিল্‌ভী। ওর কাঠির মত শক্ত কালো কালো লম্বা চুলগুলি আনেৎ-এর চোখ মুখ খোঁচিয়ে যাচ্ছে, মুখের মধ্যে একেবারে জিভের ওপরে খস্ খসে শক্ত রোঁয়ার মত কিসের খোঁচা লাগে যেন—বিশ্রী একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধও আসছে চুলের। সিল্‌ভীর মুখ এগিয়ে আসছে, কাছে আরো কাছে। চাদর তুলে ও বিছানায় এসে ঢুকল। একটা শক্ত হাঁটুর চাপ লাগল ওর কোমরে। নিশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে আসছে আনেৎ-এর। ওকি সিল্‌ভীর হাতে ছোরা যে—ঐ তো ঠাণ্ডা ফলাটা এসে বস্‌ল ওর গলায়। আনেৎ ঝাপটা ঝাপটি ক'রতে লাগল—চিৎকার ক'রে উঠল…। বিছানার ওপর উঠে বসেছে আনেৎ। শান্ত নীরব ঘর, কোনো সাড়া শব্দ নাই। বিছানার চাদরটা এলোমেলো। সিল্‌ভী নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে ওঘরে। বুকের কাঁপুনি একটু কমলে কান পাতে—সিল্‌ভী ঘুমোচ্ছে—তার শান্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ আসছে…ঘাম দিয়ে যেন ওর গায়ের জ্বর ছাড়ল। ভয়ে ঘৃণায় ওর দেহ থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে থাকে…।

ঘৃণা? কিন্তু কাকে ঘৃণা করো আনেৎ? কাকে ভালোবাসো তুমি? তুল্লীওকে একটু ভালো লাগে এই মাত্র—ওকে তো শ্রদ্ধা করে না আনেৎ—বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস—এতটুকু না। মাত্র সপ্তাহ দুই-এর চেনা। কেউ না ওর, নিতান্ত পর, আর তারই জন্য কিনা ও আজ দূরে ঠেলে দিতে বসেছে অতি আদরের একমাত্র বোনকে, যাকে ও ভালোবেসেছে প্রাণের চাইতে বেশী, এবং এখনও বাসে…[না না, এখন বাস না, আনেৎ!…নিশ্চয়…নিশ্চয় বাসে, এখনও বাসে] অসতর্ক মুহূর্তে এই লোকটার হাতেই ও ডালি দিয়ে বসল ওর বাকী জীবনটা!…না…না…কি ক'রে তা সম্ভব? শিউরে ওঠে আনেৎ। একি মারাত্মক পাগলামো! মাঝে মাঝে শুভ বুদ্ধি জাগে। মনটা মোড় ঘুরতে চায়। সিল্‌ভীর প্রতি পুরানো স্নেহ সব ছাপিয়ে জেগে ওঠে। কিন্তু সিল্‌ভীর চোখে যদি এতটুকু বিরূপতা পড়ল, যদি কখনও দেখল তুল্লীও তার সঙ্গে নীচু স্বরে কথা কইছে—সব গোলমাল হ'য়ে যায় আবার।

হেরে যাচ্ছে আনেৎ। ও পিছু হ'টে যাচ্ছে। এই জন্যই ও আরো পাগল হ'য়ে, বেসামাল হ'য়ে ওঠে। ব্যবহার হ'য়ে ওঠে স্থূল। বুঝতে পারে না এই অপমান ও কেমন ক'রে ঢাকবে। তুল্লীও দু'জনের মধ্যে একজনকে কিছুতেই বেছে নেবে না। হাতের রুমাল খানা দু'জনের মাঝখানে ছুঁড়ে দেয়, ভাগ্য পরীক্ষা হোক। সিল্‌ভী চোখের নিমেষে রুমাল খানা তুলে নেয় নিঃসংকোচে।

তারপর তুল্লীওকে নাচাবে ও নাকে দড়ি দিয়ে। সুতরাং, সে যদি আনেৎকে দু'একটা চুমু ছুঁড়ে দেয়ই দিক না। ও নিয়ে মাথা ঘামায় না সিল্‌ভী। আর-যদিই বা একটু আধটু লাগেই, তা থাকবে ওর মনে। বাইরের মানুষ তার এতটুকু আঁচ পাবে না। কেনই বা পাবে?…কিন্তু আনেৎ পারে না তা। ভালোবাসার ক্ষেত্রে ভাগাভাগি ও সইতে পারে না। পারেনা সইতে তুল্লীওর এই দু'নৌকোয় পা দিয়ে চলা—ওর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ওর ব্যবহারে ভাবে ভঙ্গিতে ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে তা। লুকোবার চেষ্টাও করে না সে।

ওর প্রতি আগ্রহ ক্রমেই জুড়িয়ে আসে তুল্লীওর। বড্ড বেশী সত্যি ক'রে নিয়েছে সব আনেৎ। বড় বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। কি রকম ঘাবড়ে যায় ও।

মনটা বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। ভালোবাসলেই তাকে সত্যি ভেবে নিতে হবে নাকি! একটু আধটু মন্দ নয়,কিন্তু এত বাড়াবাড়ি ওর ভালো লাগে না। ওর কাছে প্রেম হ'ল অপেরার প্রধান গায়িকার মত। গান গেয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় শ্রোতার দলকে অভিবাদন করতে। কিন্তু আনেৎ-এর দর্শনে প্রেমের মধ্যে ভিড়ের স্থান নেই।

ওর এই ভালোবাসার মধ্যে একটুকু মিথ্যে নেই। এত গভীরতা দিয়ে ভালোবেসেছে ও যে আঘাতের দাগগুলো মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছে না। শুধু আঘাতই বা কেন, সাধারণ ছোট খাটো ব্যাপারগুলোও ভুলতে পারছে না। কোন হুসিয়ার মেয়ে ওসব নিয়ে অমন ছিচকাঁদুনে-পনা করে না। কাজেই ওকে নিয়ে তেমন জুত হয় না। তা ছাড়া হার মেনে একেবারে সাধারণ ঘরোয়া মেয়ের পর্যায়ে পড়ে গেছে আনেৎ।

সিল্ভীর আর কোন সংশয় নেই। ওই জিতে গেছে। এখন নিরুপায় আনেৎ-এর সম্বন্ধে ওর মনে শ্লেষ মিশ্রিত বিচিত্র এক পরিতৃপ্তি। হয়ত অনুকম্পাও আছে…'কেমন, হ'লো এখন! এই চেয়েছিলে নাকি! বাঃ বেশ দেখায় তো…আহা-রে বেচারা! মার-খাওয়া কুকুর…!'

সিল্ভীর ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধ'রে আদর ক'রে আসে। কিন্তু কাছে এলেই আনেৎ এমন তেড়ে আসে যে ও বিরক্ত হ'য়ে ফিরে যায়…

'ওঃ আমার আদর চাই না তোমার! আচ্ছা!' বলে মনে মনে। 'আচ্ছা আচ্ছা, বেশ যা ভালো লাগে কর বাপু, আমার কোন্ মাথা ব্যথা…কথায় বলে, চাচা আপন বাঁচা…!' যাই হোক্। ও যদি সেধে কষ্ট পায়—তবে আর কার দোষ! দুনিয়ায় সবই যেন সত্যি! হাসে যে লোকে ওর বোকামী দেখে! [সবাই ওকে এই ভাবছে আজকাল] আনেৎ সরে আসে একেবারে।

সিল্ভী আর তুল্লীও একটা মূক অভিনয়ের আয়োজন করছিল যার মধ্যে নিজের রূপ গুণ এবং আরও অনেক কিছু দেখাবার সুযোগ হবে সিল্ভীর। [যাদুকরী সিল্ভী, বহুরূপী। সামান্য একটু হাতের ছোঁয়ায় ও বহুবার ভোল বদলাতে পারে। একবারের চাইতে আর একবার ওর চেহারার জলুষ বাড়ে।]

এ বিষয়ে সিল্‌ভীর সঙ্গে লড়তে গেলে আরো খারাপ হবে—এ আনেৎ বেশ জানে। আর আগে থেকেই তো হেরে আছে—সুতরাং লাভ তো কিছু নেই। সেইজন্যই যখন অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করার জন্য ওকে অনুরোধ করা হ'ল, ও স্বাস্থ্যের অজুহাত দেখিয়ে সরে এল। চেহারাটা ওর শুকন। হয়তো সত্যিই শরীর ভালো নেই। তুল্লীও জোর করল না। কিন্তু অস্বীকার ক'রে পরমুহূর্তেই অস্থির হ'য়ে উঠল আনেৎ। কেন ও লড়ল না, কেন রণক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল। তৈরীই তো ছিল ও! কেন ছাড়ল সংগ্রাম! না হয় আশা নেই কিন্তু আশা ফুরিয়ে গেলে সংগ্রামই তো নূতন ক'রে বুকে আশার দীপ জ্বালে। এখন সিল্‌ভী আর তুল্লীও দিনের অনেকটা সময়ই একা থাকবে। না, তা হ'তে পারে না। অন্ততঃ রিহার্শেলের সময় ও উপস্থিত থাকে। একটু বিব্রতও তো হবে ওরা। কিন্তু বিব্রত তো ওরা হয়ই না বরঞ্চ পরমোৎসাহে সিল্‌ভী বার বার একটি বিশেষ দৃশ্য রিহার্শেল করতে থাকে···সাক্ষাৎ যমের মত চেহারা এক জলদস্যু অসহায়া এক মেয়েকে হরণ ক'রে নিয়ে চলেছে···মূর্ছিতা হ'য়ে পড়েছে বালিকা···; তুল্লীও দস্যুর ভূমিকায়···।

অভিনয়ের দিন এসে গেল। আনেৎ একেবারে শেষের দিকের আসনে গিয়ে বসল সকলের চোখের আড়াল হ'য়ে। এই উদ্দম মাতনের মধ্যে আনেৎ-এর কথা মনে নেই কারো। হয়ত ভালোই হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলেনা। ওর ভেতরটা যেন ফালি ফালি হ'য়ে ছিড়ে যেতে লাগল। মাথাটা আগুন হ'য়ে উঠল—সারা মুখে কেমন একটা তেঁতো স্বাদ···চলতে লাগল বেদনার রোমন্থন। প্রত্যাখ্যাত প্রেমের পীড়া ওর মর্ম-মূলকে কুরে কুরে খেতে লাগল।

ও চলে গেল হোটেলের বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে। কিন্তু বেশী দূর যাওয়া হ'ল না। ওই আলোকোদ্ভাসিত মুখর হলের চারধারেই ও ঘুরতে লাগল।

সূর্য অস্ত গেছে, অন্ধকার হ'য়ে আসে। হলের এক পাশ দিয়ে ছোট একটা দরজা, ঐ পথেই অভিনেতারা মঞ্চের বিপরীত পাশে অবস্থিত সজ্জা-কক্ষে যায় দর্শকের চোখ বাঁচিয়ে। একটা আদিম চেতনা দিয়ে বোঝে আনেৎ ওরা দু'জন এদিক দিয়েই আসবে। ভুল হয়নি ওর।

খানিক দূর দিয়ে—মাঠের এক প্রান্তে অন্ধকারে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলে। ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে আনেৎ। হেসে হেসে বলছে সিলভী :

'না না, আজ রাতে নয়—'

'কেন নয়, বলো—' তুল্লীও জেদ করে।

'প্রথম কথা মশাই আমি ঘুমোব।'

'ওঃ ভারী তো ঘুম, ঘুমের ঢের সময় আছে।'

'কই আর প্রাণ ভ'রে ঘুমোতে পারি বলো—'

'আচ্ছা, তাহ'লে কাল রাতে কিন্তু—'

'রাতে! সে তো এক কথাই হ'লো। তাছাড়া রাতে আমি একা থাকিনা; আমার পেছনে টিক্‌টিকি আছে জানো!'

'তাহ'লে উপায় নেই আর?'

দুষ্টু মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

'কেন, তোমার বুঝি দিনে ভয়! আমার অত ভয় টয় নেই—'

আর শুনতে পারেনা আনেৎ। একটা অতিকায় ঘৃণা আর রাগে ওর সমস্ত সত্তা মথিত, বিপর্যস্ত হ'তে থাকে।

ও আর থাকতে পারে না…উন্মত্তের মত ও মাঠ ভেঙ্গে ছুটে চলে অন্ধকারে প্রাণের ভয়ে পালানো জন্তুর মত। কোন দিকে দৃষ্টি নাই—পায়ের নীচে শুকন ডাল ভাঙ্গে—শব্দ হচ্ছে মড় মড়। হয়তো শুনছে ওরা। কিন্তু আনেৎ-এর ভ্রুক্ষেপ নাই। শুনুক। বয়ে গেছে। ছুটছে ছুটছে আনেৎ, নিশায় পাওয়ার মত কেবলি ছুটছে সামনে। পলায়ন? কোথায় পালাবে আনেৎ? জানেনা আনেৎ জানেনা…। কোথায় স্থান…? ও ছুটছে…ছুটছে…মর্মভাঙ্গা ক্রন্দনে রাতের আঁধারকে জাগিয়ে দিয়ে ও চলেছে সামনে…কোনোদিকে দৃষ্টি নাই… সময়ের হিসাব নাই…চেতনাও নাই…পাঁচ মিনিট…পোনের মিনিট…একটা পুরো ঘন্টাই হয়ত লাগল। হঠাৎ একটা গাছের শিকড়ে পা বেধে প'ড়ে যায় আনেৎ…মাথা ঠুকে যায় গাছের গুড়িতে…ও চিৎকার ক'রে ওঠে…আহত পশুর মত মুখ থুবড়ে প'ড়ে গোঙ্গায়…

চারদিকে রাত্রি থম্‌থম্‌ করে।

চাঁদ তারা-হীন এক কালো, নিকষ কালো আকাশ। মূক মূর্ছিত পৃথিবী··· কোথাও একটি নিশ্বাসের স্পন্দনও নাই···কীট পতঙ্গের শব্দ পর্যন্ত নাই···। পৃথিবী কি মরে গেল? থেমে গেল তার হৃৎস্পন্দন! কেবল ঋজু দীর্ঘকায় গাছটার—[যার পায়ে মাথা ঠুকেছে ওর—] গুড়ির কাছে টিপ্‌ টিপ্‌ ক'রে ঝরছে একটি ক্ষীণ জল-ধারা, ঝির্‌ ঝির্‌ ক'রে ব'য়ে চলেছে পাথরের ওপর দিয়ে। সামনে খাড়া পাহাড়···এত খাড়া, মনে হয় মাটি থেকে হঠাৎ ছিটকে উঠে গেছে যেন আকাশে···তারি বুক চিরে চ'লে-যাওয়া গভীর কাটল থেকে আসছে পার্বত্য-ধারার অশ্রান্ত গভীর গর্জন। এ তো জলধারার গর্জন নয়—এ যেন পৃথিবীর শাশ্বতী ক্রন্দসী···আজ ওর মর্মের হাহাকারের সাথে সুর মিলিয়েছে···

কেঁদে চলেছে আনেৎ···চিন্তা করার শক্তি নাই···কান্নায় ওর সারা দেহ মথিত, উদ্বেলিত···এ কয়দিনের সঞ্চিত বেদনার ভার আজ গ'লে গ'লে ঝ'রে পড়ছে অশ্রু-ধারা হ'য়ে। ধীরে ধীরে কান্নার আবেগ শান্ত হ'য়ে আসে। শ্রান্ত দেহ আসে ঝিমিয়ে। সম্বিৎ ফিরে আসে···একা···একা···আনেৎ একা···এই বিশাল বিশ্ব-প্রাঙ্গনে ও একা···পথের ধারে ধূলোর বুকে ছুঁড়ে ফেলেছে ওকে বিশ্বাসঘাতক মানুষ। কিন্তু এর বেশী আর ভাবতে পারে না ও। ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেছে ওর সমস্ত ভাবনা···এক সাথে ক'রে গুটিয়ে নেবার শক্তি ওর নেই। ওঠার শক্তিও নেই। অবশ দেহে এলিয়ে প'ড়ে থাকে মাটিতে··· আঃ মাটি···মাটি···গ্রহণ করো মাটি···গ্রহণ করো···গ্রহণ করো···

পাহাড়ী জলধারা কল্লোলের স্বরে কথা কয়···বেদনায় গ'লে গিয়ে ঝ'রে পড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে···। আনেৎ-এর মর্মের ক্ষত ধুইয়ে দেয় স্নিগ্ধ ধারায়। অনেকক্ষণ পর···কে জানে কতক্ষণ, আনেৎ ওঠে। দেহ তখনও শ্রান্ত, মন অবসন্ন। মাথার আঘাতটা টন্‌ টন্‌ ক'রে ওঠে। দৈহিক বেদনায় চিত্তের বেদনা অনেকটা ঢাকা প'ড়ে যায়। হাত ছ'ড়ে গেছে, মাথা জ্বলছে। পাশের জল-ধারায় ক্ষত বিক্ষত হাত ডুবিয়ে জল নিয়ে কপালের ক্ষতে মাথায় ছিটিয়ে দেয়। ভেজা হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে, চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকে···শীতল

জলের স্পর্শ অনুভব করে চিত্ত ভ'রে…। ধীরে ধীরে বেদনা মিলিয়ে যায়। একি ওরই বুকের কান্না ছিল? অর্থহীন মনে হয় এতদিনের যত পাগলামো, এত দুঃখ পেলাম কেন? কি লাভ হ'ল? সত্যি কি হেতু ছিল? জল-ধারা কল্লোলের ভাষায় কয়:

'তাতো ছিল না বোকা মেয়ে। নেহাৎ বোকা তুমি তাই, সব বৃথা… নিরর্থক…'

'কিন্তু কি চেয়েছিলাম বলো তো?' সকরুণ একটি তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলে আনেৎ: 'কি জানি কি চেয়েছিলাম…জানি না…জানি না। সুখ কি? বড়ো রকমের একটা সুখ চেয়েছিলাম বোধ হয়। কিন্তু আর লোভ নেই আমার। নিয়ে যাও যে নেবে, কিছু বলব না।'

অকস্মাৎ দমকা হাওয়ায়, ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে আসে যে-সুখ ও চেয়েছিল তারি স্মৃতি…ঐ কামনার অগ্নিবর্ষী ঝড়ের দাপটে ওর সমস্ত দেহ ঝন্ ঝন্ ক'রে বেজে উঠেছিল। সে ঝংকার আজও থামেনি, থামবে না কোনও দিন। জানে অন্যায়, তবু বেজে উঠেছিল। কামনা তো একা আসে না, সঙ্গে নিয়ে আসে হিংসা আর দ্বেষ…মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে তারি। মার খায় আনেৎ নীরবে। তারপর মাথা তুলে উচ্চৈঃস্বরে বলে ওঠে:

'অন্যায়…অন্যায় করেছি আমি…সিল্‌ভীকে ভালোবাসে সে…আমায় নয়। তাই হোক, তাই হবে…। ভালোবাসবার মত মেয়েই তো সিল্‌ভী…। আমার চাইতে অনেক সুন্দর ও, আমি কি জানিনে তা?…তাইতো আমিও ভালোবাসি ওকে। ওর সুখেই আমার সুখ। আমার বড় অহমিকা। কিন্তু কেন ও আমার কাছে মিথ্যে কথা বল্‌লে…কেন…। আর যা খুশি করুক। মিথ্যে কথা কেন বল্‌ল…কেন লুকোল? আমায় এমন ক'রে প্রবঞ্চনা করলে কেন…কেন এমন করলে সিল্‌ভী? কেন আমার কাছে এসে মন খুলে সব বললনা…? আমায় কেন ও ঠেলে দিলে দূরে? কেন মনে করলে আমি ওর শত্রু! তারপর ওর চলা ফেরা কথা বার্তা…আমি ঠিক যা পছন্দ করিনা তাই কেন করলে—অমন বিশ্রী ভাবে; কিন্তু দোষই বা কি ওর! আশৈশব কাটল ওর কোন্ জগতে! আমার কি অধিকার আছে ওর দোষ ধরার? আর আমি, আমিই কি সরল

অকপট ব্যবহার করেছি···আমি পরিনি মুখোস? আমার মন ওর চাইতে কোন অংশে ভদ্র ছিল? ছিল? ছিল? বলো আনেৎ···স্বীকার করো সত্য··· ছিল বলছো কেন? বলো আছে, এখনও আছে···আমি তো জানি আমার মনের অলিগলিতে সাপ লুকিয়ে আছে। এখনও আছে···।

অবস···শ্রান্ত দেহ···ভাঙ্গা মন···দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

না···না···এর শেকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে···আজ এই মুহূর্তে, আর দেরি নয়। আমি বড়···ছোট বোন সিলভী আমার। অপরাধ তো আমারই বেশী। সিলভী সুখী হোক···সুখী হোক···হোক্ সুখী। তবু ব'সে থাকে আনেৎ···নিশ্চল প্রতিমার মত। ছ'ড়ে যাওয়া হাতের ক্ষত গুলি চোষে···আর মৌনতার বাণী শোনে···শোনে আর স্বপ্ন দেখে···। তারপর আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে উঠে প'ড়ে সামনের দিকে এগোয়।

[বার]

রাত্রির বুক চিরে চলেছে আনেৎ! চাঁদ ওঠার এখনও দেরি আছে। কিন্তু দিক্‌চক্রবালের ওপারে তার উদয়ের আভাস। অন্ধকারের মহাসাগর থেকে উঠছে চাঁদ। মালভূমি-শীর্ষের বলয়িত সীমা-রেখা এক মৃদু আলোয় আলো হ'য়ে উঠেছে। এক জ্যোতির্বলয়ের পটভূমিতে মাল-ভূমির কালো প্রোফাইল কৃষ্ণতর হ'য়ে উঠছে প্রতি-মুহূর্তে। আনেৎ ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে। স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাসে শান্ত ভেতরটার খবর পাওয়া যায়। প্রশান্ত চিত্তের অঞ্জলি ভ'রে ও মাটির আর সদ্য-ফোটা ঘাসের সুরভি পান করে।

অনেকটা দূরে অন্ধকার রাস্তায় কার যেন দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা যায়। ওর বুক কেঁপে ওঠে। পা থেমে যায়। চেনা পায়েরই শব্দ—তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। ও পক্ষও যেন শুনতে পেয়েছে ওর পায়ের শব্দ। একটি উৎকণ্ঠিত ব্যগ্র স্বর ভেসে আসে: 'আনেৎ!'

আনেৎ সাড়া দেয় না, দিতে পারে না। ওর ভাষা হারিয়ে গেছে, বাক্-শক্তি লুপ্ত হয়েছে। হঠাৎ আনন্দের একটা বিপুল স্রোত ওকে ভাসিয়ে নিয়ে

যায়⋯ভাসিয়ে নিয়ে যায় ওর সর্ব বেদনা, ধৌত ক'রে, নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয় বেদনার যত চিহ্ন আর স্মৃতি। কথা কইতে পারে না আনেৎ। কিন্তু পায়ের বেগে প্রাণের আবেগ ভাষা পায়। ওদিকে যে আছে সেও ছুট্‌ছে যেন। আরেকবার ভেসে আসে⋯'আনেৎ!' স্বরে একটা গভীর বেদনা সু-উচ্চার।

পাহাড়ের আড়ালে চাঁদ উঠেছে। অস্বচ্ছ আলোয় আঁধার ফিকে হ'য়ে আসে⋯শুভ্রায়মান কালোর মাঝে ভেসে ওঠে একটি অস্পষ্ট মূর্তি। আনেৎ চিৎকার ক'রে ওঠে: 'বোন্⋯' তারপর দু'হাত বাড়িয়ে অন্ধের মত সম্মুখে চলে⋯

মিলনের ব্যগ্রতায় দু'দিক থেকে দুটি দেহ পরস্পরের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'জোড়া বাহু পরস্পরকে আবেগে জড়িয়ে ধরে। দু'জোড়া ওষ্ঠ ব্যাকুল ভাবে একাত্ম হ'য়ে যায়⋯।

'আনেৎ, আনেৎ, আমার আনেৎ!'

'আমার সিল্‌ভী, আমার সিল্‌ভী!'

'দিদি, দিদিভাই!'

'কি দিদি!'

হারানো আনন্দ ফিরে আসে, ফিরে আসে গৃহে হারানো আপন জন। অন্ধকারে দু'জনের হাত ফেরে দু'জনের চুলে, মুখে, সর্বাঙ্গে; স্পর্শে স্পর্শে স্নেহোদ্বেল অন্তর গ'লে গ'লে ঝ'রে প'ড়ে। আনেৎ-এর গায়ে গরম কাপড় নেই—হাতে ঠেকে সিল্‌ভীর। 'ছিঃ ছিঃ কি করেছ দিদি, গায়ে দাওনি কিছু!' উদ্বিগ্ন স্বরে ব'লে ওঠে ও। আনেৎ-এর মনে পড়ে যায়—তাইতো, সান্ধ্য-পোষাকই তো পরা রয়েছে। হঠাৎ শীত লাগে; সারা শরীর থর্ থর্ ক'রে কেঁপে ওঠে।

'পাগল! পাগল! দিদিটা বদ্ধ পাগল—' সিল্‌ভী নিজের কোটটা ওর গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে বলে। ওর হাত এখনও সন্ধানে ফিরছে⋯

'একি দিদি, তোর জামা কাপড় যে ছিঁড়ে একাকার হ'য়ে গেছে। কি করছিলি বল্‌তো! কি হয়েছে দিদিভাই। চুলগুলো সব এলোমেলো—মুখের ওপর এসে পড়েছে! আর ঘ্যাঁ-ঘ্যাঁ একী? কপালে কি হয়েছে! পড়ে গিয়েছিল বুঝি?'

আনেৎ নীরব। সিল্‌ভীর কাঁধে মুখ গুজে শুধু কাঁদে। রাস্তার ধারে একটি পুলের ওপর গিয়ে ওরা বসে। সিল্‌ভী ওকে ধ'রে পাশে বসায়। পাহাড়ের বাধা ঠেলে চাঁদ বেরিয়ে এসেছে। আনেৎ-এর কপালের ক্ষত স্পষ্ট দেখা যায়। সিল্‌ভী চুমোয় চুমোয় সে-ক্ষতের বেদনা শোষণ ক'রে নেয়।

'বলো, বলতেই হবে কি হয়েছে—' সিলভী বলে : 'কি হয়েছে ভাই! ওঃ ঘরে গিয়ে যখন তোকে দেখলাম না, আমার যে কি অবস্থা হ'লো! এখানে সেখানে, কোথায় যে খুঁজিনি। পুরো একটি ঘন্টা খুঁজেছি। আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল...ভয় করছিল, জানিস্...আমি ভাবছিলাম...জানি না, জানি না...কেন আমার বুক অমন ক'রে কাঁপছিল...থাক্‌গে, কেন বেরিয়ে এসেছিলি বলতো...'

কি বলবে আনেৎ?

'আমি জানি না,' ও বলে : 'শরীরটা ভালো লাগছিল না। একটু হাঁটতে ইচ্ছে করছিল বাইরে...ভেতরে কেমন দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল...।'

'মিথ্যে কথা! সত্যি কথা বল্, দিদি।'

তারপর আনেৎ-এর মুখের কাছে মুখ এনে কোমল স্বরে বলে সিল্‌ভী :

'আচ্ছা দিদি, সত্যি ক'রে বল, 'সেজন্য' নয়তো...'

'আনেৎ ওর মুখ চেপে ধরে : 'না, না...'

'মিথ্যে কথা বলিসনে, আনেৎ,' সিলভী তবু ছাড়ে না : 'সত্যি বল্ বলছি। আমি বোন না! লুকোসনে, দোহাই তোর। ঠিক বলেছি না, তুল্লীও—।'

আনেৎ-এর চোখ ভিজে ওঠে। চোখ মুছতে মুছতে হাসতে চেষ্টা করে : 'না রে না। বিশ্বাস কর। অবশ্যি একটু না লেগেছিল তা নয়। তবে সে তো আমার বোকামী। সে যাক্। এখন আমার মনে আর কিছু নেই। সে যে তোকে ভালোবাসে তাতেই আমি সুখী। সত্যি বলছি।'

'তাই বল্। ঠিক ধরেছি আমি,' লাফ দিয়ে ওঠে সিল্‌ভী : 'কিন্তু কে বললে আমি ও লোকটাকে ভালোবাসি।' রাগে দু'হাত মোচড়ায় সিল্‌ভী। 'এক ফোঁটাও নয়, এতটুকুও নয়। ওটা জানোয়ার, জানোয়ার, জানোয়ার...

'নিশ্চয় ভালোবাসিস্...'

'না, না, না— 'সিল্‌ভী পা আছড়ায় রাস্তার ওপর।

'একটু নাচিয়েছি লোকটাকে। বেশ লাগত নাচাতে। তুই ভেবেছিস্ প্রেম! ছোঃ স্রেফ সাদা কাগজ, দিদিভাই, কোন আঁচড পড়েনি। তা'ছাড়া তোর কাছে কে লাগে রে! তোর এক ফোঁটা চোখের জলের দাম যে পুরুসের হাজারটা চুমোর কুলোয়নারে দিদি!'

আনন্দে আনেৎ-এর বুক ভ'রে ওঠে।

'সত্যি বলছিস্! সত্যি! বল্ সত্যি!' অধীর ভাবে ও সিল্‌ভীর বুকের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে।

দু'জনে একটু স্থির হ'লে সিল্‌ভী বলে: 'আচ্ছা এবারে সত্যি কথা বলতো দিদি, তুইও ভালোবেসে ফেলেছিলি ওকে, না!'

'তুইও মানে? তাহ'লে বাছাধনও প্রেমে পড়েছিলেন!'

'দেখ দিদি, ভালো হবে না বলছি। ও আর নয়। ও সব শেষ হ'য়ে গেছে।'

'হ্যাঁ তাই, চুকেই গেছে।' আনেৎ বলে।

জ্যোৎস্না উছলে উঠেছে। হারানো সম্পদ ফিরে পেয়ে আনেৎ-সিল্‌ভীর প্রাণেও জ্যোৎস্না দুলছে। হঠাৎ সিল্‌ভী থেমে যায়। চাঁদের দিকে বদ্ধ মুষ্টি আস্ফালন ক'রে বলে: 'ওঃ, কি সাংঘাতিক জানোয়ার, আস্ত জানোয়ার!... শোধ তুলে ছাড়ব।'

তারুণ্যের ধর্ম, গা'ল দিয়ে তখনই খল্ খল্ ক'রে হেসে ওঠে সিল্‌ভী।

'কি করব জানিস এখন!' ও একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে: 'গিয়েই বাক্স প্যাঁটরা বাঁধা। কালই সকালে ডেরা গোটান এবং প্রথম গাড়ীতেই। জানোয়ারটা যখন লাঞ্চ খেতে খাবার ঘরে আসবে, দেখবে চিড়িয়া ভাগ গিয়া! কি মজাটাই না হবে, নারে দিদি!' হেসে গড়িয়ে পড়ে সিল্‌ভী: 'জানিস, ঐখানে ঐ বাগানটায় কাল দশটার সময় ওর সঙ্গে আমার দেখা করার কথা...। সারা সকাল ঘোড়-দৌড় ক'রে বেড়াবেন বাছাধন...' আবার হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। আনেৎও হাসে। সিল্‌ভীর খোঁজে ছুটে বেড়াবে লোকটা,

না পেয়ে হতাশ হ'য়ে রাগে টগ্‌বগ্‌ করবে···যতই ভাবে ততই খিলখিল ক'রে হাসে দু'জনে। পাগল, পাগল, বদ্ধ পাগল মেয়ে দুটো। ওদের মনের ঝড়-বাদল কেটে গিয়ে একেবারে ফর্সা নীল আকাশ দেখা দিয়েছে।

'কিন্তু যাই হোক,' আনেৎ বলে : 'ওরকম ভাবে তোর কিন্তু নোংরামির মধ্যে যাওয়া ঠিক হয়নি।'

'হুঁ, ভারী তো,' সিল্‌ভী বলে : 'আমি! আমার ওসবে কিছু হয়না।··· তবে হ্যাঁ, এখন অন্য কথা। এখন আর তো খালি আমি নই, আমি যে তোমার বোন্ সে আর আর ভুলব না, দেখে নিও···।' আনেৎ-এর হাতে চুমো খেয়ে বলে: 'কথা দিচ্ছি ভাই। কিন্তু দিদি, তুমিও তো নিজের রাশ টেনে রাখতে পারোনি।'

'না, তা পারিনি,' অত্যন্ত ব্যথিত অনুতাপের স্বরে আনেৎ বলে : 'আমার তো ভয় হচ্ছিল একেবারে ভেসে যাই বুঝি।' সিল্‌ভীকে প্রবল ক'রে বুকে জড়িয়ে ধরে ; তারপর আবার বলে : 'আচ্ছা বলতো কি অদ্ভুত মানুষের মন! সে যে কখন হঠাৎ ঢেউ তুলে নিমেষে তোমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, কোন্ বালুচরে নিয়ে ঠেকাবে, কেউ জানে না।'

'ঠিক বলেছ,' দিদিকে জড়িয়ে ধ'রে বলে সিল্‌ভী : 'আর সেই জন্যই তো তোমাকে অত ভালোবাসি, তোমার বুকের মধ্যে একটা আস্তো ঝড় পোরা আছে!'

হোটেল। জ্যোৎস্নায় বাড়ীটা যেন ঝলমল করছে। সিল্‌ভী এক হাত দিয়ে দিদির গলা জড়িয়ে ধ'রে কানের কাছে মুখ এনে বলে :

'বড় কষ্ট পেয়েছ, না! ভুলব না দিদি কোনদিন এ সন্ধ্যেটার কথা—ভুলতে পারবনা···পারবনা। মনের মধ্যে একেবারে রক্তের রেখায় খোদাই হ'য়ে গেছে দিনটা—। শেষটায় কিনা আমিই তোমার কষ্টের কারণ হ'লাম! না, না, অস্বীকার করো না দিদি। তোমাকে খুঁজতে পাগলের মত ছুটেছি, আর আজে বাজে কত সব ভেবেছি—ভেবেছি আর ভয়ে থরথর ক'রে কেঁপেছি, কি জানি··· যদি কিছু···আচ্ছা যদিই বা হ'য়ে যেত কিছু···ওঃ দিদি—কিযে করতাম আমি—আর ঘরে ফিরতাম না।'

আনেৎ যেন গ'লে যায়। ভরা কণ্ঠে ডাকে :

'লক্ষ্মী বোন আমার! তোর দোষ কি ভাই, তুই তো ইচ্ছে ক'রে আমায় কষ্ট দিস্‌নি। তুই কি ক'রে জানবি যে আমি কষ্ট পাব।'

'কেন জানব না, একশ' বার জানতাম। জেনে শুনে কষ্ট দিয়েছি।, কষ্ট পাচ্ছ দেখে ফূর্তি করেছি রীতিমত!'

আনেৎ-এর মনটা কুঁচকে এতটুকু হ'য়ে যায়। একটু আগে ও নিজেই চেয়েছে, সিল্‌ভীকে একবার মজা দেখাবে, আচ্ছা ক'রে বুঝিয়ে দেবে। সিল্‌ভী এমন ক'রে কষ্ট পাক, ওর বুক ভাঙ্গুক—ভেঙ্গে ঝর ঝর ক'রে রক্ত পড়ুক—তাই চাইছিল ও। বললে এখন সে-কথা হৃদয় খুলে। দুজনে আবার পরস্পরকে বুকে চেপে ধরে।

'কিন্তু কি হযেছে আমাদের বলতো!' একই প্রশ্ন দুজনে দুজনকে শুধায়। ওদের চোখে মুখে লজ্জা আর ব্যথা। কিন্তু আজ আর ওদের মধ্যে কিছু নিয়ে কাড়াকাড়ি নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। বুকটা হাল্কা হ'যে গেছে।

সিল্‌ভী বলে · 'প্রেম দিদি, একে বলে প্রেম।'

'প্রেম!' নিষ্প্রাণ জবাব দেয় আনেৎ। তারপর যেন চমকে ওঠে। বলে : 'প্রেমের এই চেহারা?'

'সবে তো সুরু, দিদি। এখনই হয়েছে কি!'

আনেৎ প্রবল ভাবে প্রতিবাদ করে : 'বাপ্‌স্‌ এই যদি প্রেম হয, সাত জন্ম আর ওর পাশ মাড়াচ্ছিনে।'

সিল্‌ভী হাসে। ওকে ক্ষ্যাপায়। কিন্তু আনেৎ গম্ভীর হ'য়ে ওই একই কথা বলে, আর নয় ঘাট হয়েছে। প্রেম ট্রেম ওর পোষাবে না।

'বেশ বেশ, ভালো,' হাসতে হাসতে বলে সিল্‌ভী : 'কিন্তু দিদি, প্রেম বাদ দিলে যে জীবনটাই বাদ চ'লে যাবে।'

দ্বিতীয় খণ্ড

[এক]

অক্টোবর মাস। মধুর ধূসর হিম-লগ্না : প্রথম দিবসাঃ। উষ্ণ বৃষ্টির খঞ্জু ধারা ঝরছে অলস ছন্দে। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ···ভাণ্ডার ভরা পাকা ফলের রাশ আর সুরা।

বারগাণ্ডিতে নিজেদেরই বাড়ী রিভিয়েদের। এখানেই এসেছে দু'বোন। খোলা জানালার পাশে ব'সে মাথা হেঁট ক'রে সেলাই করছে ওরা। নিটোল দু'খানি কপাল যেন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। সিল্‌ভীর কপাল খানি আনেৎ-এর চেয়ে সুন্দর। কিন্তু আনেৎ-এর কপালে আছে দৃঢ়তার পরিচয়, তার জেদী স্বভাবের পরিচয়। আর খেয়ালী সিল্‌ভীর কপাল খানিও যেন তেমনি খেয়ালী। যেন ছাগল ছানা আর ক্ষুদে সাঁড়—। মাথা তুললে চোখা চোখি হয়। চোখা চোখিতে লেখা থাকে বোঝা বুঝি। এ কয়দিন অনর্গল ওদের জিভ চলেছে। আজ জিভ বিশ্রাম নিয়েছে। তাই মনের মধ্যে রোমন্থন চলেছে গত কটা দিনের স্মৃতির। কত কথাই কয়েছে ; আর কি বিপুল উত্তেজনা আর আনন্দে ভরে ছিল দিন কটা। পরস্পরের কাছ থেকে কত শিখল কত পেল। সব দেয়া আর সব পাওয়ার জন্য ওরা পরস্পরের হাতে নিজেকে একেবারে কিছু বাকী না রেখে তুলে দিয়েছিল।

কিন্তু বৃথাই চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত প্রহেলিকাই রয়ে গেল পরস্পরের কাছে। মানুষের কাছে মানুষ মস্ত বড় রহস্য। পারস্পরিক আকর্ষণের উৎস ওখানেই। ভাবে মানুষ ; না হয় বোঝাই গেল এমন কি লাভটা হয়! বোঝা মানে বোঝান। মানে ব্যাখ্যা করা। ভালোবাসার মধ্যে ব্যাখ্যা নেই···।

তবুও তফাৎ হয়। পুরোপুরি বোঝাবুঝি না থাকলে সম্পূর্ণ ক'রে পাওয়াও যায় না। কিন্তু ওরা দু'জনে ভালোবাসলে কি ক'রে? একেবারে তো আলাদা মানুষ দু'জন। অফুরন্ত শক্তির অধিকারী হয়েছিল রাওল রিভিয়ের দু'মেয়েই। কিন্তু এক জনের মধ্যে তা দানা বেঁধে সংহত হ'ল; কিন্তু আরেক জনের মধ্যে তা হ'ল না। ভালোবাসার ক্ষেত্রে ওদের পার্থক্য সব থেকে স্পষ্ট। সিল্‌ভীর ভালোবাসার মধ্যে কোথাও রাশ-টানা নেই; অবাধ, উদ্দাম, বেহিসেবী; হাসি দিয়ে তার সুর বাঁধা। অথচ পরোক্ষে বিচার-বুদ্ধিটি জাগ্রত আছে। কেবলি চলে সিল্‌ভী—ও থামতে জানে না, কিন্তু পথের ভুল হয় না ওর। সব সময় ও ডানা ঝটপটায়, কিন্তু যখন উড়তে পায়, নীড়ের চৌহদ্দি ছেড়ে বাইরে যায় না।

মাস ছয় মাত্র আগে আনেৎ জানতে পারল কত বড় বুভুক্ষু প্রেম দাপাদাপি করছে ওর বুকের মধ্যে; ওর সহজ বুদ্ধিই ওকে বলে দিলে অন্যেরা ভুল বুঝবে। ভয় হ'ল। প্রাণপণ শক্তিতে ও চেপে রাখতে, লুকিয়ে রাখতে চাইলে সেই ভুখারী দানবকে। কিন্তু জেগে-ওঠা বন্দী উপোসী দানব নীরবে সংসার নিগড়ে মাথা কুটে মরে আর যে হৃদয়ে সে বন্দী হ'য়ে আছে চোখে ঠুলি বেঁধে, তাকে ধীরে ধীরে কুরে কুরে খায়। এই নিরন্তর নিঃশব্দ দহনে আনেৎ-এর ভার-সাম্য হারিয়ে যায়; কেমন একটা আহত অবসাদে মন অজান্তে তলিয়ে যায়। মন্দ লাগে না অবস্থাটা, কি জানি কেন যাতে ব্যথা লাগে তাই যেন ওর ভালো লাগছে বেশী যেমন লাগে খুব খসখসে কোন জিনিস আঁট ক'রে গায়ে জড়ালে, অথবা কোন আসবাবের খসখসে দিকটায় অথবা ঠাণ্ডার সময় কোন এবড়ো খেবড়ো আস্তর-ওঠা দেয়ালের গায়ে হাত ঘস্‌টে গেলে।

একটা কচি ডালের তেঁতো কচি বাকলাটা বসে চিবোয় কখনও কখনও আর কোথায় যেন হারিয়ে যায়। আনেৎ নিজেকে ভোলে, সময়ের হিসেব ভোলে। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হ'য়ে যায় কখনও।

হঠাৎ চমক ভাঙে। গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে লজ্জায় ভয়ে, সিল্‌ভী নিশ্চয় দেখে ফেলেছে। ও জানে সিল্‌ভী কাজ করছে না ছাই। ও মেয়ের বাঁকা চোখটা ওর খবরদারী করছে। সব ভালো ক'রে বোঝে না সিল্‌ভী। কিন্তু

ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দৌলতে এটুকু বোঝে আনেৎ-এর ভেতরের মানুষটা বোদ-পোয়ান সাপের মত বিড়ে পাকিয়ে পাতার স্তূপে আরামে ঝিমুচ্ছে। কিন্তু ওটা শুধু খোলস। ভারী অদ্ভুত দিদি···সিল্‌ভী ভাবে। মাথার স্ক্রুপ ওর ঢিলে। একেবারে দুনিয়া ছাড়া মেয়ে। স্বভাবটা ভয়ানক আবেগ-প্রবণ; যখন যা মনে লাগল প্রাণ-মন ঢেলে দিলে। ফাঁকির কারবার নেই। এ সবে অবাক হয় না সিল্‌ভী। তারপর দিদির গাম্ভীর্যের ওজনে তার অশান্ত মনের যতটুকু খবর পেয়েছে, তাতেও অবাক হয়নি ও। বাপ্‌রে কি মুখ দিদির, যেন হৃদয়-বিদারক ঘটনা ঘটেছে। আচ্ছা অমন করে কেন দিদিটা? যে জিনিস যা। তাই নিয়ে তো চলতে হবে আমাদের। তোমার আমার মাপে দুনিয়া তৈরী হয়নি। মাথায় তো হাজার জিনিস আসে। আসুক! বয়ে গেল। আসে আবার যায়। সংসারে ভালো জিনিস আছে, মন্দও আছে, কত জিনিস আমাদের ভালো লাগে আবার কত লাগেও না, সবই সমান সহজ ও স্বাভাবিক। ভালো যতখানি স্বাভাবিক, মন্দও ঠিক ততখানি। তা ভালো হোক আর না হোক আমি তো বাপু ঢক্ ক'রে গিলে ফেলি। বাস! তলিয়ে গেল। এ নিয়ে আবার অত হৈ চৈ করার কি আছে? বেচারী আনেৎ! ভারী গেরোয় পড়েছে। ঠাণ্ডা গরম যত রাজ্যের ভাবনার ডিপো হয়েছে ওর মনটা। কত ভয়, কত সংশয়, কত ইচ্ছা, আবেগ, রুচি, অরুচি। সব মিলে জট পাকিয়ে গেছে। কে খুলবে এই জট? বড্ড বাড়াবাড়ি দিদিটার। কেমন যেন অস্বাভাবিক, হেঁয়ালী মানুষটা। বিশেষ ক'রে এজন্যই দিদিকে আরো ভালো লাগে সিল্‌ভীর, এ জন্যই তার টান ও এড়াতে পারে না।

চুপ করেই আছে ওরা। অস্বস্তিকর গোপন চাপা নীরবতা ভারী হ'য়ে ওঠে। হঠাৎ কথা কয়ে ওঠে সিল্‌ভী···আজে বাজে অর্থহীন অসংলগ্ন কথা···সেলাই ঝোকা মাথাটা প্রায় ঠেকেছে এসে সেলাইএর ওপর—যেন কত মন দিয়ে দেখছে; অতি নীচু স্বরে একেবারে রেলগাড়ী চালিয়ে কি যে ব'লে চলে, কিছুই বোঝা যায় না। খালি কতগুলি ই-র মত শব্দ শোনা যায়, মনে হয় যেন কতগুলি তিতির পাখী কিচির মিচির ক'রে মনের আনন্দে নাচছে। পরক্ষণেই

মুখটা গম্ভীর হ'য়ে ওঠে। যেন অবাক হ'য়ে বলে : 'কে? আমি? আমি কিছু করিনি···' অথবা দাঁতে সুতো কাটতে কাটতে মিহি অনুনাসিক গলায় একটা বাজে গানের কলি ভাঁজতে শুরু করে ; অথবা কোন অশ্লীল গানের সব থেকে খারাপ অংশটা বেছে বেছে গাইতে আরম্ভ করে এঁচড়ে-পাকা ছেলের মত মুখ ক'রে। আনেৎ চমকে ওঠে। খানিক হেসে খানিক বিরক্ত হ'য়ে চিৎকার ক'রে ওঠে : 'আবার! থামালি ও-গান!'

গুমট্ কেটে যায়। হাতের মত কণ্ঠের স্বরে স্বরে মিলনের রাখী বাঁধা হয়। কথার অপেক্ষা থাকে না। কোথায় চলে গিয়েছিলাম আমরা···? সাবধান! সাবধান! আর চুপ ক'রে থাকা নয়—কথা, কথা—কথা কও। জানো সিল্‌ভী! জানো আনেৎ—! একটি ক্ষণিকের সামান্য ভুলে ওই নীরবতা কোথায় নিয়ে যেতে পারে তোমাদের! অতএব কথা কও। কথা···কথা···কথা কও···। আমি তোমার সঙ্গে এই যে কথা কইছি, তুমিও আমার সঙ্গে কও···ধরো আমার এই হাত, শক্ত ক'রে ধরো···

হাত ওরা ধ'রেই আছে···ধরাই থাকবে ও-হাত···শিথিল হবে না, কোনো-দিন না, যাই ঘটুক, যাই আসুক—মূলে আঘাত পড়বেনা—। আমি যা তাই, আমি আমিই। তুমিও তুমিই। এই তো হ'লো গোড়ার কথা, পরম সত্য। এই আমাদের একমাত্র পরিচয়, এই পরিচয়েই তো পরস্পরকে আমরা গ্রহণ করেছি। 'কি বলো, রাজী? সিল্‌ভী—আনেৎ! এ স্বীকৃতি নড়বে না, কেমন? যাই ঘটুক ভিতে ঘা পড়বে না, কেমন?

এই ওদের পরস্পরকে দেবার ধন, রাখী-বন্ধনের মন্ত্র। এ যেন আত্মায় আত্মায় উদ্বাহ—সর্ব বহির্বন্ধন, লিখিত দলিল, ধর্ম, আইন, নিদান-বিধান, সকল বন্ধনের শক্তিকে পেছনে ফেলে স্বমহিমায় ঊর্ধ্ব লোকে উঠে গেছে—এই আত্মার পরিণয়ের বাণী। অতএব নাই বা হ'লো সিল্‌ভী-আনেৎ এক ছাঁচে গড়া ; হলোইবা ওরা একেবারে আলাদা, নাই বা হ'লো রূপং রূপং প্রতিরূপম্। কি এলো গেলো। লোকে বলে সত্য মিলন ঘটে সহজে ; বৈপরীত্যের ক্ষেত্রেও তা সম্ভব। ওকথা ভুল, একেবারে ভুল।

মিলনের ভিত্তি বাইরে নেই, রয়েছে হৃদয়ে।

'হাতখানি ওই বাড়িয়ে দাও গো,
দাও গো আমার হাতে,
ধরব তারে ভরব তারে
রাখব তারে সাথে…'

দু'জনের কণ্ঠ এক ক'রে মিলিয়ে দিয়ে বলো কঠিন অঙ্গীকারে, বলিষ্ঠ নিষ্ঠায়। যেমন ব'লেছে সিল্‌ভী আনেৎ। এই হ'লো মিলনের মন্ত্র। 'তোমায় আমি গ্রহণ করি আমার অন্তরের একান্ত চাওয়া দিয়ে, সত্য দিয়ে। না তোমায় ফিরিয়ে দেব, না নিজেকে ফিরেয়ে নেব।…কোন দায় নেই তোমার বন্ধু। যাকে খুশি ভালোবাসতে পারো, ন্যায় অন্যায় যা খুশি করার পথ তোমার খোলা রইল [জানি অন্যায় করতে তুমি পারবে না, তবু]…। যাই তুমি করো, ওই শপথকে কিছুই স্পর্শ করবে না।—'

উপলব্ধি করতে পারো কত বড় কথা! আনেৎ-এর বিচার-শীল মন আপনাকে করুক দেখি বিশ্লেষণ, স্বীকার তাকে করতেই হবে যে আনেৎ-এর নৈতিক মূল্য কতখানি, আর ভবিষ্যতে সত্যের মর্যাদা কতখানি রাখবে সে-বিষয়ে তার সন্দেহ আছে। বুদ্ধিমতী সিল্‌ভীও যে আনেৎ সম্বন্ধে খুব নিশ্চিন্ত হ'তে পারছে তা নয়। কিন্তু অপরের ক্ষেত্রে যাই হোক এ ওদের দু'জনকে স্পর্শ করেনি। পরস্পরের ওপরে ওদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। দুনিয়া যেমনি ইচ্ছে গড়িয়ে চলুক, যে পথেই যাক্, সিল্‌ভী আনেৎ—ওরা জানে ওদের হৃদয়ের উদ্বাহ-বন্ধন শিথিল হবে না। ওদের প্রেমকে স্পর্শ করবে না। তাই আগামী দিনের যত অশুচিতা ওদের অগ্রিম ক্ষমায় নির্ভয় হ'য়ে আছে।

হয়ত নীতি-শাস্ত্র-সঙ্গত হয়নি এ ব্যবস্থা। নাই হ'লো, পরে না হয় নীতি-শাস্ত্রের বিধান মত চলা যাবে।

আনেৎ-এর কিছু কিছু সংস্কার রয়েছে। কারণ ও জীবনকে দেখেছে বইয়ের পাতায়। আসল জীবন-সত্যকে ও আবিষ্কার করেছে পরে [অর্থাৎ, বইয়ের পাতার বাইরের জীবন একটু অন্য সুরে বাজে।]

কবি শিলারের চমৎকার একটি কবিতা মনে প'ড়ে যায় : ও গো মানুষ, এ পৃথিবী মিথ্যায় ভরা, এর অণুতে অণুতে হিংসা, আর অসূয়া। আত্ম-কেন্দ্রিক

মানুষ শুধু নিজেকে ভালোবাসে। অলীক সুখের আশায় যে বন্ধন সে আশার মতই অলীক ভঙ্গুর…খেয়ালের বাঁধন খেয়ালেই খোলে। একমাত্র সত্য প্রকৃতি, তার মধ্যে ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। যে নোঙ্গরে প্রকৃতি বাঁধা, তার বিকার নেই, ক্ষয়নেই। ঝড় উঠ্‌লে তরঙ্গ সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নড়ে না ওই নোঙ্গর।…মন দোসর চায়। সেই চাওয়ার পথে আসবে মিত্র। ব্যক্তিগত প্রভাবে সাথী পাবে; কিন্তু ভাগ্যবান সেই যে-পেয়েছে সহোদর। এই সংগ্রাম-সংকুল, প্রবঞ্চনা-ভরা সংসারে সেই তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে।…

সিল্‌ভী কি এসব কবিতা পড়েছে? নিশ্চয়ই না। ও এসবের ধার ধারে না। হয়ত ভাবে: সোজা মনের সহজ মিথ্যে কতগুলো কথার জাল বোনা কেন? আনেৎ-এর হাত [illegible] না। ওর নীচু মাথা, দৃঢ় স্তম্ভের মত গ্রীবা, মাথা-ভরা একরাশ কোঁ[illegible] চুলের দিকে তাকিয়ে সিল্‌ভী ভাবে: এখনও স্বপ্নে ডুব দিয়ে আছে দিদিটা। আবার বোকামী করছে। কি আছে, ওর বোকামীর ঝুলিতে? কি ভাগ্যিস এসে পড়েছি, দেখতে পাব কি আছে ওই ঝুলিতে…।

নিজের বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতার গুমর আছে সিল্‌ভীর। মনে মনে ভাবে দিদির খবরদারী করতে হবে। হয়তো ওর নিজেরই খবরদারীর বেশী দরকার, কারণ বোকামী ও নিজেও কম করে না। তবে একা থাকলে তো কত কি করা যায়। এক জনের দায়িত্ব থাকলে কি আর খুশি মত চলা যায়।

ওদিকে মাথা নীচু ক'রে ভাবছে আনেৎ! সিল্‌ভী যা ভাবছে, তাই। ভাবছে পাগ্‌লীটা! একেবারে ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। একটু দেখাশোনা দরকার। সিল্‌ভীকে না জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ভবিষ্যৎ নিয়ে ও সুন্দর একটা পরিকল্পনা ছকে ফেলে, সিল্‌ভীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয় না।

পরস্পরের সুখের কথাই ভাবছে ওরা [অবশ্য নিজেরটাও ভাবছে না তা নয়, ওটা তো হাতের পাঁচ আছেই]…।

'যাঃ, সূচ ভেঙে গেল…দেখাও যাচ্ছে না আর…' কাজ ছুড়ে ফেলে বাইরে

আসে ওরা ।। শ্রান্ত পা ছড়িয়ে বাঁচে। একটা ওভারকোট দুজনে গায়ে জড়িয়ে বৃষ্টির মধ্যে বাগানে বেরিয়ে পড়ে। মাথার ওপর গাছের পাতা থেকে জল ঝরছে ; দ্রাক্ষাকুঞ্জ থেকে এক থোকা আঙুর তুলে নিলে—বৃষ্টিতে ভিজে চমৎকার হয়েছে আঙুরগুলো···বৃষ্টির ধারার মতই ঝরছে ওদের কথার ধারা···। হঠাৎ চুপ হ'যে যায়···[গণ্ডুষ ভরে পান করে নীরবতা] হেমন্তের ভিজে বাতাস ···খসে-পড়া পাকাফল আর ঝরা পাতার সবুজে মাতাল···বেলা না যেতেই ঝিমিযে পড়েছে শ্রান্ত আলো···অক্টোবরের পরিণত ম্লান আলো···। গন্ধে মাতাল বাতাস আর ঐ মুমূর্ষু আলো···সুপ্ত বনানী আর মূর্ছিত প্রান্তরের মৌন-শ্রী , জল-ধারা-পতন-ছন্দ আর পিয়াসী ধরার সেই অঝোর ধারাকে নিঃশেষে শুষে নেবার ব্যাকুলতা, নেমে-আসা রাত্রির কালো রূপ···ওরা পান করে সর্ব সত্তা দিয়ে···দেহ দিয়ে···চিত্ত দিয়ে···থর্ থর্ ক'রে শিহরায় প্রকৃতি···অনাগত বসন্তের স্বপ্নে বিভোরা প্রকৃতির বুকে রোমাঞ্চ ঘনায়···জ্বলে ওঠে ভয়ঙ্কর সুন্দর দীপ্ত আশার শিখা···। রোমাঞ্চিত প্রকৃতির সঙ্গে সিল্‌ভী-আনেৎও দেখে অনাগত দিনের স্বপ্ন···রহস্যঘন অনাগত দিন।

[দুই]

অক্টোবর মাস। ভারী সুন্দর কুহেলী ছাওয়া হেমন্তের দিন। মাকড়সার জালের মত কুয়াষা বায়ুমণ্ডল বিছিয়ে থাকে। আনেৎ সিল্‌ভী কেউ কাউকে চোখের আড়াল করতে পারে না। এখন ভেবেই পায় না, এত দিন ওরা ছিল কি ক'রে।

কিন্তু ছিল তো। সিল্‌ভী আনেৎকে ছাড়াই ছিল। আনেৎ-এর দিনও সিল্‌ভীকে ছাড়াই কেটেছে। এবং ভবিষ্যতেও কাটবে। একজনকে যতই গভীর ক'রে, প্রাণ মন সঁপে ভালোবাসুক, বিশ বছরের দুরন্ত যৌবনে জীবন ঘরের কোণে বাঁধা থাকতে চায় না। বিশেষ ক'রে আনেৎ-সিল্‌ভী যে ডানা-মেলা পাখী। ওদের যে খোলা আকাশ চাই। সুতরাং হৃদয় বাঁধা থাকলেও ডানার আকুতি তা ছাপিয়ে ওঠে।

পরস্পরকে ওরা একান্ত ক'রে চায়। কিন্তু এই চাওয়ার বাড়া তাগিদও

আছে—স্বাতন্ত্র্যের তাগিদ যা ওদের সত্তার মর্ম-মূলের তাগিদ। সব রকমে অমিল থাকলেও এইখানে ওদের দু'জনের স্বভাবের ভারী মিল, [এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়] দুজনেই ওরা স্বাধীন থাকতে চায়। মুখে কিছু না বললেও পারস্পরিক আকর্ষণের এও একটা হেতু। এরই মধ্যে ওরা আপনাকে দেখতে পায়। কিন্তু তাহ'লে তোমরা যে মিলে মিশে একাত্ম হ'য়ে যাবে ভেবেছিলে তার কি হ'লো ? আনেৎ স্বপ্ন দেখেছিল বুক দিয়ে ঘিরে রাখবে সিল্‌ভীকে। সিল্‌ভীও দেখে'ছিল। দুজনেই জানে এ ব্যবস্থা ভালো লাগবে না দু'জনের কারো। এ নিছক একটা স্বপ্ন ; নেড়ে চেড়ে খেলা করার জিনিস। যতক্ষণ চলে খেলা চলুক না।

ও খেলা চলে না বেশী দিন। শুধু স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন হ'লে আর গোলমাল হওয়ার কথা নয়। কিন্তু অত্যুৎসাহে ওরা ক্ষুদে রিপাবলিক রাষ্ট্রগু'লির মত জুলুম করতে আরম্ভ করল পরস্পরের ওপব। দু'জনেই ভাবে তাব কথাই বেশী ঠিক এবং সেটা অপর পক্ষের ওপর চাপাবাব চেষ্টা চলে। আত্ম-সমালোচনা করতে পাবে আনেৎ। বোনকে আয়ত্বে আনতে না পাবলে সে নিজেকে তিরস্কার করে, এবং আবার গোড়া থেকে সুরু করে তার কাজ। আনেৎ জেদী আবেগ-প্রবণ। এবং ঠিক ইচ্ছে ক'রে না হলেও কিছুটা কর্ত্তৃত্ব-প্রিয়। তবু স্বীকার করতেই হবে সিল্‌ভীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে ও চেষ্টা করে, কিন্তু ও মেয়ে কঠিন। আনেৎ পথ পায় না। অসম্ভব খাম খেয়ালী সিলভী ; যা মনে আসে করে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চব্বিশ রকম খেয়াল ওঠে মাথায়। ওর সঙ্গে পা ফেলে চলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আনেৎ গোছান মেয়ে ; তার সব কাজের মধ্যে একটা সুষ্ঠু শৃঙ্খলা আছে। সিল্‌ভীর পাগলামোতে প্রথমে ও হাসে। কিন্তু শেস পর্যন্ত ধৈর্য থাকে না। আনেৎ ওকে নাম দিয়েছে 'তুফানী', শ্রীমতী 'কি চাই' ; এমনি আরো অনেক। পাল্টা সিল্‌ভী ওকে ডাকে : 'গোমড়া-মুখী' ব'লে।

দু'জনে দু'জনকে গভীর ভালোবাসলেও একই ধারার জীবন যাত্রায় দিনের দিনের পর দিন খাপ খাইয়ে চলা ভারী কঠিন হ'য়ে উঠল। ওদের রুচি এক নয়, অভ্যাস এক নয়। নেহাৎ স্নেহের খাতিরেই আনেৎ সিল্‌ভীর অমার্জিত

ভাষা প্রশ্রয়ের চোখে দেখে। আনেৎ-এর রসের ভাণ্ডার। সিল্‌ভীর সঙ্গে সেই রস ভাগ ক'রে নিতে চায়। কিন্তু পড়া শুনলেই আঁৎকে ওঠে সিল্‌ভী। আনেৎ পড়তে পড়তে গদগদ হ'য়ে ওঠে : 'কি চমৎকার, দেখ সিল্‌ভী!' বই দেখলেই ওর গায়ে কাঁটা দেয়, তবু মুখখানা আগ্রহে চক্‌ চকে ক'রে রাখতে হয়। জীবন, মৃত্যু, সমাজ এমনি যত রাজ্যের বাজে জিনিস নিয়ে বকে যায় আনেৎ। সিল্‌ভী মনে মনে বলে : 'বাবারে বাবা! জ্বালিয়ে খেলে…টুট্‌ল টু… উ…উ…। মেলাই সময় আছে কিনা হাতে তাই দুহাতে চটকাতে পারেন।' কখনও ওকে জিজ্ঞাসা করে আনেৎ . 'তুই কি ভাবছিস এ বিষয়ে বলতো!'

মনে মনে ওর মুণ্ডপাত করে সে কিন্তু ভালোবাসে তাই বলতে হয় 'আমি একমত তোমার সঙ্গে।'

এমনি দিন চলে। এতে ওদের সম্পর্কে কোন বাধা আসে না। কিন্তু মন খুলে কথা আর জমে না।

নিরালা বনের প্রান্তে মস্ত বড় নিরালা বাড়ী। সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে ফালি ফালি মাঠ ছড়িয়ে আছে। নুয়ে-পড়া হেমন্তের ধূসর আকাশ কুহেলির মধ্যে মাটির সঙ্গে এক হ'য়ে মিশে আছে। এই শূন্যতার মধ্যে দিন গুলো যেন ঝুলে থাকে। গ্রাম ভালোবাসে বলেই এতদিন সিল্‌ভী বিশ্বাস ক'রে এসেছে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে দ্রষ্টব্য যা কিছু দেখা হ'য়ে গেল, বেড়াবার জায়গা-গুলোয় বেড়ান হ'য়ে গেল। আর কোন কাজ নেই। হাঁপিয়ে ওঠে সিল্‌ভী। কেমন যেন বেখাপ্পা লাগে। ও যেন নিজকে খুঁজে পায় না।…প্রকৃতি… প্রকৃতি…শুধু জংলী প্রকৃতি…। শোন তাহ'লে সত্যি কথা বলি…অসহ্য লাগে সিল্‌ভীর এই প্রকৃতির রাজ্য। গেঁয়ো ভূতের আড্ডা…। বিশ্রী এখানকার আবহাওয়া। সারাদিন খালি বৃষ্টি আর বাতাস আর কাদা [পাত্রীর কাদা]…

শীতের নোটিস্‌ এসেছে। মাকড়সার দল ঘরের মধ্যে আস্তানা পেতেছে। আর মশা! কি বিচ্ছিরি জীব, মা গোঃ। ওর হাত আর পায়ের গোড়ালীর ওপর তারা 'মোচ্ছবের' ভোজ বসিয়েছে। এত বিশ্রী লাগে সিল্‌ভীর। কান্না পায়। কিন্তু আদরের বোনকে পাশে নিয়ে প্রকৃতির এই বিপুল উন্মুক্তির মধ্যে অবগাহন করতে ভারী ভালো লাগছে আনেৎ-এর। ওর কোন কিছুতেই

বিরক্ত লাগে না ; কিছুতেই ক্লান্তি আসে না। মশা কামড়ালেও খিল খিল ক'রে হাসে। কর্দমাক্ত রাস্তায় ও সিল্‌ভীকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে ছুটোছুটি করে। রেগে যাচ্ছে সিল্‌ভী ? ওঃ বয়ে গেল। ও তাকিয়েও দেখে না। বাতাস উঠলে আর বৃষ্টি পড়লে পাগল হ'য়ে ওঠে আনেৎ। তখন কোথায় থাকে সিল্‌ভী ! লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুট্‌ল চষা মাঠের ওপর দিয়ে আর বন বাদাড় ভেঙে। ভেজা গাছের ডাল গুলো নড়ে ওঠে ওর ধাক্কা খেয়ে। অনেক ক্ষণ পরে হয় তো মনে প'ড়ে যায় : ওঃ সিল্‌ভী তো পেছনে পড়ে আছে ! সিল্‌ভী ততক্ষণ রাগে গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে ভাবছে : 'কবে যে ফিরে যাব !' ফোলা মুখটা সকরুণ হ'য়ে ওঠে ওর।

নিজের পেশাটা ভারী ভালো লাগে সিল্‌ভীর। সত্যি ভালো লাগে। আরো অনেক জিনিস ওর ভলো লাগে, আরো অনেক জিনিস ও চায়। আজ এটা চায়, কাল ওটা চায়। কিন্তু ঐ এক জাযগায ওর কোনও বদল হয়নি। নিজের কাজটা ওর বরাবর ভালো লেগে এসেছে। এবং এই গ্রামের হাওযায় সেই ভালো লাগা আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

পারীর খেটে-খাওয়া ঘরের রক্ত আছে ওর দেহে। কাজ না হ'লে ও থাকতে পারবে কেন ? কাজ ওর ভয়ানক দরকার। ছুঁচ সুতো ওর আঙুলকেও ব্যস্ত রাখে, ওর চিন্তাকেও ঘিরে রাখে। সেলাই-প্রীতি ওর মজ্জাগত। ঘন্টার পর ঘন্টা ও কাটিয়ে দিতে পারে সেলাই ক'রে, এক টুকরো সিল্ক বা মসলিনকে ভাজ ক'রে, কুঁচি দিয়ে, রিবনের ফুলটাকে আরেকটু ঠিকঠাক করতে রীতিমত দৈহিক আনন্দ অনুভব করে ও। আনেৎ-এর প্রকাণ্ড মাথাটায় বড় বড় সব আইডিয়া আছে জানে সিল্‌ভী। কিন্তু এও জানে ওর নিজস্ব এলাকায় অর্থাৎ শিফন-সিল্ক-ক্রেপের রাজ্যে ওর নিজের ছোট মাথাও কম খেলে না। এ গুমর নয় সিল্‌ভীর ; ও কি ছেড়ে দেবে এই সৃষ্টির ক্ষেত্র ? লোকে বলে ভালো পোষাক পরে মেয়েদের সব চেয়ে বড় আনন্দ, কিন্তু যে মেয়ের এদিকে প্রতিভা আছে নতুন নতুন রূপ দিয়ে পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী ক'রে সে যে আনন্দ পায় তার তুলনা নেই। এ আনন্দের স্বাদ যে একবার পেয়েছে চিরকাল সে এর পেছনে ছুটবেই। কিছু করতে না দিয়ে

গভীর আলস্যের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে দিদি সিল্‌ভীকে। আনেৎ-এর চঞ্চল অঙ্গুলি পিয়ানোর চাবির ওপর নেচে ফেরে···সিল্‌ভীর প্রবাসী মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে পেছনে-ফেলে-আসা বড় বড় কাঁচির আর সেলাইএর কলের অশ্রান্ত কলরব শোনার জন্য। মস্তক-হীন কাঠের সেই 'ডামি'টা—সামনে মাটিতে উবু হয়ে ব'সে যেমন খুশি তাকে সাজাও পরাও, ঘোরাও আর ফেরাও, ইচ্ছেমত চড়-চাপড় মারো, আছ্‌ড়ে ফেলো মাটিতে, আবার মালিক সামনে না থাকলে ওটাকে কোলে নিয়ে নেচেও নাও খানিক। প্রাণহীন কাঠের পুতুল···কিন্তু কি রোমাঞ্চ ওই নিষ্প্রাণ আধারে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প সম্ভার হাতে পেলেও এ আনন্দ মিলবে না। এ সুখের তুলনা নেই। দু'চারটি কথায় ধরা প'ড়ে যায় সিল্‌ভীর চিন্তার স্রোত কোন ধারায় বইছে। ওর জলে-ওঠা চোখের দিকে চেয়ে, অধীর আনেৎ বোঝে, আবার দোকানে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে সিল্‌ভী। সুতরাং প্যারীতে ফিরে সিল্‌ভী ব'লে বসল যে সে তার পুরানো বাড়ীতে পুরানো কাজে ফিরে যাবে আবার। আনেৎ-এর বুক ভেঙ্গে কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, কিন্তু অবাক হলোনা ও। সিল্‌ভী আশঙ্কা করেছিল দু'হাত তুলে আনেৎ পথ আগলে দাঁড়াবে—কিন্তু তার বদলে একটি মাত্র নীরব দীর্ঘশ্বাস ·ওর বুকটা দুলে উঠল। আনেৎ ব'সে ছিল। ছুটে গিয়ে সিল্‌ভী হাঁটু গেড়ে ওর সামনে বসল। দুই হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে মুখটা তুলে ধরল ওর দিকে 'আনেৎ রাগ করিসনে ভাই।'

'বোনটি তুই সুখী হলেই আমার হ'লো, তুই তো জানিস্‌।' কিন্তু বুকের মধ্যে ওর কেবলই মোচড় দেয়। সিল্‌ভীর বুকেও ঝড় বয়।

'আমার কি দোষ,' সিল্‌ভী মাথা দুলিয়ে প্রতিবাদের সুরে বলে 'আমি সত্যি বলছি দিদি, আমি তোকে খুব ভালোবাসি।'

'আমি জানিরে জানি—' আনেৎ বলে। ওর মুখে হাসি, কিন্তু আবার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সিল্‌ভী তখনও অমনি ক'রে ব'সে, আনেৎ-এর মুখটা ওর দুই হাতের মধ্যে নিয়ে কাছে টেনে এনে বলে

'খবরদার বলছি দিদি, অমন ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলবিনে··। দুষ্টু মেয়ে কোথাকার। অমন করলে আমি যাবো কি করে! মায়া-দয়াহীন জানোয়ার বুঝি আমি একটা!'

'না রে না, জানোয়ার কেন হ'তে যাবি তুই!...আমারি অন্যায়। আচ্ছা যা আর করব না। কিন্তু তোর দোষ তো দিইনি আমি। এতদিন পরে তবে ছাড়াছাড়ি, কষ্ট হয় না বুঝি!'

'ছাড়াছাড়ি...। আচ্ছা মানুষ তো তুই! দেখ দিকিন্। কে, বল্লে ছাড়াছাড়ি, দুষ্টু মেয়ে! রোজ আমাদের দেখা হবে। তুই যাবি, আমি আসব। হ্যাঁ, আমার ঘর খানি যেন থাকে মশায়! ভাবছিলে তো এই বেলা ওটাতে হাত বুলোবে, তাই না! সেটি হচ্ছে না। ঘরটি আমার, আমি ছাড়ছিনে বুঝেছ! যখন ভারী ক্লান্ত লাগবে, মনটা ছুটি চাইবে, চ'লে আসব এখানে তোর আদর খেতে। আমার কাছে চাবি আছে জানিস তো। বিনা এত্তালায় হঠাৎ অসময়ে এসে হাজির হব এক একদিন, চমকে দেব তোকে...। সাবধান বাপু চালাকি টালাকি করোনা, তাহলে মজা টের পাবে। না রে না, ছাড়াছাড়ি হবে না...দেখিস্ বাঁধন আরো কষবে। আমি যে তোকে ছেড়ে যেতে চাইব দিদি, তোকে ছেড়ে আমার চলবে কি ক'রে!'

'শয়তান,' হাসতে হাসতে আনেৎ বলে: 'আমায় ছেলে ভোলাচ্ছেন। কি সাংঘাতিক মিথ্যেবাদী রে তুই!'

'আনেৎ,' সিল্ভী চেঁচিয়ে ওঠে: 'গাল দিবিনে বলে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা বাবা, সাংঘাতিক নয়, শুধু মিথ্যেবাদী, হলো!'

'মঞ্জুর।' সিল্ভী ভারিক্কী চালে বলে। তারপর জড়িয়ে ধ'রে চুমোয় চুমোয় অস্থির ক'রে দেয় ওকে। 'মিথ্যে কথা বলছি! তোর কাছে! আজ খেয়েই ফেলব তোকে।'

দুষ্টু মেয়েটা ক্ষমা কাড়বার বহু পথ জানে। স্বাধীন ভাবে নিজস্ব দোকান খুলতে চায় সিল্ভী। আনেৎ যেন সাহায্য করে একটু। বিশ বছরের এই শিশুটি আর আঁচল ধরে থাকবে না; নিজের পায়ে দাঁড়াবে—অন্যের হুকুম বরদারী আর করবে না, এবারে ও নিজে হুকুম করবে। হয়ত ওই 'ডামিটা' পর্যন্তই দৌড়। এতদিন পরে বোনকে একটু টাকা দেবার পথ পেয়ে আনেৎ-এর আনন্দ আর ধরে না। তারপর দুইজনে বসে পরিকল্পনা করতে। আলোচনা, জল্পনা-কল্পনা আর শেষ হয় না। পরের দিন গেল জায়গা খোঁজা, আসবাব পত্র

এবং অন্যান্য জিনিস কেনা কাটায় তারপর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বন্দোবস্ত করায়। সন্ধ্যের সময় ব'সে খদ্দেরের তালিকা করে, হাজার রকম প্ল্যান করে। শেষ পর্যন্ত ওর মনে হয় দোকানটা আনেৎই করছে, সিল্‌ভী অংশীদার মাত্র। মনে থাকে না ওদের জীবন আবার ভিন্ন খাতে বইবে, তার পরোয়ানা এসে গেছে।

[তিন]

সিল্‌ভীর দোকানে খদ্দের ধরে না। আনেৎ আজকাল ওর তৈরী পোষাক ছাড়া পরে না। সকলের কাছে সিল্‌ভীর সেলাই-এর শত মুখে প্রশংসা করে। ওর পরিচিত বন্ধু বান্ধব প্রায় সকলেই আজ কাল সিল্‌ভীর দোকানের গ্রাহক। ও নিজেও ওর পুরানো মালিকের খদ্দের ভাঙিয়ে আনছে ডাইনে বাঁয়ে। অনেকের ঠিকানা ও জানতো। পসার বেড়ে চলছে সিল্‌ভীর, কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়ে হিসেব ক'রে পা ফেলে। রয়ে সয়েই চলুক না কাজ। জীবনটা অনেক লম্বা—বেশ সময় পাওয়া যাবে। দুনিয়ায় এক জাত মানুষ আছে—সারাক্ষণ তাদের কাজ। মানুষ না ব'লে পিপড়ে বলা যায় ওদের। সিল্‌ভী কাজ ভালোবাসে কিন্তু এদের মত কাজ পাগল নয়। কত দেখেছে ও, বিশেষ ক'রে মেয়েগুলো কাজ করতে করতে জোয়াল কাঁধে ক'রে মরে। কাজ না হ'লে চলে না ঠিকই, কিন্তু স্ফূর্তি করার সময়ও চাই। সবই চাই একটু একটু। ওর পেটুকের ক্ষুধা নয়, ওর মিহি ক্ষুধায় রসাল জিনিসের জোগান চাই, চাই চমক-লাগানো জিনিসের জোগান।

অল্প দিনের মধ্যে এত কাজ বেড়ে গেল যে আনেৎ-এর জন্যও এতটুকু ফুরসুৎ মেলে না সিল্‌ভীর। কোনো রকমে সে দিদির ভাগটুকু যক্ষের মত আগ্‌লে রাখে। কিন্তু আনেৎ-এর 'নাল্লে সুখম্', অংশ নিয়ে তার তৃপ্তি নেই। ও গোটার কারবারী। আধখানা দিতেও জানে না, নিতেও জানে না। ভালোবাসার কেন্দ্রেও যে মানুষ ছোট ব্যবসায়ীর মত খুচ্‌রোর কারবারী, এ সত্যটা ওর জানতে দেরী হ'ল। মেনে নিতে দেরী হ'ল আরো। প্রথম পাঠের পড়া ওর তখনও শেষ হয়নি।

সিল্‌ভীর জীবন থেকে আনেৎ ক্রমশঃ ঝ'রে পড়ছে। ব্যথায় ওর বুক টন্‌টন্‌ করে। বিনা নালিশে, নিঃশব্দে ও বহন করে ব্যথা। বাড়ীতে দোকানে কোথাও একটি মুহূর্তের জন্য সিল্‌ভীকে একা পাওয়া যায় না। ওর আবার একজন বন্ধু জুটেছে। আনেৎ অসহায়। বাস্তবকে মাথা পেতে গ্রহণ করে। আগে হ'লে হিংসে হ'ত, রাগ হ'ত। কিন্তু আজ আর রাগ হিংসে কিছুই হয় না। আজ আছে শুধু স্নেহ। বর্ম হয়ে তাকে ঘিরে আছে স্নেহ। কিন্তু তবু ব্যথা বাজে। এ ব্যথা থেকে রক্ষা করবে ওকে কোন রক্ষা কবচ? সিল্‌ভী হাওয়ায় গা ভাসিয়ে বেড়ায়, কিন্তু দিদিকে সে সত্যি ভালোবাসে। ভালো-বাসা দিয়েই বুঝতে পারে, আনেৎ কতখানি কষ্ট পাচ্ছে। কাজ আর স্ফূর্তির ঘূর্ণী-স্রোতে ভেসে যেতে যেতে মাঝে মাঝে নিজেকে ছিনিয়ে আনে। কাজ প'ড়ে থাকে, কথা প'ড়ে থাকে, কখনও বা বন্ধুর সঙ্গে কথা থামিয়ে ছুটে আসে আনেৎ-এর কাছে। আদরের আপ্যায়নের ঝড় ওঠে। কি যে করবে ঠিক পায় না ওরা। উচ্ছ্বসিত স্নেহে সিল্‌ভীও যেন থৈ থৈ করে। কিন্তু উচ্ছ্বাস শান্ত হ'য়ে আসে। ও ফিরে আসে ওর কাজে খেলায় আনেৎ-ময় হ'যে। কিন্তু গৃহকোণে ব'সে আনেৎ। হাসি, আদর, আলিঙ্গনে, অন্তরঙ্গতায় তার কয়েকটি মুহূর্ত পূর্ণ হ'যে উঠেছিল। কৃতজ্ঞতায় ওর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। কিন্তু আগের থেকে আরো বেশী একা মনে হয় ওর।

নানাদিকে আগ্রহের অভাব ছিল না আনেৎ-এর। দিনগুলোও সিল্‌ভীর মতই কানায় কানায় ভরাট থাকত। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর কিছুদিন ওর স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় ছেদ পড়েছিল। পড়াশোনাও করেনি, সামাজিক জীবন থেকেও নিজেকে গুটিয়ে এনেছিল। কিন্তু এখন আবাব আগের ধারায় ফিরে এসেছে। এতদিন ওর হৃদয়ের দাবী অন্তরের দাবীকে আড়াল ক'রে রেখেছিল। আজ সে-আড়াল আর নেই। অন্তর তার পূর্ণ অধিকারে জেগে উঠেছে। সিল্‌ভী নেই—চব্বিশ ঘন্টার জীবনে মস্ত বড় ফাঁকা অবসর। তা ছাড়া ওর ঐশ্বর্যশালী মন আবেগ-জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিণতি পেয়েছে। বিজ্ঞান-চর্চায় ডুব দিলে আবার। অবাক হ'য়ে গেল, দৃষ্টিতে যেন স্বচ্ছতর আলো লেগেছে। পড়ল বায়োলজি নিয়ে; জীবের সৌন্দর্য-বোধের

গোড়ার কথা, তার বিকাশ আর প্রকাশের ইতিহাস নিয়ে থীসিস্ লিখবে ঠিক করল।

সামাজিক জীবনের খেইটিও আবার হাতে তুলে নিল আনেৎ। বাবার সঙ্গে যে দুনিয়ায় ও ছিল, আবার নেমে এল তার মাটিতে। এবার আর এক জলুষ তার ; নূতন আনন্দ নূতন কৌতূহলের! আগের চাইতে আরো বেশী বিচার-শীল মন নিয়ে চেনা মানুষকে ও নূতন ক'রে দেখল। তাদের চরিত্রের এমন নূতন নূতন দিক চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল যা এতদিন ওর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এছাড়াও রইল খুশি হওয়া আর খুশি করার খুশি। আরো কত রকম খুশি—প্রকাশ্য আর গোপন। আর আছে মানুষ ; কত রকম সম্পর্ক মানুষে মানুষে—কোন্ এক রহস্যময় শক্তির টানে গ'ড়ে ওঠে [আবার দূরেও ঠেলে] মন ভোলান কথার আড়ালে ; তার সহজাত স্বচ্ছ বুদ্ধির কত লীলা—যা ড্রইং-রুমের উত্তেজনাহীন বায়ু মণ্ডলেও ক্ষণে ক্ষণে হানা দিয়ে যায় ; আবার কত ভাব তার দৃষ্টির আড়ালে শুধু বুকের তলায় কাঁপে···

চব্বিশ ঘণ্টার একটা ছোট ভগ্নাংশ মাত্র ও রাখলে ওর সামাজিক লেন দেনের জন্য। বাকী সময়টা রইল সম্পূর্ণ নিজের—সেখানে ওর পড়া আর নানা কাজের ভিড়। কিন্তু চিন্তার ভিড় জমে কর্মহীন অবসরে···রাত্রির কালো-ঘেরা মহা-সমুদ্রের গভীর হ'তে জোয়ারের টানে ভেসে আসে অজস্র শুক্তি, শংখ, প্রবাল আর নানা রকম জৈব পদার্থ···নুড়ি···নুড়ি···আর উপলখণ্ড ···[তারা ভাটার টানে ছড়িয়ে প'ড়ে থাকে বালু সৈকতে।] সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ আসরে আর রাত্রির সুদীর্ঘ বাসরে তন্দ্রা এসে দোল দিয়ে দিয়ে মন খানিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় চেতনার তটে···তখন আনেৎ তার জীবনের মহা-বিষুবের সীমায় বসে দেখে চিত্ত-সাগরের জোয়ার ভাটার লীলা আর তটের বুকে সেই জোয়ারে টানা নানা বস্তুর ভিড়।

যে ঢেউ ওর মনকে দোল দিয়ে ফিরে যায়, তারা ওর অচেনা নয়, নয় নূতন। আজ তাদের টান বেড়েছে দশগুণ—আপনাকে তারা জানান দিয়ে যায়। মনও জেগে উঠে চোখ মেলে আর কান পাতে, স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে দেখে উঠ্তি ঢেউয়ের নৃত্য, শোনে তাদের কল্লোল—নেয় চিনে ; ওর সারা সত্তা নন্দিত

হয়। তাদের বিপরীত মুখী গতি-ধারায় আর স্ববিরোধী ছন্দে ওর হৃদয় হয় মাতাল···নেশায় যেন মাথা ঘোরে। এই এলোমেলো ছন্দ-ঝড়ের তলাকার সুর সঙ্গতিটুকু খুঁজে পায়না আনেৎ। যৌন-আবেগ গ্রীষ্মের আঁধির মত ওর অন্তর্লোককে একেবারে ওলট্ পালট্ তচ্‌নচ্ ক'রে চিরকালের জন্য সেখানে একটা অরাজকতা ঘটিয়ে গেছে। তুলিওর স্মৃতি ফিকে হ'য়ে এসেছে বটে—কিন্তু সেই যে সেদিন চিত্তের ভারকেন্দ্র স্থান ভ্রষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল···তাকে ঠিক করতে বহু সময় লেগেছিল। বর্তমানের এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি—বৈচিত্র-হীন, ঘটনা-হীন, দিনের পর দিন এক ভাবে এক লয়ে বয়ে-যাওয়া-জীবন আনেৎ-এর সামনে মায়া রচনা করে। ও ভাবতে চায় কিছু হয়নি, কোথাও কোন ছন্দ-পতন ঘটেনি ; জীবন-কাব্যের পাতায় যে আকস্মিকের আখর পড়েছিল তা বুঝি ভুল, স্বপ্ন তা। ইতালীর কোমল রজনীর পরিবেশে প্রহরীর অলস কণ্ঠের বিকার-হীন 'সব ঠিক হ্যায়'-এর মত হয়তো চিরকাল আনেৎও বলতে পারে : 'সব ঠিক হ্যায়'। কিন্তু নিদাঘ-রাত্রির বুকের তলায় লালিত হচ্ছে নূতন নূতন ঝড় ; অস্থির বাতাস অশান্ত আবর্তে উঠ্‌ছে কেঁপে কেঁপে ; শাশ্বত কালের বিশৃঙ্খলা পেতেছে আসন। আনেৎ-এর আলোড়িত, বিপর্যস্ত আত্মার মুখোমুখী হ'য়ে 'রণং দেহি' বলে দাঁড়িয়েছে অনন্ত কালের যত মৃত আত্মারা। তারা আজ উজ্জীবিত হ'য়েছে। এদিকে পিতৃ-সূত্রে পাওয়া যত বাসনা-কামনা-প্রবৃত্তির দল এতদিন নিঃসাড়ে ঘুমিয়েছিল, আজ তারা অকস্মাৎ ফুলে কেঁপে উত্তাল তরঙ্গের মত উর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হ'তে লাগল। বিপরীত-ধর্মী নানা টানের গ্রন্থি এল কষে। মন সগর্বে হেঁকে বলে—চলবে না শুচিতা হারানো তোমার, আনেৎ! চমৎকার একটা নৈতিক আত্ম-প্রসাদের সুর ওঠে বেজে। কিন্তু চাই স্বাতন্ত্র্যও। সিল্‌ভীর সাহচর্যে আনেৎ প্রত্যক্ষ করেছে এই তীব্র স্বাতন্ত্র্য-বোধের বিড়ম্বনা। আনেৎ জানছে, বুঝ্‌ছে, স্পষ্ট দেখছে [এবং দেখে উদ্বিগ্ন হচ্ছে] যে ওর এই স্বাতন্ত্র্য-বিলাস একদিন ওর প্রেমের ক্ষেত্রে অনর্থ ঘটাবে। সেদিন দুঃখের আর পার থাকবে না। সুদীর্ঘ হিম-ঋতুর প্রশস্ত অবসর এই অন্তর্দ্বন্দ্বের হিল্লোলে দোলায়িত হ'য়ে রইল। ওর অন্তরাত্মা গুটি পোকার মত একটা আবছা আলোর গুটিকার মধ্যে শুয়ে শুয়ে ভাবী দিনের স্বপ্ন দেখে, আর নিজের স্বপ্নগুলি নিয়ে খেলা করে···

হঠাৎ যেন নিজের অতলে ডুবে যায় আনেৎ। সেখানে চলে ওর অসংজ্ঞান মনের খেলা। এমনি হ'ত গত বছর শরৎ কালে বারগাণ্ডিতে যখন ছিল। মনের এ একরকম শূন্য অবস্থা যার মধ্যে মানুষ ডুবে যায়…মানুষকে ডুবিয়ে দেওয়া শূন্য? না না শূন্য অবস্থা নয় ও। তবে কি? মনের ঐ গভীর স্তরে তবে কি আছে? অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে সেখানে, সেইবার গরমের সময় প্রেমে পড়তে গিয়ে যে বিড়ম্বনা হ'ল, তখন থেকে। এর আগে কখনও কিছু দেখা যায়নি; হয়ত দশ মাস আগে ওরকম কিছু ছিলই না। তখনই আরম্ভ হয় ব্যাপারটা; এখন আরও ঘন ঘন হয়। আনেৎ-এর কেমন যেন, রাতেও কখনও কখনও অমনি হয় গভীর ঘুমের মধ্যে—যেন অজ্ঞান মনের দ্বার খুলে যায় তখন। সংবেশনিক অবস্থার যে ঘুম অনেকটা তারি মত। ঘুম ভাঙ্গলে আর কিছু মনে থাকে না, শুধু আবছা মনে হয়, অনেক দূর কোথা থেকে যেন ফিরে এল, বড় বড় গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়ে বড় বড় বিচিত্র সব জগৎ পেরিয়ে; কত কি অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস সেখানে যা বর্ণনা করা যায় না; বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না; কতকটা পশুর মত, কতকটা অতিমানবীয় সব মূর্তি— দেখলে গ্রীক দানবের কথা মনে পড়ে, গির্জার বৃষ্টির জলের পাইপের মুখগুলি অনেক সময় পশুর মুখের মত ক'রে তৈরী হয়, কতকটা সে রকম। মন থেকে যেতে চায় না অনুভূতিটা। নিরাকার কাদা যেন আঙ্গুলে লেগে থাকে! চেতনার জগতে এসেও স্বপ্নের দুনিয়ার সঙ্গে বন্ধন কিছুতেই টুট্‌তে চায় না। অসংজ্ঞেয় নূতন এই জটিলতার ভারে, লজ্জায়, দুঃখে যেন মরে যায় আনেৎ। দেহের ত্বকে যেন একটা অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ লেগে থাকে দিনের পর দিন। কিন্তু ঘুমন্ত সরোবর যেন আনেৎ…আলোড়িত চিত্তের ঢেউ লাগে না ওর মসৃণ কপালে…স্থির শান্ত জলের বুক; যুক্ত হাত দুখানি এলিয়ে আছে কোলে; নির্লক্ষ্য, আনমনা চোখের দৃষ্টি বাইরে কোথাও নেই…এই রুদ্ধ দ্বারের আড়ালে প্রতিদিনকার অজস্র চলতি ছবির ভিড়ের মধ্যেও বুকের তলায় ঐ অনুভূতিটি অহরহ জেগে আছে গোপন কথার মত।

ওর প্রতি মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এই স্বপ্ন…রাজপথের জনস্রোতে, লাইব্রেরীর আর ক্লাশ-রুমের শান্ত গম্ভীর পরিবেশে, ফ্লার্ট আর হাসি-ছলনা

মেশান ড্রইংরুমের মামুলী আলাপনের মধ্যেও। সান্ধ্য আসরে অনেকেরই চোখে পড়ে আনেৎ-এর এই ভাবান্তর…চঞ্চল চাহনি…উদ্‌ভ্রান্তভাবে আপন মনে হাসি,…কখনও আশ-পাশের কথা দুএকটা কানে যায় কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার ও হারিয়ে যায় দূর দিগন্তে, কে জানে চিন্তাকাশে ডানা-মেলা কোন্ পাখীর গানের টানে।

ঐ পাখীর দল গানের ঝংকারে ঝংকারে এমনি মুখর ক'রে রাখে ওকে যে ওর খেয়াল থাকে না। একদিন ধরা প'ড়ে গেল নিজের কাছেই। সিল্‌ভী এসেছে—স্বভাবসিদ্ধ তার অজস্র হাসি কলরব আর কথায় আনেৎ-এর কানে তালা লাগে…সিল্‌ভী বল্‌ছিল ওকে…হ্যাঁ, কি বল্‌ছিল!…বুঝেছে সিল্‌ভী দিদি কিছু শোনেনি…বুঝেছে তাই হাসছে…এবং হাসতে হাসতে ওকে ঝাঁকানি দিযে বলে 'ও দিদি ঘুমুচ্ছিস্ তুই!

'যাঃ বাজে বকিসনে।' প্রতিবাদ করে আনেৎ।

'নয় তো কি? আমি বুঝি আর দেখতে পাচ্ছি না!—ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার মত দাঁড়িযে দাঁড়িযে বেশ ঘুমুচ্ছিস আর স্বপ্ন দেখছিস। রাত্তিরে কি করিস্ বলত! ঘুমোস্ না বুঝি!'

'দূর লক্ষ্মীছাড়া! নিজের চরকায় তেল দে। নিজে কি করেন শুনি তো!'

'আমি! আচ্ছা শোন্। দেখিস হাঁই তুলবিনে।'

এতক্ষণে আনেৎ-এর সম্পূর্ণ সম্বিৎ ফিরে এসেছে। চেঁচিযে ওঠে 'আরে না! না!' দু'হাতে সিল্‌ভীর মুখ চেপে ধরে।

সিল্‌ভী জোর ক'রে ছাড়িয়ে নেয়। তারপর ওর মাথাটা দুই হাতের মধ্যে নিয়ে সোজা ওর চোখের দিকে চায়।

'নিশিতে পেয়েছে নাকি রে, দিদি! এযে নিশিতে-পাওয়া চোখ! কি আছে রে তোর সুন্দর চোখ দুটোর মধ্যে? বল্ দেখি আমায়। কি স্বপ্ন দেখেছিস ভাই, বল্। বলতেই হবে আমায়।'

'কি বলব আবার!'

'কি ভাবছ তাই শুনতে চাই।'

আনেৎ প্রতিবাদ করে কিন্তু অন্য দিনকার মত আজও শেষ-পযন্ত হাল

ছেড়ে দিতে হয়। পরস্পরের কাছে মন খুলে দিয়ে ওরা পরম আনন্দ পায়। আত্মপ্রসাদও আছে। কোন কথা ওদের মধ্যে গোপন নেই। অতএব আনেৎ বস্‌ল চাবি হাতে মনের মণি-কোঠার দ্বার খুলতে ; সিল্‌ভীর জন্য যত না হোক্ স্বস্তি পাবে নিজে। যত উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তা···রকম বেরকমের সরল, উদার, কোমল, কঠিন, উদ্ভট, উদ্‌ভ্রান্ত, দুঃসাহসী···কখনও আবার একটু কুণ্ঠার সঙ্গে গম্ভীর ভাবে ব'লে চলে আনেৎ। ওর গুরু গম্ভীর ধরনে সিল্‌ভী হেসে ওঠে : 'থামরে দিদি, থাম্ এবার—' যেন লজ্জা পেয়েছে এমনি মুখে বলে : 'একবার আরম্ভ হ'লে আর রক্ষে নেই!'

সিল্‌ভীর ভেতরটাও এমননিই বিচিত্র, এমনি অদ্ভুত [আমাদের সকলের মতই, কমও নয়, বেশীও নয়]। কিন্তু জানা ছিল না তা ; খেয়ালও ছিল না ওদিকে। রীতিমত হিসেবী মেয়ে। ও স্থূলের কারবারী—অর্থাৎ যা ও দেখে, ছোঁয়, নাড়ে-চাড়ে—এক কথায় যা স্থূল ও অনুভব-গ্রাহ্য তাই নিয়ে ওর কারবার। অতএব যা কিছু এই কারবারের হাটে ভাঙন ধরাতে পারে, অবাস্তব আর অসম্ভব ব'লে ও দুহাতে তা সরিয়ে রাখে।

বোনের কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ে ও। এতও আছে আনেৎ-এর মধ্যে? কে জানতো! ওর স্বাভাবিক সরলতায় অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে সাংঘাতিক সব কাহিনী ব'লে যায়। অথচ এই মেয়েই নিতান্ত তুচ্ছ কারণে ভয়ে কাঁপে। সবাই জানে এ। কে জানে বাবা ওর মগজে কি আছে। সিল্‌ভী শ্রদ্ধা ক'রে আনেৎকে। কিন্তু ওর মনে হয়, কেমন যেন জটিল ও। ওর সব অদ্ভুত ভাবে জট পাকিয়ে আছে। দুনিয়াটাকে সহজ ভাবে নে! না, তাই নিয়ে ও মাথা কুটে মরে।

আনেৎ বলে : 'তাহ'লে যে এক সঙ্গে অনেক রকম সুর বেরোয় রে!'

'সেই তো মজা! যেন মেলার হাট!' সোল্লাসে বলে সিল্‌ভী।

'ওরে বাবা!' দু'হাতে কান বন্ধ করে আনেৎ।

'কেন আমার তো খুব ভালো লাগে। দিব্যি গোটা কয়েক গ্যালারী ভর্তি মানুষ হেঁড়ে গলায় আকাশ ফাটিয়ে চ্যাচাচ্ছে···ট্রামের হর্ণ, বাঁশী, অর্গান্, হুইস্‌ল্, নাক-ডাকা, হাঁচি, কাশি···সব এক সঙ্গে। একটার ঘাড়ে আর একটা।

নিজের মনের কথা নিজের কানে শুনতে পাবে না, এমনি তালা ধ'রবে কানে। কি মজা ভাব তো ?

'ইতর কোথাকার।' আনেৎ বলে।

'আচ্ছা গো ভদ্রলোক, আচ্ছা। কিন্তু আমার তো মনে হয় ইতর তুমিই বেশী। দেখতো আমার কেমন সব ছিমছাম্। কোথাও কিচ্ছু গোলমাল নেই। যেটি যেখানকার সেটি ঠিক সেখানে। সব খরগোস খাঁচায় পোরা। ভদ্রলোক হতে চাও তো আমার পথে এস বাছাধন।'

সত্য কথাই ব'লেছে সিল্‌ভী। যত গোলমালই থাকুক, পরিস্থিতি যত জটিলই হোক, চোখের নিমেষে, অতি সহজে ও সামলে নেয়। দেহ মনের দাবী গুলোকে খাপ খাইয়ে সামঞ্জস্য ক'রে চলার কৌশল ও জানে। সুন্দর ক'রে খোপে খোপে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে এক একটি আলাদা আলাদা ক'রে।

আনেৎ বলে ওর বাবার চতুর্দশ লুইয়ের আমলের নমুনার দেরাজটাকে দেখিয়ে 'ওই ওটার মত তুই।'

'ঠিক বলেছিস। সত্যি মিল আছে।' সিলভী বলে।

মিল বলতে, দেরাজের সঙ্গে মিলের কথা বলেনি ও।

'সত্যি সত্যি ঐ মিলটাই আমার আসল পরিচয়—'

আনেৎকে একটু ক্ষ্যাপাতে চায়···কিন্তু আর ক্ষেপবে না আনেৎ। সিল্‌ভীর ওপরে ওর আর হিংসে নেই। বাবার কাছে ও ওর নিজের অংশ পুরোপুরি পেয়েছে। তার ভারই সামলায় কে! মাঝে মাঝে উৎপাতের জ্বালায় মনে হয়—ছাড়তে পারলে যেন বাঁচে।

[চার]

আনেৎ-এর সুসমঞ্জস মনখানির ভার-সাম্য গতবছর কেমন ক'রে জানি হারিয়ে গেল। বলিষ্ঠ পা দুখানি শক্ত হ'য়ে বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিল, তাও টলে গেল। কেমন ক'রে হারানো-শক্তি ফিরে পাওয়া যায়, অবাক হ'য়ে ও তার পথ খোঁজে। ছোট্ট পায়ে ছোট্ট জুতো প'রে খট্ খট্ ক'রে কেমন

নির্ভয়ে, বিনা দ্বিধায় নিশ্চিত কদম ফেলে মাটির বুকে চলে সিল্‌ভী। ওই জুতো-জোড়া যদি পেত আনেৎ! কেমন যেন ওর মনে হয়, প্রত্যহের পৃথিবী ও তার মানুষের সঙ্গে বাঁধন যেন ওর আল্গা হ'য়ে গেছে। সূর্যের আলো গলে গলে পড়ছে বাইরের পৃথিবীর বুকে, সেখানে থেকে স'রে এসে আপনার ভেতরকার মানুষটাকে নিযে ঘর বেঁধেছে আনেৎ। ঐ নিয়ে ও মশগুল হ'য়ে আছে। টের পায় না ওর বিপদ ঘনিযে আসছে। বুঝতে পারে না ওর রক্তে নাচন লেগেছে, বুভুক্ষু দেহটা অলক্ষ্যে ফাঁদ পেতেছে ওর সামনে। স্বপ্ন-দেখা চোখ ওর, ফাঁদে পড়তে দেরী হবে না। ঐ দশাই হয় ভাবুকদের, ওরাই বেশী সহজে ফাঁদে পড়ে এবং বেশী বেসামাল হয।

কিন্তু ওর মত তেজী বুনো ঘোড়াকে ও-ফাঁদ কতক্ষণ বেঁধে রাখবে?...

আনেৎ হুঁশিযার হ'যে রইল। কিন্তু অজান্তে, ফাঁদটার চারদিকেই ও ঘুরতে লাগল এবং ক্রমেই ওটার কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। অবশ্য বুঝতে পারেনি, নইলে বিদ্রোহ করত।

এই তো সেদিনও, অন্ততঃ বাহ্যতঃ পুরুষের ব্যবহার ছিল শান্ত-স্থির বন্ধুত্বের, সহজ সদয, হযতো খানিকটা চটুলও কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাগ্রহ। পুরুষকে ও ভয করেনি, তার কাছে চাযনি কিছু। সেই আনেৎ। আজ ওর চোখে আরেক রং লেগেছে।

কিসের অনুসন্ধিৎসা আর সোদ্বেগ প্রতীক্ষা ওর দৃষ্টিতে! জুলিওর সঙ্গে সেই ব্যাপাবের পর থেকে ওর স্বাভাবিক সুচিক্কণ, উদ্ধত স্থৈর্যখানি হারিয়ে গেছে।

আনেৎ বোঝে এখন পুরুষের সাহচর্য চায় ও! বাল্যে বিবাহের বিরুদ্ধে ওর জোরাল প্রতিবাদ শুনে বাবা হাসতেন, আজ বাবার সেই হাসিখানি ওর ওষ্ঠে। প্রেম ওর দেহের মাংসে যেন হুল ফুটিযে গেছে—ও জানে ওর সরল অথচ জীবন্ত, ওর পরিশুচি, সংস্কার-নিরুদ্ধ মন কি চায। বাসনাগুলোকে ও চিত্তের আধো-আঁধার সীমান্তে ঠেলে দিতে চেষ্টা করে কিন্তু বিদ্রোহী হয়ে তারা অন্তর-রাজ্যে বিপ্লব ঘটায। বানচাল হয সেখানকার শাসন-যন্ত্র, বিকল হয় চিন্তা আর ক্রিয়ার শক্তি। কোন বিসযে মন বসাতে হ'লে

অমানুষিক সংগ্রাম করতে হয়। পরিশ্রমের ফলে পরক্ষণেই আসে অবসাদ, তিক্ততায় মন হয় ভারাক্রান্ত। কিন্তু তবু মন থাকে এলোমেলো। সমস্ত ভাবনা ছায় কালো মেঘে। এতদিন আদর্শের যে স্থির, স্বচ্ছ দীপ্যমান নক্ষত্রটি জ্বলছিল ওর সুমার্জিত চিত্তের দিগন্তে, কুয়াশার জালে তা ঢাকা পড়ে। এই নক্ষত্র-জ্বলা-দিগন্তাভিমুখী ঋজু পথটিও আজ পদে পদে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়···

মুষড়ে পড়ে আনেৎ, ভাবে: 'আর হ'লোনা···হ'লোনা··· পথের শেষ আর হ'লোনা···' নারীকে এতদিন পুরুষের মত সর্ব মানস-শক্তির অধিকারিনী ভেবেছিল আনেৎ। আজ নিজের কাছেই মাথা হেঁট হয়ে যায়—জানে ভুল, ভুল, ভুল করেছে এতদিন।

ওর মনে হয় সত্যিকার বিজ্ঞান আর শিল্প-সাধনায় যে নৈর্ব্যক্তিক, নিরাসক্ত এবং বস্তু-সংসক্ত চিন্তাধারার প্রয়োজন, বহুকাল মেয়েরা তাতে অনভ্যস্ত ব'লে তাদের মস্তিষ্ক দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। হয়তো ঠিক তাও নয়। প্রকৃতির দক্ষিণ হস্তের অবারিত দানে নারী যে ঐশ্বর্যময়ী, মহতী সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারিনী হয়েছে, নীরবে তা কেঁদে মরে সুষ্ঠু বিকাশের পথ না পেয়ে। তাই হয়ত নারী তার মস্তিষ্কের শক্তি হারিয়েছে। আনেৎ মর্মে মর্মে অনুভব করে একক সে খণ্ডিত, দেহে মনে হৃদয়ে সে অসম্পূর্ণ। দেহ আর হৃদয়ের কথা তত ভাবে না আনেৎ। মনের প্রশ্নই ওর প্রধান।

জীবনের যে মহাক্ষণে আনেৎ এসেছে—সেখানে দোসর-বিহীন একক জীবন দুর্বহ। পুরুষের চাইতে নারীর পক্ষে আরো—কারণ, সে তো শুধু নয় প্রিয়া—সে যে প্রেম-প্রবুদ্ধা জননীও। এখনও একথা ওর হৃদয়ঙ্গম হয়নি। মনের এ দুটি ধারা এক হ'য়ে মিশে আছে ওর মধ্যে। কোনটাই স্পষ্ট হ'যে ওঠেনি। তাই কোনও বিশিষ্ট পুরুষের হাতে আত্মনিবেদনের জন্য ওর প্রাণ উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। সে-পুরুষ হবে এক দিকে ওর চাইতে শক্তিমান, আর এক দিকে দুর্বল; যে আপন সবল বক্ষে ওকে আশ্রয় দেবে আবার ওরই বক্ষের পীযুষ-ধারা পান করবে। এ কথা ভাবতেই কি এক কোমল আবেশে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায় ও। আঃ ওর দেহে যত শোণিত আছে—সব যদি আজ দুধ

হ'য়ে উঠত···নিঃশেষে ধমনী শূন্য ক'রে ও সেই পীযূষ-ধারা ঢেলে দিত প্রিয় কণ্ঠে···বলতো···নও···নও···নও আমার প্রিয়তম প্রিয়···

সব দেবে আনেৎ! না না, সব দিতে পারবে না···কোথায় সে-অধিকার! সব দেবে! সব!···হাঁ সব···দেবে বৈকি···দেবে বক্ষের পীযূষ-ধারা, দেবে দেহের শোণিত, দেবে দেহ, দেবে প্রেম···। তারপর? সব দেবে বললে যে? তোমার আত্মা? তোমার স্বাতন্ত্র্য? তোমার সমস্ত জীবন? না, কখনও তা পারবে না আনেৎ। ইচ্ছে থাকলেও পারবে না। যা আমার নয় তা আমি কেমন ক'রে দেব? আমার স্বাধীন আত্মা—সে তো আমার নয়···আমি তার। তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার শুধু আমার। এবং সে-অধিকার পালন করা আমার পবিত্র কর্তব্য···আমার ধর্ম···

ওর এই মনোভাবের মধ্যে ওর মায়ের কঠিন সংস্কার অনেকখানি ছিল। কিন্তু ওর মধ্যে সব কিছুরই একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যায়। ওর বেগ আর আবেগবান্ প্রকৃতির ধর্মে নিতান্ত অবাস্তব কল্পনাও প্রাণে উজ্জীবিত হ'য়ে ওঠে।···আত্মা···আত্মা···প্রোটেষ্টেন্টদের ভাষা···[ও নিজেই তো বলছে···এ কথাটা নিজে তো প্রায়ই ব্যবহার করে]···রাওল রিভিয়ে-দুহিতার আত্মা কি মাত্র একটি! না অনেক, অগণিত আত্মা আছে রিভিয়ে-দুহিতার। এই বহুর মধ্যে তিন চারটি আছে যা আকারে, প্রকারে, বিশিষ্ট কিন্তু পরস্পর থেকে একেবারে পৃথক্, পরস্পরের ভাষা বোঝে না কেউ।

তবু ওর এই আভ্যন্তরীন সংগ্রাম ওর মনের এমন একটা স্তরে চলতে লাগল যার পরিচয় ও নিজেই ভাল ক'রে জানে না। বিরোধী প্রবৃত্তিগুলিকে যাচাই ক'রে দেখার অবকাশ এখনও ওর হয়নি। বিরোধিতা তারা তীব্র ভাবেই করে, কিন্তু এখনও তা মানসিক খেলার পর্যায়ে আছে। সেদিক থেকে আপাততঃ কোনও ভয় নেই। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রশ্ন এখনও নেই। সুতরাং এখন ব'সে মনে মনে সমস্যা গুলোকে নিয়ে নাড়া-চাড়া ক'রে বিলাস চলতে পারে।

হৃদয়-ঘটিত এই সব সমস্যা নিয়ে সিল্ভী আর আনেৎ হাসতে হাসতে আলোচনা করে। করতে ভালো লাগে যৌবনের ধর্মে। অনাগতের প্রতীক্ষায়

তরুণ প্রাণ ব'সে ব'সে যখন দিন গনে তখন এমনি ক'রে অলস অবসর সরস হ'য়ে ওঠে। তারপর হঠাৎ একদিন বাস্তব এসে তার সর্ব ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত ক'রে ভাগ্য-নির্ণয় ক'রে দিয়ে যায়। আনেৎ-এর দুই অভাবই বোঝে সিল্‌ভী এবং ওর দিক থেকে এ দু'এর মধ্যে কোনও বিরোধ খুঁজে পায় না ও, ওর পথে চললেই তো সব মীমাংসা হ'যে যায়। যতক্ষণ খুশি ভালোবাসো, ভালো না লাগে ঝেড়ে ফেলে চ'লে এসো···

আনেৎ মাথা নাড়ে: 'না, তা হয় না।'

'কেন হয় না তাই শুনি?'

আনেৎ জবাব দেয় না।

সিল্‌ভী সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে: 'আমার বেলাও তোর ঐ বিধান নাকি, দিদি?'

'না রে, তুই তুই-ই, তা জেনে মেনেই তোকে ভালোবাসি।'

বড় ভুল বলেনি সিল্‌ভী। স্নেহে আনেৎ [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অবশ্য] সিল্‌ভীর বহু-প্রেমকে বিচার পর্যন্ত করে না। কিন্তু তাই ব'লে নিজের ক্ষেত্রে ও নীতি নয়। মায়ের কাছে পাওয়া সংস্কারের বশেই যে বহু-প্রেম ওর নীতি-বিরুদ্ধ তা নয়। ওর প্রকৃতির অখণ্ড আকাঙ্ক্ষার বিশালতায় ও আপনাকে টুকরো টুকরো করতে পারে না। বলিষ্ঠ যৌন-জীবনের অস্পষ্ট আকৃতি অনুভূতিতে জেগে থাকা সত্বেও প্রেমের ক্ষেত্রে ও নিষ্ঠার পূজারী। সমগ্র সত্তা, সর্ব অনুভূতি, হৃদ-মনো-বাক্য, আত্ম-মর্যাদা, শ্রদ্ধা এবং অচঞ্চল গভীর হৃদয়ের ঐকান্তিকী নিষ্ঠায় মিলে যে প্রেম রচিত হয়নি সে-প্রেম আনেৎ-এর গ্রাহ্য নয়। হৃদয় না দিয়ে শুধু দেহ দেওয়া? না না, হয় না ··হ'তে পারে না। এ বিশ্বাস-ঘাতকতা। অতএব আনেৎ···একমাত্র পথ···বিবাহ···এক-নিষ্ঠা। আনেৎ-এর মত মেয়ে পারবে এ পথ স্বীকার করতে?

পারুক আর না পারুক, কল্পনায় দোষ কি? লোকসান নেই কোন। অতএব আপনাকে বঞ্চিত করে না আনেৎ, প্রাণ ভ'রে স্বপ্ন দেখে। বয়ঃ-সন্ধির বনানী-সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে ও···অপরূপ, অপূর্ব চরম-ক্ষণ···কল্পনার ঘন-ছায়া দোলে মাথার ওপর···দৃষ্টির সম্মুখে উদ্বারিত অসংখ্য সূর্য-করোজ্জ্বল শুভ্র, ঋজু,

দীর্ঘ পথ, কোন্ পথে পড়বে তোমার পদচিহ্ন? তাড়া কি? দেখে শুনে নাও, তারপর বেছে নিও। অলস পুলকে মন দেখে…দেখে… দেখে…বাছবার কি আছে? সবই পথ…সব পথেই চলব। দ্বার খুলে বাইরে আসে তরুণী কিশোরী …ভারহীন, নির্ভাবনার আনন্দোচ্ছল জীবন, বুকে ভালোবাসা, বাহুতে আশা … সম্মুখে সাজান বিশাল জীবনের বর্ণালী, তার অজস্র অর্ঘ্য। কোনটা চাই আপনাকে শুধাবার আগেই দু'হাত বাড়িয়ে সবগুলোই এক সঙ্গে তুলে নেয়, নিশ্বাস ভ'রে সুবাস গ্রহণ করে। কল্পনায় এক এক ক'রে প্রতিটি পরখ ক'রে দেখে …এক একটির সঙ্গে আপনার ভবিষ্যতের গাঁটছড়া বাঁধে তারপর ফেলে দেয় ছুঁড়ে উচ্ছিষ্ট। হাতে তুলে নেয় আর একটি …একটু খেয়ে চেখে দেখে, না হ'লোনা…আবার প্রথমটা তুলে নেয়, তারপর আর একটি…মনঃস্থির হয় না, মীমাংসা হয় না…। অনিশ্চয়তেরই বয়স এ, প্রথম দিনগুলো কাটে আনন্দে উল্লাসে, কিন্তু অবসাদ আসে দু'দিন না যেতে। গভীর অবসাদ! আত্মাকে যেন নিপিষ্ট ক'রে দেয়। নৈরাশ্যে সংশয়ও এসে মনকে দুলিয়ে দিয়ে যায়।

আনেৎ তার ভাবী জীবনের ছবি আঁকে। অনিশ্চিত অনাগতের। শুধু সিলভীর কাছে খুলে ধরে ওর এই অনিশ্চিত প্রতীক্ষার জীবন। সিলভী ভাবে, কেন দিদি মন ঠিক করতে পারে না? এসব বোঝে না ও, কারণ নির্বাচনের আগেই সিদ্ধান্ত ওর স্থির হ'য়ে যায় [আনেৎকে বিদ্রূপ করার জন্য পর ক'রে বলে এ-কথা]। প্রথমে মন তো ঠিক ক'রে নাও ঝট্ ক'রে, তারপর বেছে নেবার ঢের সময় পাওয়া যাবে। ভাবিকী চালে বলে 'অন্ততঃ নিজের মনটা কি চায় তা জানতে পারবে।'

[পাঁচ

নিজের সমাজে আনেৎ-এর বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে। তরুণের দল ওর চারদিকেই ভিড় করে, তরুণীদের মধ্যে অনেকেরই চেহারা ওর থেকে ভালো। তারা এ ব্যাপারটাকে ভালো মনে নিতে পারলে না। আরো কারণ আছে ওদের রাগের। আনেৎ কারো মন যোগাবার, মন ভোলাবার চেষ্টা করে না,

গুমর ক'রে দূরে দূরে থাকে। অর্থচ ছেলে গুলো ওর পেছন পেছন ঘোরে। ড্রইংরুমের এক কোনে চুপ ক'রে বসে থাকে। স্তাবকেরা আসে, ও তাদের বাধাও দেয় না, লক্ষ্যও করে না। হাসি-মুখে ওদের কথা শোনে [—শোনে কি না, ওর স্তাবকদের সন্দেহ আছে।] জবাব যখন দেয়, নেহাৎ সাধারণ ভদ্র মিঠে কথায়। তবু ওরা আসে—সংসারী, বুদ্ধিমান সম্ভ্রান্ত বংশের তরুণের দল—ওর মন ভোলাবার চেষ্টা করে।

হিংসুটেরা ভাবে আনেৎ গভীর জলের মাছ। ঔদাসীন্যের চার দিয়েই ও বড়শী ফেলে পাকা অভ্যাস-পটু হাতে। মাছ-খেলাবার কৌশল ওর ভালোরকম আয়ত্ত করা। ওরা বলাবলি করে মেয়েটার বেশে বাসে নাকি ভোল-বদলের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে কিছুদিন থেকে। আগে সেখানে কেবল মাত্র নিখুঁত ভাবে নির্ভুল হওয়া বা নির্ভুল ভাবে নিখুঁত হওয়াই ছিল একমাত্র লক্ষ্য, এখন সেখানে বেশ আড়ম্বড় দেখা যাচ্ছে, সযত্ন প্রসাধনের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমা দেখা যাচ্ছে। চেহারার আটপৌরে ভাবটাকে, একটু ঝালিয়ে নেবার জন্যই যে ওর এ সাধনা, এ নাকি আর ব'লে দিতে হয় না। নিন্দুকেরা বলে টানটা ওর রূপের নয়, রূপোর। কিন্তু সত্যকথা বলতে, রূপের টান হ'লেও, রূপ খুলবার মসলাটি সিলভীর পাকা হাতের আর পাকা রুচির। শিকার হিসেবে আনেৎ বড় শিকার সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রদ্ধার শিকার। ওকে শ্রদ্ধা করে যারা অর্থ না থাকলেও তারা ওকে এর চাইতে কম শ্রদ্ধা করত না, বরঞ্চ মাথা উঁচিয়ে নিঃসংকোচে ক'রতে পারত।

আসলে আকর্ষণের মূল আরো গভীরে। আনেৎ কোকেট্ নয়; কিন্তু রয়েছে ওর ঐশ্বর্যময়ী প্রখর সহজ প্রবৃত্তিগুলি। মানুষের ইচ্ছার কোনও স্থান নেই তাদের ক্রিয়ায়। আপন ধর্মে তারা কাজ করে বিনা ইঙ্গিতে। আনেৎ ব'সে ব'সে অলস হাসি হাসে; দেখে মনে হয় ডুব দিয়েছে ও নিজের গভীরে। কিন্তু কি একটা আবছা ভাবনার উজান স্রোতে ঢেউয়ের আগে গা এলিয়ে সুখে ভাসছে ও। এদিকের সব শুনছে দেখছে আনেৎ। একটা প্রবল আকর্ষণী শক্তি বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে ওর চোখ, মুখ থেকে, তরুণ দেহের বলিষ্ঠ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হ'তে, ফুলন্ত হ্রাইসিন গাছের মত অনুরাগ সম্পৃক্ত ওর সর্ব-সত্তা

হ'তে। এত প্রবল সেই শক্তি যে ওর দিকে তাকিয়ে কে বলবে [এক নারী ছাড়া] যে ওই সাধারণী আনেৎ। ওর মুখের তুচ্ছ একটি কথায় মনের রাজ্যে তোলপাড় হয়। ওর আত্মার সন্ধানী, আর ওর সুপ্ত দেহের [সুপ্ত জল] ঐশ্বর্যকে চিনেছে যে লোভীর দল সকলের কাছেই পৌঁছোয় ওর আবেদন।

দেখে মনে হয় না ও কিছু দেখছে। কিন্তু কিছুই ওর দৃষ্টি এড়ায় না। মেয়েদের বিশেষ ক্ষমতা এটা। এই ক্ষমতার ওপরেও ছিল আনেৎ-এর অত্যন্ত তীব্র সহজ জ্ঞান। বলিষ্ঠ প্রাণ-শক্তি-সম্পন্ন যারা তাদের মধ্যে প্রায়ই এরকম প্রখর সহজ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়...বিনা কথায়, বিনা ইশারায় যার দৌলতে একজনের হৃদয়ের ভাষা আর একজনের প্রাণে এসে পৌঁছয়। সেই ভাষা ও কান পেতে শোনে, বাইরে থেকে আনমনা আনেৎ।...হৃদয়ের গহন অরণ্যে শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছে ওরা...আনেৎ আর তার চার পাশের স্তাবকের দল।...পথ হারিয়ে দূরে ছিট্‌কে পড়ে ওরা পরস্পরের কাছ থেকে। তারপর একদিন আনেৎ খুঁজে পায় তার মনের মানুষকে।

রাওল রিভিয়ে যে ধনী, বিদগ্ধ, প্রগতি-বাদী বুর্জোয়া-সমাজের মানুষ ছিলেন, আনেৎ-এর বরণ-তিলক তাদেরই একজনের কপালে পড়ল।

ড্রিফ্রাস আন্দোলন নানা মতবাদের, নানা চিন্তাধারার মানুষকে টেনে এনেছিল। সামাজিক ন্যায়ের প্রতি আবহমান কাল থেকে মানুষের সহজাত সমর্থন আছে। সেই সমর্থনকে ভিত্তি ক'রে আজও মানুষ তাদের যোগ-সূত্র খুঁজে পায়। কিন্তু পরবর্তী কালে এই সহজ ঔদার্য্য বেশীদিন ধোপে টেকেনি। সংকীর্ণ হ'তে হ'তে সামাজিক ন্যায়ের আরোপ একটি মাত্র সামাজিক অন্যায়ের ক্ষেত্রে এসে ঠেকেছিল। হাজারো নজিরের মধ্যে রাওল রিভিয়ে একজন। সংসারের নিত্যকার নিষ্ঠুরতম অবিচারেও তার ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি কোনদিন। ইওরোপীয় শান্তির সুযোগে ষড়যন্ত্র ক'রে আরমেনিয়ায় অত বড় একটা হত্যাকাণ্ড নির্বিকার চিত্তে ঘটালেন তুর্কীর সুলতান। মুনাফার লোভে বিবেককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তার সঙ্গে ব্যবসা করেছিলেন রাওল রিভিয়ে। অথচ এই মানুষই মনে প্রাণে ডুবেছিলেন ড্রিফাস আন্দোলনে। মানুষের কাছে বেশী প্রত্যাশা করার হেতু নেই। একবার যদি সে অন্যায়ের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলে থাকে, যথেষ্ট। আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ওরা নিজেরাও কৃতজ্ঞ রাওল রিভিয়ের সমাজের মানুষেরা ভাবেন একদিন ড্রিফাস আন্দোলনে যোগ দিয়ে যে যোগ্যতা তাঁরা অর্জন করছিলেন, আজও তা অক্ষয় হয়ে আছে। নূতন কাজের মধ্য দিয়ে আর তা বাড়াবার কোনও প্রয়োজন নেই। প্রগতির নেতৃত্ব চিরকালের জন্য ওদের হাতে বাঁধা।

সুতরাং অনেকটা নিশ্চিন্ত ওরা। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে আভ্যন্তরীন কলহে জাতীয়-বিদ্বেষ চাপা পড়া, পুরানো ইংরেজ-বিদ্বেষকে বুয়ার-যুদ্ধ খানিকটা জীইয়ে রেখেছে শুধু। স্বদেশ-প্রীতি আছে ওদের, কিন্তু সে জঙ্গী স্বদেশিকতা নয়, নেহাৎ জোলো ধিকে। ঘরে খাবার ভাবনা নেই, তাই ওদের দিল দরিয়া, মেজাজ শরীফ। দেখে মনে হয় নেহাৎ ভালোসী মানুষ ওরা। এদের নীতির প্রাঙ্গন প্রশস্ত হয় ' কিছু কিছু সমাজ-সবা করে, কিন্তু আসলে সুযোগান্বেষী। গাল-ভরা মতবাদ-বাদের আড়ম্বর নেই, কড়া রকম সংস্কারও নেই। ওদের দলে আছে নানান ধরণের লোক — উদার-নৈতিক ক্যাথলিক, প্রোটেষ্ট্যান্ট, য়িহুদী আছেন ঝাঁকে ঝাঁকে, মধ্য-বিত্তের দল যারা ধর্ম ছেড়ে হরেক রকম লেবেল-আঁটা রাজনীতির চর্চা করেন অথচ ছাড়েননি গণতন্ত্রের ভোল, যে গণতন্ত্র ত্রিশ বছর টিঁকে থেকে এখন দাঁড়িয়েছে রক্ষণশীল নীতির সব থেকে বড় খোলস। সমাজ-তান্ত্রিকরাও বাদ পড়েননি, কিন্তু এ দলে তাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন শুধু জোরেস শিষ্য ধনী, বুদ্ধি-বিলাসী, তরুণ বুর্জোয়াদের দল। এখনও ফরাসী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মধু-চন্দ্রিকার পালা শেষ হয়নি জোরের।

রাজনীতিতে তেমন আগ্রহ আনেৎ-এর কখনও ছিল না। সদা-ক্রিয়াশীল মানস-জগৎটাকে নিয়েই ও ব্যস্ত, রাজ-নীতি চর্চার সময় ছিল না। কিন্তু ড্রিফাস আন্দোলনের সময় অন্যদের মত ওরও দিন কেটেছে তীব্র উত্তেজনার মধ্যে। পিতার প্রতি ওর গাঢ় নিষ্ঠা, কাজেই মনটা হয়ে উঠেছে তাঁরই ছায়া। কিন্তু ওর বুকে আগুন, রক্তে মুক্তির নেশা, তাই নিপীড়িত মানুষের পাশে ও ঠাঁই খুঁজেছে। সুতরাং জোলা ও পিকার্টকে যেদিন শেকল-ছেঁড়া-জানোয়ার রূপী জনমতের সম্মুখীন হ'তে হ'ল, ও উত্তেজিত হয়েছে, ব্যথা পেয়েছে।

এবং 'শের্শে-মিদি' জেল-খানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার উঁচু পাঁচিলের অন্ধকারে বন্দী হতভাগ্যের জন্য অনেক তরুণীদের মত ওরও দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছে। কিন্তু এসব শুধু আবেগের ক্রিয়া, যুক্তির ফল নয়। ড্রেফাস আন্দোলনকে কখনই বিশ্লেষণ ক'রে দেখেনি ও। সে ধৈর্য ওর নেই। অনেক সময় রাজনীতি বুঝতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু মন বসেনি। বিরক্ত হ'য়ে উঠে প'ড়েছে। রাজনীতি কেন যে ওর ভালো লাগে না তা খুঁজে দেখেনি। একটা হয়তো হবে—দক্ষিণ বাম কোন দলেরই সংকীর্ণতা আর দুর্নীতির তো অন্ত নেই। কেবল সোজা দিক থেকে সাদা আলোয় যে দেখবে তার চোখে তো পড়বেই এসব। মনটা বিকল হ'তে চায়। কিন্তু হৃদয় আর একটু উদার, বিশ্বাস করতে চায়, বড় বড় ন্যায়ের বুলি কপচাচ্ছে যারা, তারা খারাপ মানুষ নিশ্চয়ই নন। ও মানুষগুলোকেও ভালো ক'রে দেখেনি, তাদের কাজ কর্মও নয়, বুঝবার ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই ওর। বরঞ্চ রাগ করে নিজের ওপরেই। ধৈর্য ধ'রে প্রতীক্ষা করে সহানুভূতি নিয়ে, বড় ওস্তাদের গান শুনে ভক্তের দল যেমন না বুঝেই তাড়াতাড়ি তুলে জয় জয়কার করে—মনে মনে ভাবে আজ না বুঝুক, একদিন বুঝবেই গানের গুণ।

হৃদয়ের নিষ্ঠায় আনেৎ দলের লেবেল গুলোকেই ভাবে মস্ত বড়, জানে না আইডিয়ার বাজারেই জুচ্চোরীর কারবার সব থেকে বেশী, সুতরাং 'ইজ্‌ম্' গুলোর ওপরে [যদিও সেগুলো শুধু নানা দলের মার্কা] ওর এখনও বিশ্বাস আছে। এবং যারা আগু বাড়িয়ে 'ইজ্‌ম্' নিয়ে বেশী হাঁক ডাক করে তাদের চটক ওর চোখে ধরে। আশাও হয় এদের মধ্যেই ওর মনের মানুষ মিলবে। আজীবন ও নিজে খোলা হাওয়ার মানুষ। অতএব আর যারা ওই খোলা-হাওয়ায় পথ খুঁজেছে সংস্কার ছেড়ে, পুরানো কালের সংকীর্ণতা ছেড়ে, তাদের দিকে ওর মন টানে। তাই ব'লে পুরানো কালের ওপর ওর কোন রাগ নেই, কত মানুষের কত স্বপ্নকে আশ্রয় দিয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু ওর হাওয়া আছে বিষিয়ে। ওর মধ্যে কি থাকা যায়! নিশ্বাস বন্ধ ক'রে তো আর থাকা যায় না! ওর দৃষ্টি কেবলি সেই মানুষকে খুঁজে ফেরে যার হাত ধ'রে ও আলোয়, হাওয়ায়, স্বাস্থ্যে-ভরা নিজের ঘর খানি বাঁধবে।

যে সব যায়গায় আনেৎ সাধারণতঃ যায় সেইসব ড্রইংরূমে ওর যোগ্য ছেলের অভাব ছিল না। দলীয় লেবেল থাক আর না থাক, অনেকেরই তাগড়া দুঃসাহসী মন ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের আর ওর পথের নিশানটা এক নয়। দার্শনিকদের ভাষায় সীমাবদ্ধ। এক সঙ্গে দশ দিকে হাত বাড়ান সম্ভব নয়। চারদিকে আলো ছড়িয়ে চলতে পারে এমন ক্ষমতা ক' জনের আছে সংসারে? যাঁরা আলো জ্বালতে পেরেছেন [খুব কমই সংখ্যায়] তাঁদের বেশীর ভাগই একেবারে নাক বরাবর একটি মাত্র বিন্দুতে আলো লক্ষ্য ক'রে চলেন, আশ পাশের দিকে নজর থাকে না। সেখানে কি আছে কিছুই চোখে পড়ে না। বরঞ্চ একদিকে একটু এগিয়ে গেলে আরেক দিকে ততটা পিছিয়ে থেকে হিসেবে সমান হ'য়ে নেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে ও শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক বিপ্লবীই রক্ষণশীল হ'য়ে পড়েন। এক দিকে যদি বা দু' চারটে কুসংস্কার [যেগুলো নিজের কাছেই তুচ্ছ] খোয়া গেল, আর কতগুলোকে তিনি তক্ষুণি লোভীর মত আঁকড়ে ধরবেন। এই হ'লো সাধারণ নিয়ম।

নারী পুরুষের জীবনের নৈতিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে এমনি অসমান কদম ফেলা অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। অতীতের নিগড় ভেঙ্গে নূতন-সমাজের দিকে এগিয়ে-চলা-মেয়ে তার চলতি-পথে কোথায় পায় এমন ছেলের দেখা যে নূতন দুনিয়া গড়বার জন্য পথে বেরিয়েছে! দু'জনের ভিন্ন পথ। চলতে চলতে যদি বা পাহাড়ের ডগায় গিয়ে দুটো পথ মিলে গেল, দু'জনে থাকবে মুখ ফিরিয়ে। আদর্শের এই বিভিন্নতা তৎকালীন ফ্রান্সে অত্যন্ত প্রকট হ'য়ে উঠেছিল। বহুকাল পিছিয়ে থেকে মেয়েরা হঠাৎ জোর কদমে চলতে আরম্ভ করেছেন ক' বছর হ'ল। পুরুষের সমাজ একে আমল দেয়নি।

প্রথমে অতটা তলিয়ে দেখেননি নারী-সমাজ। তারপর ব্যক্তিগত জীবনে সংঘর্ষ বাঁধল এক দিন। চোখ কচ্‌লে দেখলেন মস্ত একটা প্রাচীর মাথা উঁচিয়ে ঘরের লোকটিকে তফাৎ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। সাংঘাতিক রূঢ় আঘাত। সত্যটাকে চোখ খুলে দেখতে গিয়ে অনেক মূল্য দিতে হ'ল আনেৎকে।

[ছয়]

আনেৎ-এর সুদূর চোখ দুটির সহজ দৃষ্টি কেবলি মানুষ খুঁজে ফেরে ওকে ঘিরে-থাকা ভিড়গুলোর মধ্যে। খোঁজা শেষ হ'ল একদিন, মানুষের দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু মন স্বীকার ক'রলে না সে-কথা। অনিশ্চিত পরিস্থিতিটার শেষ হয়েছে; শেষ হয়নি তার ছল। যতদিন সম্ভব মন নিজেকে চোখ ঠার দিয়ে রাখলে। সিদ্ধান্ত শেষ হ'য়ে গেলেও তার বন্ধনকে অস্বীকার ক'রে শেষ বারের মত আশার সপাট-খোলা দরজাটার দিকে তাকাতে ভারী মিঠে লাগে।

মার্সেল ক্রাঁক ও রোজার ব্রিসট্...। দীপ্ত যৌবন। আটাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে বয়স। বেশে বাসে ব্যবহারে চলনে বলনে মাজা-ঘষা—চোখে পড়ার মত। বুদ্ধিতে সমুজ্জল, প্রিয়-দর্শন। বেশ স্বচ্ছল অবস্থার মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে দু'জনেই। এ পর্যন্ত এক হ'লেও প্রকৃতি আর মানসিক গঠন বিভিন্ন। আনেৎ-এর ভবিষ্যৎ দুলছিল এ দু'জনের মধ্যে। আনেৎ অবশ্য মনে মনে জানে দুলুনিটা কোন্ দিকে ঝোঁক নিয়ে স্থির হ'য়ে আছে।

ইহুদী রক্ত আছে মার্সেল ক্রাঁকের দেহে—এক আধা-ইহুদী পরিবারে তার জন্ম। ভিন্ন জাতির সুনির্বাচিত নর-নারীর মিশ্রিত বিবাহজ সন্তানের মধ্যে মাঝে মাঝে যে চমৎকার টাইপ দেখা যায়, ও তারি একজন। লম্বা খুব বেশী নয়। ঋজু, দোহারা তনু, দেহ-গঠনে ভরা শ্রী, মুখের প্রাণহীন অতি-শুভ্রতার পরিবেশে যেন খোদাই করা দুটি নীল চোখ, ছোট সুডৌল চিবুক, লম্বাটে মুখের প্রোফাইলে আলফ্রাড্ দ্য মুসের ছায়া। ঠিক তেমনি বুদ্ধি-দীপ্ত, আদরে-ভরা দৃষ্টি; তেমনি ক্ষণে-গ'লে-পড়া ক্ষণে বিদ্রোহী।

কাপড়ের ব্যবসা করতেন মার্সেলের বাবা। অত্যন্ত হুসিয়ার ব্যবসায়ী। মনের বৃত্তিগুলি জোরাল। নূতন নূতন শিল্পে গভীর অনুরাগ. রুসো, ভ্যান-গগ্-এর ছবি কেনেন। বিবাহ করেছেন সুন্দরী তুলো-বাসিনীকে যিনি কোন অভিনয় প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়ে রঙ্গালয়গুলোর কাড়াকাড়ির বস্তু

হ'যে উঠেছিলেন। এমন সময় জোনাস ফ্রাংকের বলিষ্ঠ বাহু সবার মাঝখান থেকে ছোঁ মেরে তাকে তুলে নিয়ে গেল। পরের পর্যায়ে বিবাহ, সাফল্যের সূর্য মাঝ-আকাশে জ্বলছে, এমনি সময় রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে ঘরে এসে স্বামীর সাহিত্য-বাসরে জেঁকে বসলেন। অনেক শিল্পীর আনা-গোনা ছিল সেখানে। গৃহস্থালীতে এমন পরিপূর্ণ মিল বড় একটা দেখা যায় না, অথচ কেউ কারো ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না পরিপূর্ণ মানসিক সঙ্গতির ফলে। একটি মাত্র ছেলেকে ওঁরা প্রতিপালন করেছেন, সহনশীল এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে পরিশ্রুত আবহাওয়ায়। ছেলে মার্সেল শিখলে, কাজ আর আনন্দ দিয়ে একই সূতোয় মালা গাঁথা চলে। এই মালা গাঁথার আর্টের ওপর নির্ভর করে জীবনের আর্ট। অন্যান্য শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পেও নিপুণ হ'য়ে উঠল মার্সেল। জাতীয় ম্যুসিয়মগুলিতে যাওয়া আসা করতে লাগল, এবং অতি অল্প বয়সেই ওর নাম ছড়িয়ে পড়ল শিল্প-সমালোচক ব'লে। ছবিও দেখে, জীবন্ত মানুষও দেখে ও। অলস অথচ মর্ম-ভেদী, উদ্ধত অথচ সপ্রশ্রয় ওর চোখের দৃষ্টি। আনেৎ-এর প্রসাদ-প্রার্থীদের মধ্যে এই লোকটাই ওকে সব থেকে ভালো ক'রে চিনেছে, এ কথা আনেৎ-ও জানে। ভুইঁঘুমে আনমনে স্বপ্নের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে আনমনে কথা ব'লে চলেছে আনেৎ হঠাৎ জেগে উঠে দেখেছে ও, ঐ চোখ বিদ্ধ হ'য়ে আছে ওর ওপর, যেন বলছে 'আনেৎ তোমার ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিলুম।'

আশ্চর্যের বিষয়, আনেৎ—অতি ভদ্র, শালীন ও -শালীনি আনেৎ—এতে বিব্রত বোধ করে না। বরঞ্চ ওর ইচ্ছে হয় বলে

'কেমন লাগছে আমার এই রূপ ?'

বোঝাবুঝির হাসি খেলে যায় ওদের মুখে। গভীর বা খুশি আনন্দ, আনেৎ জানে, তবু মার্সেলের স্থান নেই ওর জীবনে। আনেৎ-এর চোখে লোভ আসে না, ও এ সত্য পড়ে নেয়। কিন্তু ভয় পায় না—ভাবে, দেখাই যাক না

প্রতিদ্বন্দ্বী রোজার ব্রিসট্‌কে ও জানে।

রোজার ব্রিসট্—ওরই কলেজীয় সহপাঠী। মার্সেল জানে আনেৎ-এর কাছে রোজারই নম্বর বেশী পেয়েছে। প্রথম কথা অন্তত ...('এবং পরে ?...

ওঃ, সে অন্য ব্যাপার') ব্রিসটের রূপ আছে স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন মুখ-ভাব, অতি সরল ভঙ্গি—কোথাও কোন অস্পষ্টতা নেই, খুশিতে উজ্জ্বল দুই বাদামী চোখ। বলিষ্ঠ প্রখর সুসংগঠিত অবয়ব, সুন্দর, ক্ষৌর মসৃণ মুখশ্রী, এক মাথা কালো চুল—বুদ্ধির আলো-জ্বলা কপালখানাকে পরিপূর্ণ মুক্তি দিয়ে পেছন দিকে উল্টে আঁচড়ান—পাশ ঘেঁষে সিঁথি। ওর ঋজু দীর্ঘ ছন্দ দেহে, সুদীর্ঘ পদক্ষেপে, প্রশস্ত বক্ষে, পেশল বাহুতে, চলার সহজ ভঙ্গিতে প্রাণাবেগ উছলে পড়ে। চমৎকার ওর কথা—সঙ্গীতের মত মধুর তার সুর, অন্তরঙ্গ তার স্বর—নীচু কিন্তু গভীর পরিপূর্ণ। ওর কণ্ঠ ভালো লাগে শ্রোতার, ভালো লাগে নিজেরও। ওর শাণিত, দীপ্ত, ক্ষিপ্র, জাগ্রত বুদ্ধির জোরে ও মার্সেলকে ডিঙিয়ে গেল ক্লাশে, খেলার মাঠেও। রিভিয়েদের বারগান্ডির বাড়ীর গা ঘেঁষেই ওদের বাস্তুভিটা, দ্রাক্ষাক্ষেত আর বাগান। সেখানেও ওর হাটা, শিকার আর ঘোড়ায় চড়ার খ্যাতি আছে। আনেৎরা যখন ছিল ওখানে, বহুদিন বেড়াবার সময় পথে সাক্ষাৎ হয়েছে দু'জনের। তখন আনেৎ ছিল অন্য মানুষ—তখন মন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আনাগোনা। নিজের স্বচ্ছন্দ পথে ও তখন চলেছে। প্যারী থেকে পালিয়ে রোজারও ঠিক ঐ সময় ক'টা মাসের জন্য বারগান্ডির মুক্ত আকাশের তলায়—হিপোলিটাসের মত—নারী ছেড়ে কুকুর আর ঘোড়া নিয়ে মেতে ছিল। আনাগোনার পথে দেখা হ'লে হয়তো ছোট্ট একটা অভিবাদন বা সামান্য একটু দৃষ্টি বিনিময়—তার বেশী নয়। অবশ্য বিফলে যায়নি এও। এই ক্ষুদ্র সম্ভাষণ-বিনিময়ের সূত্র ধ'রে একটা ভালো-লাগার রং লাগল দু'জনের মনে—, তার সূত্র ধ'রে ঘোমটা টেনে এলো আকর্ষণ, দুটি মানুষের দৈহিক সঙ্গতির স্বাভাবিক আমন্ত্রণে।

কথাটা ব্রিসট পরিবারের মনেও এসেছিল। রিভিয়ে যতদিন বেঁচে ছিলেন, খানিকটা ঠাণ্ডা রকম দূরত্ব থাকলেও, প্রতিবেশী-সুলভ সৌজন্যের অভাব ছিল না তাঁর। ব্রিসট-খ্যাত কার রিভিয়ে কারো কাছে মাথা নোয়াননি কোনদিন। ড্রেফাস আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত স্বর্গত রিভিয়ের সমস্ত মক্কেল ছিল অভিজাত আর প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের। তার বাইরে একজনও ছিল না। অত্যন্ত চালাক মানুষ তিনি, এ লোকগুলোকে মুখের কথায় তুষ্ট রাখতে চেষ্টা

করেননি। চোখে পড়বার ইচ্ছে না হ'লে গির্জায় গিয়ে চোখ বুজে পর্যন্ত বসেছেন। এজন্যই ওঁর নিজের দেশের র‍্যাডিক্যালরা ওঁকে বলেছে প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্ম-ধ্বজী ব'লে ঠাট্টা করেছে [শুনে অবশ্য মনে মনে ভারী হেসেছেন।] এখন ব্রিসট্‌রা র‍্যাডিক্যাল-দলের স্তম্ভ। ওরা শাম্‌লা-পরার জাত—কেউ উকিল, কেউ অ্যাটর্নী·· প্রায় একশ' বছরেরও বেশী দিনের জারান রিপাব্‌লিক-ভক্ত ওরা, সেই প্রথম গণতন্ত্রের সময় থেকে। [কিন্তু ওদের বংশেরই কে একজন, বুরবঁদের ফিরে আসার পর 'অর্ডার অফ দি লিলি' পেয়েছিলেন। কথাটা ওরা লোকের কাছে চেপে যায় অবশ্য।] ওদের রিপাব্‌লিক-ভক্তি ভগবদ্‌-ভক্তির মতই, রিপাব্‌লিকের সঙ্গে ওরা একেবার নিমক-স্বত্বে বাঁধা। সুতরাং রাওল-এর ওপর ওদের রাগ। ওঁকে দূরে রেখে ওদের রাগ দেখাবার জবরদস্ত উপায়। কিন্তু কিছু প্রাপ্তির আশা নেই ওদের কাছ থেকে, তাই ওদের তিনি তুচ্ছ ক'রে চলেছেন। তারপর এল ড্রিফাস আন্দোলন। চোখের নিমেষে রাওল গিয়ে ছিট্‌কে পড়লেন তার মধ্যে। স্বপ্নেও ভাবেননি এমনটা হবে। এক লহমায় কলি ফিরে গেল, ওঁর অতীত একবারে বেমালুম ধুয়ে সাফ হ'য়ে গেল। লোকে এখন ওঁর মধ্যে নাগরিক সুলভ, রিপাব্‌লিক সুলভ কত বড় বড় গুণ আবিষ্কার ক'রে ফেলল। রাওল নিজেও জানতেন না এত গুণ ওঁর মধ্যে লুকিয়েছিল। হঠাৎ মরণ এসে বাগড়া না দিলে প্রচুর লাভ হ'ত ওঁর এর থেকে।

কিন্তু তাতে ব্রিসট্‌দের মৎলব-হাসিলের পক্ষে বাধা ঘটেনি। এই ঝানু রিপাব্লিকান গোষ্ঠিটি নীতি ও স্বার্থকে বেশ মানিয়ে বুঝিয়ে চ'লে এসেছে একশ' বছর ধ'রে। এরা ধনী এবং স্বভাবতঃ আরো ধনের সাধ রয়েছে। রিভিয়ে তাঁর বিপুল সম্পদ একমাত্র কন্যার হেফাজতীতে রেখে গেছেন। এ খবর ওরা জানে। সুতরাং রাওল পরিবারের বার্গাণ্ডির সম্পত্তি ব্রিসট্‌ পরিবারের সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত যদি হয়· কথাটা মন্দ নয়! ষোল-কলা পূর্ণ হবে। কিন্তু ব্রিসট্‌দের মত মানুষদের সাংসারিক বিচারের ভাবনা প্রথমে মনে এলেও বিচারটি আসে পরে। বিবাহ ব্যাপারে সাধারণতঃ পাত্রী হন মুখ্য। এ ক্ষেত্রে পাত্রী লক্ষ্য না হ'য়ে হলেন লক্ষ্যে পৌঁছুবার রাস্তা। আনেৎ-এর যতটুকু ওরা

দেখেছে ও জেনেছে তাই ওদের উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে যথেষ্ট। ওর সংযত শান্ত ভঙ্গি ওরা দেখেছে, শুনেছে ওর পিতৃ-নিষ্ঠার কথা। ওর অকপট সারল্যে মুগ্ধ হয়েছে। লক্ষ্য করেছে, নিখুঁৎ ওর সামাজিক-আচরণ, শান্ত-মর্যাদায় মহিমান্বিত। পরখ করেছে ওর বুদ্ধি আর রসবোধ, এবং ওর অতুল স্বাস্থ্য। ওর কাজ, পড়াশোনা, পরীক্ষা পাশ ইত্যাদিতে খানিকটা কৃত্রিমতা আছে ব'লে মনে হয় তাদের। এগুলোকে ওরা বুদ্ধিমতী এই কচি মেয়েটার নিরালা জীবনের সময় কাটাবার খেলা ব'লে ধরে নিয়েছে, এবং ওরা বিশ্বাস করে সন্তান হ'লেই এ খেলাঘর আপনি ভাঙবে।

আনেৎ-এর অত বিদ্যে সুতরাং বাবার মত হবে না নিশ্চয়ই সে। ঐ যা ভরসা। এ ছাড়া আর ভাবনা কিসের! নূতন বাড়ীতে আসছে—উপদেশ দেবার, বুঝিয়ে দেবার লোকের অভাব হবে না। এখানে দু'দিনে ঘরের মেয়ে হ'য়ে উঠবে। মা বাপ নেই বেচারীর, খুব খুশি হবে ও—এখানে মা পাবে, বোনও পাবে—অবশ্য সামান্য বড় সে ওর থেকে। দু'জনে মিলে ওকে ঢেকে রাখবে। মা মেয়ে দু'জনেই তীক্ষ্ণ চোখে দেখে দেখে বুঝেছে আনেৎ বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির মেয়ে, মিষ্টি, মার্জিত, সংযত ব্যবহার, ব্যক্তিত্বের মধ্যে কৌলীন্য আছে, একটু যেন ভীক ভীক [ওদের মতে এ দোষের নয়], এবং গ'লে পড়া ভাব নেই [এতো রীতিমত গুণ]।

পরিবারের সঙ্গে আগে থাকতে পরামর্শ ক'রে তাদের অনুমোদন নিয়ে তবে রোজার ওর কাছে প্রেম নিবেদন করলে। কিছু লুকোয় না তাদের কাছ থেকে। যাই করুক না, বাড়ীর সমর্থন পাবেই। বুড়ো খোকাটি বাড়ীর লোকের মাথার ঠাকুর, পূজো পায়, পূজো করে। পরস্পরের পিঠ চুলকোন ব্রিসট্‌দের চলতি রীতি। পরিবারভুক্তদের যোগ্যতার পরিমাণ-ভেদ থাকলেও, যোগ্যতা ছিল। দেহ, মন, অর্থ সব দিক দিয়ে সকলেই কিছু কম বেশী প্রচুর সম্পদের অধিকারী। এ সম্বন্ধে ওরা খুব সচেতন। কিন্তু ঐ সচেতনার মধ্যে খানদানী ঘরের বিনয় আর পরিমার্জনা আছে। যাদের ওরা নিজেদের চাইতে অধম ব'লে মনে করে, তাদের সামনে কোনও চাল দেখায় না। না দেখালেও ওদের সারা দেহে চোখে মুখে নিশ্চয়তার এমনি সুন্দর মিষ্টি ইশারা আছে যে

কিছু আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না। এ হেন পরিবারের সর্বপ্রকার নিশ্চয়তার মধ্যে রোজার নিশ্চয়তর নিশ্চিততর। রোজার ব্রিসট্ পরিবারের সার্থক গর্ব, ব্রিসট্ বৃক্ষে অমন বাড়-বাড়ন্ত ফল আর ফলেনি। বংশের সবগুলো গুণ ও পেয়েছে, দোষ যা আছে তেমন কিছু নয়, ওর তারুণ্যের ঝলমলানীতে তা ফিকে হ'য়ে আছে। ওর প্রতিভা আছে, ওর সব কিছুই অমনি হয়, অবলীলায় হয়—বিশেষ ক'রে কথা। ব্রিসট্ পরিবারটাই বাকশিল্পী। জন্ম থেকেই ওরা কথা ভালবাসে। ঐ গুণে একজন মস্ত ব্যারিষ্টার হয়েছে। আসলে ওদের আসল প্রকাশ আর বিকাশ কথাকে ভর ক'রে। কথা বলতে না পেলে ওরা একেবারে পঙ্গু।

রোজারের বাবা সেবার নির্বাচক-মণ্ডলীর নষ্টামীতে পুনর্নিবাচন পেলেন না। বক্তৃতা দিতে না পেরে তাঁর দম বন্ধ হবার যোগাড় হ'ল। রোজারের বয়স তখন সবে ছয়। ও যেন বুঝল। আগুন পোয়াতে বসে কেউ যদি সামনে না থাকে, ও বাবাকে বলে 'একটা বক্তৃতা দাও না আমার কাছে, বাবা'

এখন অবশ্য নিজেই বক্তৃতা দেয় রোজার। বুর্ব-প্রাসাদে সেবার আইন-জীবিদের সম্মেলন হ'ল, তাতেই রোজারের নাম ছড়িয়ে গেল। অন্যান্য ব্রিসট্দের মত ও-ও রাজনীতিতে আপনাকে ঢেলে দিল। তারপর এল দি. স আন্দোলন। স্বর্ণ-সুযোগ জুটে গেল। চারদিকে সভা-সমিতি। ঝাঁপিয়ে প'ড়ল আসরে। বক্তৃতার বন্যা ছুটল। সুরূপ নষ্ট তরুণের আগুন-জ্বালানো, বাছা বাছা কথা-সাজানো ওজস্বিনী বক্তৃতায় বহু 'দ্রেফাইষ্ট' তরুণী ও তরুণরা ওর দলে এসে ভিড়ল। প্রগতির পথে কারো পেছনে থাকার পাত্র নয় ব্রিসট্রা। অথচ অত্যুৎসাহে একটি বেহিসেবী কদমও ফেলবে না, এক মুহূর্ত সময়ের ভুলও হবে না এদের। রোজারের বাবা অবস্থা ভাল পরীক্ষা ক'রে ছেলেকে সমাজতন্ত্রবাদের ছুটন্ত ঘোড়ায় চ'ড়িয়ে দিলেন যাত্রা-তিলক কপালে পরিয়ে। রোজার লাগাম কসে ধ'রে এগিয়ে চলল পেছনের হাওয়ায় নাক রেখে।

তখন জোরে-এর ভারী প্রতাপ। ভালো ভালো ছেলের দল তার যাদু মন্ত্রে বশ। রোজারের ভাষণে ভাষায় ছাপ পড়ে জোরেস। তার মত

ক'রে ভালো ভালো সাজান কথা দিয়ে ভবিষ্যতের মন-ভোলান ছবি আঁকে জনতার সামনে। উদাত্ত কণ্ঠে সে ঘোষণা করে, জনগণ আর বুদ্ধি-জীবিদের মধ্যে বোঝাপড়ার সময় এসেছে। তারপর বহুদিন ধ'রে বহুস্থানে ঐ এক বিষয় নিয়েই ও জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলে। এসব কথা বুঝলে না জনতার জনেরা, অবসরও নাই তাদের, তবে অবসর ঘুচলো তরুণ বুর্জোয়াদের। নিজেদের গাঁটের কড়ি দিয়ে, কজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে রোজার একটি পাঠচক্র স্থাপন করলে, খবরের কাগজ রাখলে, গড়ল একটি দল। বহু সময় আর টাকা ঢালতে লাগল এর পেছনে। পাকা-হিসেবী বুর্জোয়াদের হিসাবে ভুল হয় না। ওরা জানে মাঝে মাঝে মুঠো খুলতে হয়। ছেলে তরুণ-সম্প্রদায়ের নেতা হ'য়ে উঠেছে দেখে তাঁরা খুশিই হ'লেন। বুঝলেন, আগামী নির্বাচনের পথ তৈরী হচ্ছে। চেম্বারে একটি আসন এবার রোজারের চাই—তাঁরা ঠিক করলেন। রোজারও কথাটা শুনল। আশৈশব ও দেখেছে পরিবারের সকলের ওর ওপর গভীর আস্থা, ওর নিজেরও নিজের ওপর আস্থা আছে। নিজের মতবাদের উপরও গভীর বিশ্বাস, যদিও মতবাদটা যে কী তা ও নিজে সঠিক জানে না। নিজেকে নিয়েই ও মশগুল, এখানেও ও অদ্ভুত স্বাভাবিক। যাতে ও হাত দিয়েছে বিফল হয়নি কখনও। সাফল্য ওর এমনি স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে যে এ নিয়ে গর্ব হয় না ওর। হবার কথা মনেও হয় না। কোনও দিন অকৃতকার্য হ'লে আকাশ থেকে পড়বে, চিরকেলে বিশ্বাসে মরণ-আঘাত পড়বে। ভারী মজার মানুষ, ঠিক মনে ধরবার মত মানুষ। সহজ মানুষ, যদিও 'আমি'টা কিছু বড়, কিন্তু তার শিকড় বেশী দূর যায়নি এখনও, আর নিজেও সে-সম্বন্ধে বে-খেয়াল। ভালো মানুষ, ভালো চেহারা, দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু পাওয়া চাইই, চেয়ে কখনও হাত গুটোতে হবে এ-ধারণা ওর স্বপ্নের অতীত, সরল, ভদ্র, অমায়িক, দাবী করতে পারে, পৃথিবী কখন এসে ওর পায়ে লুটোবে। ওর মধ্যে চুম্বক আছে।

[সাত]

তার টান আনেৎকেও টানে। রোজারকে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে। এবং যতই বিচার করে রোজারকে ও ততই ভালবাসে। তার দুর্বলতায় ও স্নিগ্ধ হাসে। ওগুলোও ওর একান্ত প্রিয়। আনেৎ-এর মনে হয় পুরুষ নয় রোজার, ওর বুকের কাছের ছোট্ট শিশুটি। একাধারে রোজার পুরুষ আর শিশু—আনেৎ-এর হৃদয় আনন্দে দোলে। রোজার সরল—এই সারল্য ওর সব চেয়ে বড় আকর্ষণী। ও কিছু গোপন রাখে না—একেবারে উদ্ঘাটিত ক'রে রাখে আপনাকে। নিজেকে নিয়ে ওর অকৃত্রিম তৃপ্তি, ওর ব্যক্তিত্বে ঢেকে দিয়েছে বিচিত্র স্বাভাবিকত্ব।

আনেৎ-এর প্রেমে ও মুগ্ধ—তাই ও প্রেমাস্পদার কাছে আরো খুলে গেছে। ও টুকরো ক'রে ভালবাসে না, কিন্তু টুকরো ক'রে ছাড়া কোনো জিনিস দেখে না।

সেদিন সন্ধ্যা। এক ড্রয়িং রুমের আসর। রোজার উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কথা ব'লে চলেছে। আনেৎ নিবিষ্ট চিত্তে নীরবে শুনছে। [অন্ততঃ রোজার তো ভাবছে তাই।] তার চোখের বুদ্ধি-দীপ্ত আলোয় রোজারের চিন্তাগুলি আরো লঘুপক্ষ হ'য়ে ওর মানসলোকে ফিরে আসে। আনেৎ-এর প্রসন্ন হাসিতে যেন ওর বাগ্মিতার অভিনন্দন। ও খুশি হ'য়ে ওঠে। ওর যেন মনে হয় ওর আনন্দের অংশ গ্রহণ ক'রেছে আনেৎ-ও। আরো মিঠে লাগে। কি সুন্দর মোহময়ী ঐ শ্রবণ-নিরতা প্রতিমা ··ঐ ধ্যান-নিবিষ্ট বাঙ্ময়ী আঁখিদুটিতে, সব-বোঝা হাসির অভিনন্দনে কি মহিমাময় আত্মার প্রকাশ, কি অপরূপ মানস-বৈভবের উল্লাস!···ঘরের মধ্যে কথা বলছে একা রোজার···কিন্তু ওর কেমন মনে হয়, একা নয় ওর কথার সাথী ঐ নারী···তারই সঙ্গে চলেছে ওর বাক-বিনিময়। আজ থেকে ওর যত কথা সব ঐ নারীর জন্য··। অন্তর-লোকের এই বাণী-বিনিময়, বিচিত্র আলাপন আপনাকে অতিক্রম ক'রে কেবলি

ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর লোকে নিয়ে যায় ওকে। আসলে শুনছিল না আনেৎ। রোজার মুখ খুলতেই তার মনের ধারা বুঝে নিতে দেরী হয় না বুদ্ধিমতী মেয়ের। আনমনে তার সাজানো গোছান অলংকার পরানো কথা শুনে যায়। রোজার আত্মহারা হ'য়ে ছিল আপন বাক্‌-বৈদগ্ধে। সুযোগ পেল আনেৎ... মানুষটাকে নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে লাগল অবয়ব হ'তে অবয়ব—চোখ, মুখ, হাত, কথা বলার সময় চিবুক নড়ার ভঙ্গিটুকু; ডাকবার সময় অশ্ব-শাবকের নাকের মত ওর সুশোভন নাকটির মৃদু কম্পনটুকু,...দেখছিল মুখের মধ্যে কতগুলো কথা কি সুন্দর ভাবে গড়িয়ে গ'ড়িয়ে যায়। আর দেখছিল এই সব বিশিষ্টতার মধ্য দিয়ে যে-মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে। একেবারে ওর ভেতর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে আনেৎ। বাহবা পাবার লোভ আছে ওর, আছে পর-প্রসাদন-রতি। রোজার সুন্দর, রোজার বুদ্ধিমান, বাগ্মী...অদ্ভুত রোজার। ওর মধ্যে হাস্যকর কিছু আছে, একবারও মনে হয় না আনেৎ-এর। ·বরঞ্চ ওর মনোহরণ করে লোকটা। সুন্দর তুমি প্রিয়...সুন্দর তুমি, তুমি মনোমোহন, তুমি ধীমান্ বাগৈশ্বর্যবান্, তুমি বিস্ময়...কেবল একটু হাসি চাই? একটুখানি?...একটু কেন? আমার দুই মাধুরীময় নয়ন ভ'রে খুশির নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখেছি...লও তুমি...লও...নিয়েছ? ভরেছে চিত্ত!...রোজার আনন্দিত, গরবিত, বসন্ত-বিহগের মত ওর কাকলি দ্বিগুণ উৎসারে বয়...আনেৎ দেখে মনে মনে হাসে... রোজার পূজা ভালবাসে। নির্জলা সুরার মত ও স্তুতি পান করে এতটুকু সংশয় না রেখে। যত পায় প্রাণ ভরে না। আরো চায়। ক্লান্তি নেই ওর। আপন গানের সুরে ও বুঁদ। ওই গান আর তার সমঝ্‌দার ওর মাতাল দৃষ্টির সামনে এক হ'য়ে যায়। ওর নিজের মধ্যে যা কিছু সুন্দর, যা উত্তম, আনেৎ যেন তারি মূর্ত প্রতিমা। সেই প্রতিমার পূজা করে রোজার।

প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলেছে আনেৎ। যখন বুঝল ও-পক্ষের মুগ্ধ হৃদয়ের ধারা ওর ওপরে বর্ষিত হচ্ছে, ও বাধা দিলে না। যে ক্ষীণ সংশয় আর দ্বিধা জর্জেটের হাল্কা আবরণের মত ওর বক্ষ-স্পন্দনকে আড়াল ক'রে রেখেছিল, তাও এবার খসে পড়ল। হৃদয় মেলে দিয়ে সাজিয়ে দিল প্রেম-দেবতার অর্ঘ্য। প্রেমের জন্য ওর সারা অন্তর কুণ্ঠিত হ'য়ে ছিল;

পিপাসায় বুক ছিল শুকিয়ে। যে-মানুষ এসে ওর মনোহরণ করল, তার অধরের সুধা-সাগরে ডুবে পিপাসা মেটাতে কি সুখ [এখনও কল্পনায়ই আছে] ! ওর বুকের চাওয়াকে বাইরে থেকে প'ড়ে নিয়ে সুধার পাত্র মুখের কাছে তুলে ধরল রোজার কি আকুল আগ্রহে ! আনেৎ অণুতে অণুতে বিপুল কৃতজ্ঞতায় ভ'রে উঠল।...

লকলকে শিখায় আগুন জ্বলে উঠল। পরস্পরের আকাঙ্খার আগুনে ওদের হৃদয়গুলি ঝলসে গেল। যতই জ্বলে ততই বাড়ে চাওয়া আর ততই দু'দিক থেকে চাওয়ার কূল ছাপিয়ে দেবার মাতামাতি...। বড় ক্লান্তিকর, কিন্তু ওদেরও তরুণ প্রাণে উদ্যমের অভাব নেই।

কিন্তু রোজারের হঠাৎ-আক্রমণ ঠেকাতে পারেনি আনেৎ, ক্ষণেকের জন্য ও যেন থমকে গিয়েছিল। কি যে ঘটে গেল, ও ঠাহর করার সময় পায়নি। বিপুল উচ্ছল প্রকৃতি রোজারের—একান্ত ক'রে পূর্ণ বিশ্বাসে নিজেকে ঢেলে দিতে চায় সে—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব। সুদীর্ঘ কাহিনী, হোক সুদীর্ঘ কাহিনী... রোজার শোনাবে, শুনবে...আনেৎ-এর ও সর্ব ইতিহাস শুনবে, যা আছে সব নেবে। কি ক'রে আনেৎ তার গোপন মর্মকে রক্ষা করবে ভেবে পায় না, রোজার জোর ক'রে দুয়ার ঠেলে আসতে চায় সেখানেও। ব্যাকুল হ'যে ওঠে আনেৎ। রাগ হ'তে চায়...কিন্তু ভালও যেন লাগে, খুশিতে বুকটা দোলে... এক একবার ইচ্ছে হয় বেয়াদপ লোকটাকে এই হঠাৎ-হামলার জন্য আচ্ছা ক'রে বুঝিয়ে দেবে...কিন্তু ও শত্রু যে ছাই মন-কেড়ে-নেয়া শত্রু ! হার মানে আনেৎ...সর্বস্ব লুটিয়ে দেবার উন্মাদনায় হার মানে। দেখে ব্যাভিচারী মনের লীলা [কি জানে রোজার ওর ?]...তার অনুরাগে বিরাগে দোল খাওয়া...

অমন ক'রে আত্মসমর্পণ হয়ত খুব বুদ্ধি-বিবেচনার কাজ হয়নি। কারণ, পরম অন্তরঙ্গ মুহূর্তে, পরম বিশ্বাসে বলা কথা হয়ত কোনও কালে অপর পক্ষের হাতের অস্ত্র হ'য়ে উঠতে পারে। কিন্তু এখন সে-কথা ভাবার সময় নেই কারো। আজ প্রেমের রং-এ সব রাঙা। প্রিয়জনের কোন কিছুতেই আজ রাগ হয় না, অবাক লাগে না ; সব পারস্পরিক অমুচ্চার আত্মনিবেদনের অভিব্যক্তির প্রতীক। রোজারের মনের ওপর কোন প্রহরা থাকে না আর, যা খুশি ব'লে

যায় নির্বিচারে। যে গভীর প্রশ্রয় ও নিষ্ঠা দিয়ে শোনে আনেৎ, তার খবর রাখে না রোজার।

আজ ওদের অতীত বর্তমান যুক্ত হাতে তুলে নিয়েছে ওরা গভীর আনন্দে ; অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের স্বপ্নের সঙ্গে মালা-গাঁথা হ'য়ে গেছে··· ভবিষ্যৎ, দুই সম্মিলিত জীবনের ভবিষ্যৎ···। আনেৎ কিছু বলেনি, কোনও অঙ্গীকার করেনি ; কিন্তু অপর পক্ষের দাবীর জোরে ওর কোনও প্রশ্নের অবকাশ রইল না, ও কিছু বলার অবকাশ পেল না। ওর স্বীকৃতি একেবারে স্বতঃসিদ্ধ হ'য়ে উঠল। এবং শেষ পর্যন্ত আনেৎ-এরও মনে হয় ওর আর কিছু বাকী নেই—রোজারের দাবীর স্বাক্ষরকে ও গ্রহণ করেছে।

উচ্ছ্বসিত রোজার অনর্গল তার ভাবী জীবনের স্বপ্নের কথা [বর্তমান ছেড়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে থাকায় যারা তাদের অন্যতম রোজার] ব'লে চলে। আনেৎ সুখে চোখ বুঁজে শোনে।···ভাবী জীবন ? কার ? আনেৎ-এরও ! আনেৎ তো তারই অংশ।

বিলুপ্তি !···রোজারের সত্তায় ওর সত্তার বিলুপ্তি ! চম্‌কে উঠ্‌লে না তবু আনেৎ। ওর অবসর কই ! ওর সামনে পরম বিস্ময়ের বস্তু ওই রোজার। ও শুনছে, দেখছে, গণ্ডূষ ভরে পান করে সেই বিস্ময়কে। রোজার বলে সমাজ-তন্ত্রের কথা, ন্যায়ের কথা, প্রেমের কথা, আর বন্ধন-মুক্ত মানবতার কথা। বিস্ময়···বিস্ময়···রোজার এক টুক্‌রো বিস্ময়···। চমৎকার ওর কথা···প্রাচুর্যে, বিভবে, ছন্দে···সুরে···কোমলতায়···ঔদার্যে···চমৎকার। কথার মধ্যে ওর দরদ-ভরা প্রাণ গলে গলে ঝরে। আনেৎ অভিভূত হ'য়ে পড়ে। এই মানুষটির সাথে ও যুক্ত হবে ; মানবতার মহা-যজ্ঞানুষ্ঠানে ও হবে তার সহ-ধর্মিনী। এ কথা ভাবতে ওর যেন মন মাতাল হ'য়ে ওঠে। রোজার কোনোদিন ওর চিন্তা মত-বাদ বা কর্মধারা সম্বন্ধে আনেৎ-এর মতামত জিজ্ঞাসা করেনি। এতো জানা কথাই যে রোজার যা ভাবছে, আনেৎও তাই। তার অন্যথা হ'তেই পারে না। রোজারের কথা যেন ওরই নিজস্ব কথা। রোজার বেশী ভালো কথা বলতে পারে, অতএব দু'জনেরই মুখপাত্র ও। ও বলে : 'আমরা করব··· আমাদের হবে···' আনেৎ প্রতিবাদ করে না। বরঞ্চ কৃতজ্ঞ হয়। বড্ড বড়

ব্যাপার ; বড় অস্পষ্ট, ওকে মোটে আকর্ষণ করে না···সুতরাং এ নিয়ে ও মাথাও ঘামায় না। রোজার যেন একটা আলো···একটা পরিপূর্ণ মুক্তি···অবশ্য আলোটা একটু যেন বিক্ষিপ্ত, একটু যেন আবছা···। হয়ত আর একটু স্পষ্ট হ'লে ভালো হ'ত। তা হবে 'খন ধীরে ধীরে। একবারেই কি সব হয়, না সব ঠিক ক'রে বলা যায়! আনন্দটুকুকে ধ'রে রাখা চাই আগে···। আজ শুধু আনন্দ···আনন্দ আর আনন্দ···অনন্ত আকাশের অনন্ত বিসারে শুধু ডানা মেলে ওড়া আজ।

বড় ভালো লাগে আনেৎ-এর রোজারের বর-রূপ···যৌবনের বিভবে, স্বাস্থ্যে, শক্তিতে সুন্দর, শুচি, আগুন-জ্বালা দুইটি বর-দেহের আকুল আমন্ত্রণ···ক্ষণে ক্ষণে দেহের অণুতে অণুতে তড়িৎ-এর তরঙ্গ খেলে যাওয়া···। ওদের দেহের তট ছাপিয়ে যেন সব-ভাসান জোয়ার জেগে ওঠে।

কথার স্রোত যখন থেমে যায় রোজারের, সেই থেমে যাওয়ার ব্যঞ্জনা তার সুশোভন বাগ্মিতাকে ছাড়িয়ে যায়। শেস-হওয়া কথার কম্পিত রেশে বিশাল আনন্দ-লোকের দ্বার খুলে যায়। চোখে চোখ মিলে যায়। যেন দেহে দেহে আলিঙ্গন।···চিত্তের কোমে কোমে, রক্তের অণুতে অণুতে কামনার এমনি আগুন জ্ব'লে ওঠে···নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে যায়···রোজার কথা ভোলে, চাল দিয়ে চোখ ধাঁধান ভোলে ; আনেৎ ভোলে বিশ্ব-জনের ভবিষ্যৎ, ভোলে আপন ভবিষ্যৎ···। দু'জনেই ভোলে আপনাকে, ভোলে বাহির, ভোলে ড্রইংরুম—ভোলে সবকিছু। এই মহা-মুহূর্তে আগুনের মুখে মোমের মত গলে গলে মিশে ওরা একাত্ম হ'য়ে যায়। সর্বশক্তিময়ী, সর্বজয়ী প্রকৃতির ক্ষুধা ; অতুল, অদ্বিতীয়, আগুনের মত সর্বগ্রাসী,আগুনের মতই পবিত্র। আনেৎ-এর মাথা ঘোরে, দেহ থর্ থর্ ক'রে কাঁপে···গালে যেন জ্বালা করে,···মত্ত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে মাতালের মত অকস্মাৎ আপনাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায় এই ঘূর্ণী-ঝড়ের কবল হ'তে। কিন্তু জানে, বোঝে, পালাতে পারবে না···হার মানতেই হবে···।

[আট]

আনেৎ-রোজারের ব্যাপারটা জানাজানি হ'য়ে গেল। ওরা লুকিয়ে রাখতে পারলে না। আনেৎ মুখ বন্ধ করেই ছিল, কিন্তু ওর চোখ কথা কইলে। ওদের ভাব-ভঙ্গি কথা কইলে। যেমন রোজারও ধ'রে নিয়েছে, তেমনি দশজনে ধ'রে নিলে যে আনেৎ বাগদত্তা হয়েছে।

শুধু ব্রিসট্‌রাই জানে যে তা হয়নি। বাগদান আনেৎ করেনি। যতই উচ্ছ্বসিত সে হোক, আসল কথাটা এলে সে হামেশাই এড়িয়ে গেছে। কৌশলে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। বেচারা রোজার পেছন পেছন ঘোরে, কথা কয়েই সে খুব খুশী। কয়েকবার এমনি ধারা হবার পর ব্রিসট্‌রা লক্ষ্য করল ব্যাপারটা, ঠিক করল হস্তক্ষেপ করতে হবে। এ ভাবে আর চলতে দেয়া ঠিক নয়। অবশ্যি আনেৎ-এর মন বদলাবে এমন সন্দেহ তারা করেনি—অমন পাত্র অমন ঘর, আনেৎ তো বর্তে গেছে। কিন্তু কে জানে অল্প বয়সের মেয়ে-গুলোর কখন কি খেয়াল হয়। সংসারকে চেনে ব্রিসট্‌রা, জানে খানা-ডোবায় ভরা জায়গাটা। বিশেষ ক'রে শহরে লোকগুলোর কথা বলা যায় না। কাজেই যখন দেখা গেল আনেৎ কিছুতেই ধরা দেয় না, ওরা অস্থির হ'য়ে উঠল। কারণটা কি? সুতরাং মা মেয়ে কোমর বাঁধল।

পারীতে ব্রিসট্‌দের পরিচিত মহলে, ব্রিসট-মার্কা হাসি ব'লে একটা পদার্থ প্রচলিত আছে। ভারী মিষ্টি সৌজন্যের অহংমন্য হাসি, নিক্তিতে ওজন করা অথচ হালকা ছল্‌ছলানী হাসি, অত্যন্ত বিজ্ঞের মত ত্রিকালজ্ঞ, অমায়িকতায় গলে-পড়া অথচ নির্বিকার ঔদাস্যে মুখ-ফেরান সে-হাসি। মা মেয়ের ঠোঁটে ও-দেখন-হাসি লেগেই আছে। দুই হাত ভরে দেয়, অথচ হাত কখনও খালি হয় না।

মাদাম ব্রিসট্‌-এর রূপ আছে। তবে বিরাট চেহারা। চওড়া মুখ, গোল মাংস, অতি-পুষ্ট ফোলা গাল। জাঁকাল চলার ভঙ্গি। এই এতখানি বুক,

কথা কইতে মাখনের মত গলে যান। আনেৎ কেমন যেন বিব্রত বোধ করে। কিন্তু [একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়] শুধু আনেৎ-এর সঙ্গেই অমন ক'রে কথা বলেন না—সকলের সঙ্গেই। ওই ওদের ধরণ। সকলের জন্যই ঐ তৈলাক্ত কথার দাক্ষিণ্য।

রোজারের বোনও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে স্বাস্থ্যে জমকালো। কিন্তু বর্ণে জলুস নেই! এমনি পাণ্ডুর ফ্যাকাশে যে মনে হয় ও মার্বেল পাথরে গড়া মূর্তি। গালে চালের গুঁড়ো ঘসে আর ঠোঁটে রং-এর প্রসাধনে ফ্যাকাশে চেহারাটা যেন আরো ফ্যাকাশে লাগে। এই বিরাট খুকুটির জন্য মায়ের ভারী ভাবনা। নিজের দীপ্তি-হীন রংটা ভালো লাগে ত্রিসট্-নন্দিনীর, তবু মায়ের খেদ শুনে শুনে ওর ধারণা হয়েছে, ওর স্বাস্থ্যটা যেন সত্যি ভালো নয়। কিন্তু তাই ব'লে কারো কাছে আদর কাড়বার চেষ্টা নেই ওর। বরঞ্চ বেশী ক'রে নিজের এনার্জি দেখান এবং ঘ্যান্‌ঘেনে প্যানপেনে মেয়েদের ওপর কটাক্ষপাত করেন। কিন্তু সে যাই হোক, মহিলা অত্যন্ত সজীব, অত্যন্ত কর্মঠ, সব দিক দিয়ে বেশ ভালো লাগার মত। কিছুতে ওর ক্লান্তি নেই। তিনি সব পড়েন, সব দেখেন, সব জানেন ; ছবি আঁকেন, সঙ্গীতের সমালোচনা আর সাহিত্যের আলোচনা করেন। মায়ের সঙ্গে সামাজিক শিষ্টাচার রক্ষা করেন প্রতিদিন। পালা ক'রে ক'রে শ' কয়েক লিষ্টি তো প্রায় সর্বদাই থাকে। তাদের কাউকে আজ ডিনার দেওয়া, কাল কারুর বাড়ী যাওয়া, পরশু কেউ আসবে···তারপর আছে কনসার্ট, থিয়েটর, প্রদর্শনী, পার্লামেন্টের অধিবেশন ;—শ্রান্তি, ক্লান্তি, বিরক্তি নেই ; থাকলে চলে না। মাঝে মাঝে এক-আধটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে শুধু। এ ছাড়াও আছে খাওয়ার পর্ব। দেহটাকে যতরকমে পারে খাটিয়ে নেয় ; সুতরাং না খাওয়ালে চলবে কেমন ক'রে! পরিবারের সকলেই বেশ খেতে পারে ; ও-ও খায় আর তারপর রাত্রিতে নিঃস্বপ্ন গভীর ঘুম। নিজের দেহ মনের পুরো মালিকানা ওর নিজের। বিবাহ ঠিক হ'য়ে আছে এক চল্লিশোধ রাজনৈতিক ভদ্রলোকের সাথে। বর্তমানে সাগরপারের কোনও এক উপনিবেশের শাসক তিনি। কিন্তু শ্রীমতী না পারী ছাড়ছেন, না ছাড়বেন নিজের পদবী। ক্রান্সেই ওর থাকার উপযুক্ত বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে। স্বামীর সঙ্গে ওই বিদেশ বিভুঁই-এ কদাচ

যাবেন না উনি। নিয়মিত পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান প্রদান হয়। সাদা সিধে আন্তরিকতা-ভরা বৈষয়িক চিঠি। সাগরটাকে মাঝে রেখে প্রেম-নিবেদনের পালা চলছে ওদের বহু কাল। তাড়া নেই—সময়ের প্রতীক্ষা শুধু। এতদিনে পাত্রের বয়স কিছুটা বাড়বে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে ভালোই হবে আরো। যত পাকবেন ততই ভালো। রাজনীতিতে বিশেষ অনুরাগ কুমারী ব্রিসট্-এর। ওর মা ব'লে থাকেন রাজনীতিতে ওঁর মেয়ের নাকি ভারী মাথা খেলে। মা হামেশাই মেয়ের বুদ্ধির তারিফ ক'রে থাকেন। মেয়েও বলেন, মার মত অমন দরাজ মন আর সাংসারিক বুদ্ধি নাকি শ'য়ে একজনের মেলে না। ভারী মিহি ক'রে পরস্পরকে ওরা তারিফ করে; আনেৎ-এর সামনে মা মেয়েতে গলা ধরে চুমু খায়। চমৎকার লাগে।

আনেৎ-এর মন কাড়বার জন্য তাঁরা পারস্পরিক পিঠ-চুলকানোর নীতির শরণ নিলেন। আনেৎ, তার বাড়ী-ঘর, পোষাক পরিচ্ছদ, পছন্দ-অপছন্দ, তার বুদ্ধি, চেহারা···সব কিছু ভালো, এমনি ভালো যে তুলনা হয় না। কেমন খটকা লাগে আনেৎ-এর। কিন্তু তারিফে মন ভেজে না, এমন মানুষ বিরল; বিশেষ ক'রে সে তারিফ যদি প্রেমাস্পদের পক্ষীয় কেউ ক'রে থাকেন বিশেষ দৌত্যে।

এ ক্ষেত্রেও যে দৌত্যেরই ব্যাপার বুঝতে কষ্ট হয় না। কথা বলতে বলতে মা মেয়ের মুখে ঘন ঘন রোজারের নাম। আনেৎ তাদের ছেলেকে কতখানি মুগ্ধ করেছে, তাকে কখন কি বলেছে [সব বাড়ী গিয়ে বলে রোজার। আনেৎ কেমন বিব্রত হয়, আবার ভালও লাগে] বলতে বলতে মা মেয়ে গদগদ্ হ'য়ে ওঠেন। রোজারের ভবিষ্যৎ ভারী উজ্জ্বল, কত কি সে করবে, একজন যোগ্য সঙ্গিনী তার চাই। নাম অবশ্যি করেন না, কিন্তু ইঙ্গিতটা স্পষ্ট; এ যেন সেই ঠোঁট নাড়া থেকে কথা আন্দাজ ক'রে নেয়ার খেলা। মাদাম হাসি মুখে তাকিয়ে থাকেন আনেৎ-এর মুখের দিকে—এই বুঝি মা-বলা কথার ভঙ্গিতে ওষ্ঠ জোড়া নড়ে উঠবে :

'পরম সৌভাগ্য আমার।'

আনেৎ হাসে, ঠোঁট দুটি তার ফাঁকও হয় কিন্তু কেবল মাদামের প্রতীক্ষিত কথা কটি বেরোয় না।

ব্রিসটদের বাড়ীতে সান্ধ্য আসরে আনেৎ-এর নিমন্ত্রণ হয়। সেখানে পরিচয় হয় রোজার-এর বাবার সঙ্গে। স্থূল, দীর্ঘ দেহ, ঘন রোমশ ভ্রূর তলায় জ্বল্ জ্বল্ করা ধূর্ত চোখ ; কদম-ছাঁট সাদা দাড়ি, ভাব-ভঙ্গি ধরণ-ধারণ কুশলী উকিলের মত—কিন্তু একটা স্নেহ-মাখা কোমলতা জড়ান। আদর-সমাদরের আতিশয্যে আর সাধারণ স্থূল রসিকতায় আনেৎকে তিনি অস্থির ক'রে তুললেন। পরিবারের অন্যদের সঙ্গে ইশারার খেলায় তিনিও ভিড়তে চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর আড়ে কথার মোটা ঠারে আনেৎ ভয় পেয়ে গেল। মাদাম্ ব্রিসট্ তাঁকে থামবার জন্য চোখ টেপেন। থেমে যান ভদ্রলোক। বাঁকা চোখের বাঁকা হাসি দিয়ে দূরে বসে খেলা দেখেন। মানেন এ সব কাজ পুরুষের নয়, এ সব মেয়েলী খেলা মেযেরাই পারে ভালো।

প্রথম প্রথম তিন চারজন অতি ঘনিষ্ঠ পর্যায়ের বন্ধু বান্ধবও নিমন্ত্রিত হ'ত আনেৎ-এর সঙ্গে। ক্রমে সংখ্যা কমতে থাকে এবং অবশেষে শূন্যে এসে দাঁড়ায়। আসরে অতিথির আসনে শুধু আনেৎ। মাদাম নিতান্ত মাতৃস্নেহের সহজ স্বরে বলেন: 'তুমি ঘরের মেযে। আর এ তো আমাদের ঘরোযা ব্যাপার।' আনেৎ টের পায়—ফাঁদ। কিন্তু বুঝেও স'রে যায না। রোজারের সঙ্গ-সুখ ছাড়বে কি ক'রে! রোজারের প্রতি ভালোবাসায় তার পরিবারকেও ও প্রশ্রয়ের চোখে দেখে; যদিও এদের অনেক কিছুই গোপনে ওর মনকে পীড়া দেয় তবু। চোখ বন্ধ ক'রে থাকে আনেৎ। কিন্তু নারীর সহজাত প্রখর বুদ্ধি দিয়ে দিয়ে ব্রিসট্ মহিলারা বোঝেন ওর মন, স্পষ্ট দেখতে পান। নিজেদের অত্যন্ত ভালোবাসে ব্রিসট্রা, তাই স্বার্থঘাতী কিছু করা তাদের স্বভাব নয়। সুতরাং এখন অবস্থা বুঝে মা মেয়ে প্রকাশ্য আসর থেকে কিছু আড়ালে আসেন; কথা কম বলেন এবং প্রেমিকদের একলা থাকার অবাধ সুযোগ দেন। কিন্তু আনেৎ-এর মুখ খোলে না। আসল কথার ধার দিয়েও যায় না ও। রোজার অস্থির হ'য়ে ওঠে। মা মেয়ে আরো স্পষ্ট ক'রে ওর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ওর আত্ম-বিশ্বাস ন'ড়ে ওঠে, কিন্তু আনেৎকে যেন আরো ভাল লাগে। আর বক্তৃতা দেয় না রোজার; ওর কথার স্রোতে ভাটা পড়ে। আজ জীবনে এই প্রথম ও অন্যের মনের দিকে চোখ ফেরায়, পড়তে চেষ্টা করে তার ভাষা। আনেৎ-এর

পাশে ব'সে ব'সে ও মিনতি-ভরা ব্যগ্র চোখ দিয়ে ওই ছোট্ট রহস্যটুকুর অতল তল খোঁজে। পায় না, অশান্ত হ'য়ে ওঠে। ভারী কৌতুক লাগে আনেৎ-এর মানুষটার এই অস্থিরতা, এই ভীরু ভীরু ভাব, আর ওর প্রতিটি নড়া-চড়ার দিকে তাকিয়ে থাকার এই মর্মান্তিকতা দেখে। এমন অবস্থা রোজারের আর কোন দিন দেখেনি আনেৎ। ওর মনটা নাড়া খায়। ভাবে, আর ঝুলিয়ে রাখা নয় বেচারীকে। একটা জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান করতে পারে যে কথাটা, তা ওর জিভের ডগায় প্রায় বেরিয়ে আসে। কিন্তু কি ক'রে যেন শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যায়। চরম-সংকটটির পাশ কাটিয়ে ও যেন যাদুর জোরে বেরিয়ে আসে···

তারপর। তারপর ফাঁদের মুখ বন্ধ হ'য়ে যায়। পাশের ঘরে মা মেয়ে কখনও নিঃশব্দে বসে তাদের নিষ্ফল দৌত্য সম্বন্ধে ভেবে অস্থির হন; কখনও বা ছল ক'রে ড্রইং-রুমের ভেতর দিয়ে হেঁটে যান। যাবার সময় অমায়িক হেসে দু' একটা সৌজন্যের কথা ব'লে যান। আসল মানুষ দু'টির বিশ্রম্ভালাপে ছেদ পড়ে না।

সে-দিন সন্ধ্যাবেলা একটা ছবির য়্যালবামকে সাক্ষী-গোপাল সামনে রেখে তার ওপর আঙুল চালাতে চালাতে নিচু-স্বরে কথা বলছিল ওরা দু'জন মশগুল হ'য়ে। হঠাৎ কথা বন্ধ হ'য়ে যায়। আনেৎ যেন বিপদের গন্ধ পায়। ও উঠতে চায়, কিন্তু চোখের পলকে রোজার ওকে বাহু-পাশে বন্ধ ক'রে তার কম্পিত উষ্ণ ঠোঁট দু'টি ওর ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠের ফাঁকে চেপে ধরে। আনেৎ আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু কাকে রক্ষা করবে? ও নিজেই যে নিজের শত্রু! সরে যেতে চায়, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বসে ওর ওষ্ঠ; চুম্বনে চুম্বন মিলে যায়।

হঠাৎ ড্রইং-রুমের প্রান্ত থেকে শোনা যায়:

'বেঁচে থাক লক্ষ্মী মা আমার, আশীর্বাদ করি।' ডাক শোনা যায়:

'ও আদেল···ও কর্তা, কোথায় গেলে সব!'

আনেৎ স্তম্ভিত বিমূঢ়। নিমেষের মধ্যে গোটা ব্রিসট্ পরিবার ওকে ঘিরে ফেলেছে। সকলের চোখে গদগদ ভাব। মা আনেৎকে জড়িয়ে ধ'রে কেবলি চুমু খান আর ঘন ঘন রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলেন:

'রোজারকে ছেড়ে দিস্‌নে মা, একটু ভালোটালো বাসিস্।'

আদেল ডাকে : 'বৌদি!'

আর কর্তা—অনর্থ বাধাইতেই আছেন। বলে বসেন : 'বাপ্‌স্! এতদিন লাগল!'

রোজার নতজানু হযে ব'সে উদ্‌ভ্রান্তের মত আনেৎ-এর হাতে চুমু খায়, আর সলজ্জ ভীক স্বরে কাকুতি করে : 'আর না বলোনা আনেৎ···বলোনা···'

আনেৎ পাথরের মত শক্ত হ'য়ে বসে আছে। রোজারকে বাধা দেবার শক্তি নেই। প্রিয় আঁখি-ছুটির কাতর দৃষ্টি ওর শেষ বাধটুকুও ভেঙ্গে দিতে চায়। তবু একবার শেষ চেষ্টা··শেষ প্রতিবাদ··[কি বলছ তোমরা? আমি তো বলিনি কিছু? আমি—]

কিন্তু রোজারের দৃষ্টিতে ঘন হ'য়ে উঠেছে যে বেদনা, তাতে তো মিথ্যে নেই, ছলনা নেই,—এ যে তার মর্ম-মূলের! সইতে পারল না আনেৎ। সুখে রোজারের মুখ আলো হ'যে ওঠে। সেই আলোয় আলোকময়ী হলো আনেৎ। রোজারের মাথাটি তার দুই হাতের আলিঙ্গনে তুলে নিল। সুখাশ্রু-ধারায় অন্তরের ভার হাল্কা হ'য়ে গেল রোজারের। চুম্বনের অক্ষরে, স্বজনদের দৃষ্টির সাক্ষ্যে স্বাক্ষরিত হ'লো তাদের বাগ্‌দান।

[নয়]

রাত্রিবেলা নিজের ঘরে নিজেকে একা পেয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল আনেৎ। একি হ'য়ে গেল? ও আর নিজের নয়? ও দত্তা! দান ক'রে দিয়েছে নিজেকে? স্বত্ব ত্যাগ ক'রে? একেবারে নিঃশেষে?···বেদনায় ওর অন্তর কুঁকড়ে যায়।

এই একটু আগের স্বীকার-করা বন্ধনটাকে ওর বড় কঠিন মনে হয় এখনই। বিবাহ বিচ্ছেদের চাবি হাতের মুঠোয় রেখে প্রেম নিয়ে খেলা করবার মেয়ে ও নয়। ও এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে নিতে জানে না। ও জানে নিজের

ওপর মালিকানা হারিয়েছে ও। ও আজ ত্রিসট্‌দের সম্পত্তি। হঠাৎ ঐ লোকগুলোর উপর ওর মন বিষিয়ে ওঠে! এক সপ্তাহ ধরে ওদের ব্যাপারে যা দেখল, এই মুহূর্তে শত গুণ বেড়ে তা ওর মনকে ছেয়ে ফেলল। ওকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্য এক জোট হ'য়ে কি বিশ্রী কাণ্ডই না ক'রে ছাড়ল ওরা, ওর স্বাধীনতা হরণ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল ওরা। আর শেষ পর্যন্ত ফাঁদে ফেলে ওর সম্মতি আদায় ক'রে নিয়েছে! [রোজার···রোজারও কি ছিল সেই ষড়যন্ত্রে?]···

শিকারীর তাড়া-খাওয়া জন্তুর মত কোণ-ঠাসা হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখে আনেৎ শত্রু ব্যূহ ক্রমশঃ ছোট হ'য়ে ঘিরে আসছে; আর আশা নেই। মাথা নিচু ক'রে অন্ধ বেগে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়তে চায় মরণ না-হয় মারন পণ ক'রে। ত্রিসট্‌দের যা কিছু ওর এত দিন খারাপ লেগেছে, যে সব কথা ও এড়িয়ে গেছে, কানে তোলেনি—সব আজ সহস্র গুণ বড় আর কুৎসিৎ হ'য়ে ভেসে ওঠে। ঘৃণায়, দুঃখে ওর অসহ্য লাগে। রোজারও আছে এদের মধ্যে? আছে সে? ঐ লোকটা, তার পরিবার, তাদের আশা-আকাঙ্খা যা ওর নয়, হবে না কোন কালে, ওর সাথে কোথাও যার মিল নেই, তার মধ্যে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে ও বাঁচবে কি ক'রে? না, তা পারবে না। বাঁধন ছিঁড়বে আনেৎ।

কিন্তু সবে বাগ্‌দান হ'য়েছে—এরই মধ্যে? রাজী হবে রোজার? হতেই হবে। সাধ্য কি তার ওকে ধরে রাখে।···বাধা দিতেও বা পারে সে···কথাটা মনে হ'তেই কেমন ঘৃণা হয় ওর রোজারের ওপর। এই মুহূর্তে ও অবলীলায় তার বুক ভেঙে দিতে পারে নিজের মুক্তির জন্য, কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি দুঃখ-ব্যথার কথা ভাবতে পারছে না ও···মনে প'ড়ে যায় রোজারের মিনতি-ভরা দৃষ্টি··· চমকে ওঠে ও···হোক্। তাকাবে না ও ওদিকে···নিমজ্জমান মানুষের বাঁচার তাগিদ, তার সহজাত আত্ম-সংরক্ষণ প্রবৃত্তি আজ দয়া মায়া কোমলতা সব কিছুকে ছাড়িয়ে ওপরে উঠল। বাঁচাতেই হবে ওকে। বাধা যে দেবে তার ভালো হবে না।

সারা রাত ঘুম হ'লো না। অস্থির ভাবে এ পাশ ও পাশ ক'রে বিনিদ্র প্রহর কাটে। বাঁধন-ছেঁড়ার পালায় রোজারের সঙ্গে কোন্ দৃশ্যের অবতারণা

হবে, অন্ধকারের পটে তার ছবি আঁকে শুয়ে শুয়ে। দু'জনের মধ্যে কি কথা হবে বারে বারে আউড়ে আউড়ে দেখে। প্রথমটায় বোঝান। তারপর তর্ক; তারপর রাগ, কাকুতি মিনতি। সর্ব-শেষ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। রাত ভোর হয়। ক্লান্ত অবসন্ন আনেৎ, কিন্তু ওর সংকল্প স্থির হ'য়ে গেছে। ও যাবে নিজে, রোজারের বাড়ীতে গিয়ে ব'লে আসবে। না থাক, চিঠি লিখে দেবে। বলতে গেলে বেধে যায়। কলমের মুখে খস্ খস্ ক'রে বক্তব্য অবলীলায় লিখে ফেলা যায়। বাঁধন ওকে ছিঁড়তেই হবে। চিঠি পেয়েই ব্রিসট্রা ছুটে আসবে নিশ্চয়। তাদের সামনে থাকা চলবে না। ও চ'লে যাবে প্যারী ছেড়ে, শহরতলীর কোন ছোট হোটেলে ক'টা সপ্তাহ কাটিয়ে আসবে। উঠে সত্যি চিঠি খানা লিখে ফেলল—কি লিখবে তা তো মুখস্থ হ'য়েই ছিল রাতে, কাজেই দেরী হ'ল না, কলম চলল তীরের বেগে।

তারপর গোছাতে বসল। ঘর ময় সব ছড়িয়ে আছে। এমনি সময় এল রোজার। তাই তো দরজাটা বন্ধ ক'রে রাখার কথা তো মনে হয়নি। তা ছাড়া ভোর না হ'তেই লোকটা এমনি ছুটে আসবে, তাই বা কে জানতো! মনের ঝোঁকে তর্ সইল না, ভৃত্য এসে খবর দেবার আগেই অতিথি এসে উঠল ঘরে। ফুল নিয়ে এসেছে...আনন্দে কৃতজ্ঞতায় ভরা অন্তর টলমল করছে ওর, ঝলমল্ করছে সারা সত্তা। এত সুন্দর, এত মনোহর, ভালোবাসা যেন গলে গলে পড়ছে চোখ মুখ থেকে...আনেৎ-এর মুখে কথা সরে না। ...সমস্ত সংকল্প ভেসে যায়। প্রথম দৃষ্টিপাতেই আবার হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁঠ-ছড়া পড়ে। আশ্চর্য কুহক ভালোবাসার। এতক্ষণ ধ'রে বিবাহের বিরুদ্ধে কত যুক্তিতে শান প'ড়েছিল, তারা সব পাল্টে এল বিবাহের সপক্ষে। যুদ্ধং দেহি বলতে চাইল ও। কিন্তু বিনিদ্র উত্তেজিত রাত্রির তামস স্বাক্ষরের বলয়ে ওর দুই চোখ আনন্দে জ্বলে উঠল। রোজার! আমার রোজার! মাতাল দৃষ্টি দিয়ে আনেৎ-এর রোজার পান করছে তার প্রিয়াকে। আনেৎ দেখে দেখে ভাবে: 'আমি যেন মন স্থির ক'রে ফেলেছি...মানে, করতেই হবে এখন...কিন্তু, স্থির? কি স্থির?'

কেমন ক'রে জানবে আনেৎ তার দয়িতের পিয়াসী দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে কি সংকল্প ক'রেছে তার মন! ভাববে? কেমন ক'রে ভাববে? কেমন ক'রে

নিজেকে ফিরিয়ে পাবে আনেৎ !···জানে না, তাও জানে না আনেৎ। ও ডুবছে, ডুবছে, একেবারে ডুবছে···কিন্তু···ভালোবাসে? রোজার ওকে ভালোবাসে? আনেৎ প্রিয়া! এত ভালো লাগছে মনে করতে! ও আর কিছু বলতে পারবে না, একটি কথাও না। শুধু বললে রোজারকে বিয়ের জন্য তাড়াহুড়ো যেন না করে। নিমেষে মুষড়ে পড়ে রোজার। ওর সমস্ত মুখ কালো হ'য়ে যায়। আনেৎ থেমে যায়। এ ছেলেকে আঘাত দেওয়া যায়! ব্যস্ত হ'য়ে বারংবার ব'লে: 'ভালোবাসি, ভালোবাসি।' বিয়ে পেছুবার কথায় প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ করে রোজার; এ যেন তার জীবন-মরণের সমস্যা। ক্ষীণ হ'য়ে আসে আনেৎ-এর আবেদন।

শেষ পর্যন্ত মিটে আপস—গ্রীষ্মের মাঝামাঝি বিয়ে।

রোজার চ'লে যায়। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আনেৎ। ভীরু দৃষ্টিতে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকায়। সেই আগেকার অনবস্থিত চিত্তের ছায়া মুখে! কি ক'রে রেহাই পাওয়া যায়? অসমাপ্ত বাক্স গোছানটাই শেষ ক'রে ফেলা যাক!

'চমৎকার! চমৎকার!' কাঁধ নাচিয়ে হাসে আনেৎ।—কি সুন্দর দেখতে রোজার!—ট্রাঙ্কে রাখার জন্য যে-সব জামা কাপড় আলমারী থেকে বেরিয়েছিল স্ব-স্থানে ফিরে যায় তারা···

'কিন্তু সে যাই হোক, আমি চাইনে, চাইনে!' ও ভাবে।

হাত কেঁপে এক প্রস্থ জামা কাপড় পড়ে যায়।···ওদিকে ধপ ক'রে প্রসাধনের জিনিসগুলিও পড়ে।—দুত্তোর! অসহিষ্ণু ভাবে মাটিতে পড়া স্তূপটার উপর লাথি মারে ও···

নীচু হ'য়ে কুড়িয়ে নেয় জিনিসগুলি। আধপথে ওর হাত থেমে যায়। মাটির ওপর অবসন্ন ভাবে বসে পড়ে···মন কেন শক্ত ক'রে রাখতে পারে না ও!···

'দূর হোক্, ছাই!' গালিচার ওপর হাত পা ছড়িয়ে লম্বা হ'য়ে শুয়ে নিজের মনেই ঝংকার দিয়ে ওঠে: 'চারটে মাস তো সামনে আছে বাপু। মন বদলাবার যথেষ্ট সময় আছে—'

উপুড় হয়ে প'ড়ে বালিশে মুখ গুঁজে ও দিন গোনে···

[দশ]

ক্রিস্‌টের়া হিসেব ক'রে দেখলেন আনেৎ-এর বিয়ের তারিখ পিছানোর প্রস্তাবে মত দেওয়াই বিবেচনার কাজ হবে। তাড়াহুড়ো করলে আসলই হয়তো বানচাল হ'য়ে বসবে। কিন্তু তাই বলে মাঝের মাস ক'টা আনেৎকে একা ছেড়ে দেয়া চলবে না। ওকে আগ্‌লে রাখতে হবে। যা অদ্ভুত খামখেয়ালী মেয়ে—কখন কি ক'রে বসে।

ইষ্টারের আর দেরী নেই বেশী। আনেৎ ওদের সঙ্গে দেশের বাড়ীতে গিয়ে ছুটি কাটানোর নিমন্ত্রণ পেল। আনেৎ স্বীকার করল: কিন্তু দ্বিধা রইল। এক দিকে লোভ, আর একদিকে ভয়; কে জানে যদি ফাঁস আরও শক্ত হ'য়ে গলায় বসে! যদি একেবারে বন্দী হয়! যদি আবার সব ভেঙ্গে চুড়েই যায়! এ ছাড়াও ভয় করে—আরো সাংঘাতিক ভয়···মনে আনতে চায়না আনেৎ। সংশয়ের এই দোলার মধ্যে আরামে দোল খায় আনেৎ। এ ছেড়ে ও পালাতে চায় না। একটু ক্লেশ হয়—কিন্তু ভারী রোমাঞ্চ আছে। যতদিন চলে চলুক না। কিন্তু বোঝে, ভালো হচ্ছে না। রোজারের সামনে দাঁড়িয়ে অনিশ্চয়তার দোল খাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়।

শেষ পর্যন্ত ঠিক করল, সিল্‌ভীকে বলবে খুলে। হয়তো পথ দেখাতে পারবে ও। আজ পর্যন্ত রোজারের বিষয় একটি কথাও ও তাকে বলেনি। অথচ সব কথাই ও খুলে বলে সিল্‌ভীকে। তার কাছে ওর গোপন নেই কিছু। অন্যান্য ছেলে বন্ধুদের কথাও বলেছে—কারণ তাদের তো ভালোবাসেনি আনেৎ।

শুনে সিল্‌ভী চিৎকার ক'রে ওঠে: 'ও দিদি, ডুবে ডুবে এত জল খেয়েছিস্‌!'

হেসে গড়িয়ে আনেৎ ওকে বোঝাতে চেষ্টা করে ওর সমস্যা আর সংগ্রাম। সিল্‌ভী জিজ্ঞাসা করে: 'আচ্ছা দিদি, যে পাখীটা ধরলি, কেমন দেখতে? খুব সুন্দর?'

'নিশ্চয়।' আনেৎ জবাব দেয়।

'তোমাকে ভালোবাসে?'

'হুঁ।'

'আর তুমি?'

'বাসি, বই কি।'

'তাহ'লে আটকাচ্ছে কোথায়?'

'মুস্কিল তো ওখানেই! কি ক'রে বোঝাব তোকে?···আমি সত্যি ভালোবাসি ওকে···ভয়ানক ভালোবাসি···এত সুন্দর ওর সব···!' [বর্ণনা ক'রতে বসে যায় আনেৎ। সিল্‌ভীর চোখে বাঁকা হাসি খেলে। তারপর হঠাৎ থেমে যায়···]

'আমি ভয়ানক ভালোবাসি ওকে···সত্যি ভয়ানক···আবার ভালো-বাসিওনা···ওর ভেতরে এমন কতগুলি জিনিস আছে···থাকা চলে না ওর সঙ্গে···কোনোমতে না···কিন্তু ও যে আমায় বড় বেশী ভালোবাসে। পারলে হয়তো গিলে ফেলে আমায় একেবারে···'

[সিল্‌ভী আবার হো হো ক'রে হেসে ওঠে।]

'···সত্যি বল্‌ছি তোকে, পারলে ও খেয়েই ফেলে আমায়, একেবারে গিলে ফেলে···কেবল আমায় কেন, আমার গোটা জীবনটা—তার যত চিন্তা, যত স্বপ্ন সব সুদ্ধ। এমন কি আমার নিশ্বাসটুকু অবধি···সব, সব···। ভারী খাইয়ে রোজার, জানিস্! খাবার টেবিলে যদি দেখতিস্! সত্যি ভারী চমৎকার লাগে ওর খাওয়া···বেশ প্রচুর ক্ষিদেটি আছে···কিন্তু তাই বলে আমায় ও খাবে তা আমি মোটেই চাই নে।'

আবার হাসিতে ফেটে পড়ে সিল্‌ভী। দিদির কাঁধে মুখ গুঁজে দমকে দমকে হাসে। আনেৎ বলে চলে: 'জ্যান্ত তোকে গিলে খাচ্ছে কেউ, ভাব তো! কিচ্ছু থাকছে না···না তুই, না তোর কিছু···চেষ্টা করছিস, কিন্তু রাখতে পারছিস্ না কিছু। কেমন লাগে ভাবতো!···ওর মনেই হয় না এসব কথা। ওর কি খেয়াল আছে যে সত্যি আমায় গিলে ফেলছে ও···শুধু উন্মাদের মত ভালোবাসে। আমার মনে হয়, ওর ভালোবাসায় ঢেকে গেছি

আমি, ও নিজেও। সে ঢাকনা তুলে আমায় দেখবার চেষ্টা করেনা ও। করবার কথা মনেও হয় না। ও আসে…দুহাত ভ'রে নেয়…সে-নেয়ার সাথে আমায় সুদ্ধ নিয়ে যায়…'

'বাঃ, চমৎকার!' সিল্‌ভী বলে।

ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আনেৎ বলে : 'কেবল বাজে কথা।'

'বেশ তো, আসল কথাটা কি, তাই বল না!'

'বিয়ের কথা। শক্ত জিনিস। ভালো ক'রে ভাবা দরকার।'

'শক্তটা আর কোথায়! আমার তো মনে হয় একদম জল।'

'তুই বলছিস্ কি সিল্‌ভী! সহজ কথা হ'লো! তোর ব'লে কিছু থাকবে না। নিঃশেষে সব দিয়ে দিতে হবে, আর বলছিস্ কিনা জল!'

'সব দিবি কেন? কে বলছে সব দিতে হবে? তোর মাথা খারাপ!'

'ও যে সব চায়—!'

সিল্‌ভী পরম কৌতুকে মাছের মত ছল্ ছল ক'রে ওঠে। বলে : 'বোকা, বোকা, আস্ত বোকা তুমি একটি। খুকুমনি, দুদু খাবে!'

[যা খুশি মানুষ চাক, তোমার যা দেবার দেবে। যা রাখবার রেখে দেবে। অত বলা কওয়ার দরকারটা কি…এই হ'লো সিল্‌ভীর সোজা আর সহজ হিসেব। পুরুষ এবং তাদের দাবীকে ও কেমন একটা সস্নেহ শ্লেষ মিশিয়ে দেখে। লোকগুলো চায় মেলাই…কিন্তু মগজে বুদ্ধি কিছু কম।]

'মোটেই খুকু নই আমি।' আনেৎ বলে।

'নয় তো কি! সব জিনিস এত সত্যি ব'লে নাও কেন?…' সিল্‌ভী বলে।

আনেৎকে স্বীকার করতে হয়। 'সত্যিরে, ঠিকই বলেছিস।…তোর মত যদি হ'তে পারতাম।…তোর কপালই ভালো।…'

'বদলাবে কপালটা, দিদি!'

বদলাবার ইচ্ছা সত্যি আনেৎ-এর নাই। সিল্‌ভী ওকে শান্ত ক'রে রেখে যায়। কিন্তু আনেৎ নিজেকে তবু বোঝে না। নিজের কাছেই হেঁয়ালী।

'কি অদ্ভুত!' ও ভাবে : 'আমি সব দিতেও চাই, আবার সব রাখতেও চাই…এ আবার কেমন…!'

পরের দিন। কাল যাবে, গোছগাছ করছিল আনেৎ। মনের কোণে মেঘ জমে উঠছিল আবার। ভৃত্য এসে সংবাদ দিল মার্সেল ফ্রাংক এসেছেন।

স্বাগত সম্ভাষণ হ'য়ে গেল, মার্সেল তুলল আনেৎ-এর বিয়ের কথা। শুনেছে রোজারের কাছ থেকে। অতি সুষ্ঠু মোলায়েম ভঙ্গিতে অভিনন্দন জানাল—ওর স্বরে, চোখের দৃষ্টিতে ঈষদ্ একটু শ্লেষের আভাস, আবার কেমন মমতা-ভরা। কি যেন আছে ফ্রাংক-এর মধ্যে—ভারী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে আনেৎ। এ যেন সেই সুহৃদ্ যার সব-বোঝা, সব-দেখা, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি তোমার মর্মখানা পড়ে নেবে এক নিমেষে—যার কাছে বলারও প্রয়োজন নেই, গোপন করবার প্রয়োজন নেই ; আধখানা কথাই যার কাছে পুরো কথা হ'য়ে ওঠে—। রোজার-এর ওপর হিংসে হয় মার্সেল-এর। তবু হাসিমুখেই আলোচনা করলে ওর কথা। আনেৎ খুব ভালো ক'রে জানে মার্সেল সত্যি কথা বলে, আরও জানে সে ওকে ভালোবাসে। কিন্তু তাতে বিব্রত হলোনা কেউ। রোজারকে ভালো ক'রে জানে মার্সেল—আনেৎ তার সম্বন্ধে ওকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে। মার্সেল মুখর হ'য়ে প্রশংসা করে। আনেৎ জোর করে—অমন ভদ্রতার খোলস পরিয়ে আলাপ না করলেও চলবে ; ও হাসতে হাসতে বলে আনেৎ তো জানেই রোজার কেমন। ও কি আর বেশী চেনে তাকে! ব'লে এমনি স্থির, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ও আনেৎ-এর দিকে তাকিয়ে থাকে যে লজ্জায় সংকুচিত হ'য়ে ও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। তারপর আবার চোখ তুলে সোজা দৃষ্টি মেলে দেয় মার্সেল-এর দিকে—মার্সেল-এর মুখে একটা প্রখর বাঁকা হাসি—সেই হাসিই বলে দিলে দু'জনেই বুঝেছে দুজনকে। এটা সেটা নানা বাজে কথার পর হঠাৎ আনেৎ বলে, একটু যেন চিন্তিত ভাবেই :

'সত্যি ক'রে বলুন তো, আমি কি ভুল করেছি ?'

'আপনি ভুল করেছেন এমন কথা আমি কি ক'রে ভাবি বলুন তো।' মার্সেল বলে।

'ছেড়ে দিন ভদ্রতা। আপনার কাছে থেকে আমি সত্য কথা শুনতে চাই, এবং একমাত্র আপনিই আমায় বলতে পারেন।'

'আপনি তো বোঝেন আমার অবস্থাটা খুব সুবিধের নয়।'

'আমি জানি তা। এবং এও জানি তাতে আপনার সত্য-বিচারে বাধবে না কোথাও।

'ধন্যবাদ।' মার্সেল বলে।

'রোজার আর আমি দু'জনেই ভুল করেছি, তাই কি আপনার মনে হয়?'

'আমার মনের কথা শুনবেন? আমার মনে হয় আপনারা আত্মপ্রতারণা করছেন।'

খানিকক্ষণ মাথা নিচু ক'রে থেকে আনেৎ বলে:

'আমারও তাই মনে হয়।'

মার্সেল জবাব দিলে না। আনেৎ-এর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

'হাসছেন যে?' আনেৎ বলে।

'আমি জানতাম—আপনার ওই মনে হচ্ছে।'

'আমায় কি ভাবছেন বলুন তো?' আনেৎ ওর দিকে তাকিয়ে বলে।

'আপনার গুরুগিরি ক'রতে আসিনি তো এখানে।'

'না না তা নয়। তবে ওতে আমার নিজেকে চিনবার পক্ষে একটু সুবিধে হ'তো। তাই বলছিলাম।'

'আপনি? শুনুন তা'হলে,' মার্সেল বলে: 'আপনাকে বিদ্রোহী প্রেমিকা বলা চলে। অর্থাৎ হামেশাই আপনি প্রেমে টলমল করছেন, আবার হামেশাই ও নিয়ে নিজেকে চোখ রাঙাচ্ছেন। একদিকে মনে রয়েছে নিজেকে দেবার ক্ষুধা, আর এক দিকে রয়েছে আগলে রাখার টান।'

[আনেৎ চমকে ওঠে, বোঝা যায় সেটা স্পষ্ট—]

'আপনাকে ঘাবড়ে দিচ্ছি, নিশ্চয়ই।'

'না না মোটেই না। বরং উল্টো। অত্যন্ত সত্য কথা বলেছেন। থামবেন না, বলুন, বলুন, আরো বলুন...'

মার্সেল ব'লে চলে:

'একদিকে চান স্বাধীন থাকবেন, আবার একাও থাকতে পারেন না। সঙ্গী চাই। এই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। আপনি অত্যন্ত বেশী জীবন্ত ব'লে, আপনার সঙ্গীর অভাব খুব তীব্র ভাবে মনে হয়।'

'আপনি ঠিক বুঝেছেন আমায়। রোজারও অমন ক'রে বুঝতে পারে না। কিন্তু...'

'কিন্তু আপনি তো তাকেই ভালোবাসেন।'

স্বরে কোনও ঝাঁঝ নেই। অদ্ভুত মনুষ্য-প্রকৃতির কথা মনে ক'রে দু'জনেই কৌতুক অনুভব করে; পরিপূর্ণ আন্তরিকতায় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'জোড়-বাঁধা হ'য়ে বেঁচে থাকা যায়!' আনেৎ বলে।

'অনায়াসেই যেত যদি না যুগ যুগ ধ'রে সময় খরচ ক'রে বুদ্ধি খরচ ক'রে কৌশলে পরস্পরের মুখে লাগাম কষে জীবনটাকে অমন জটিল ক'রে না তুলতো। মন্দ হতো না জীবনটা তাহ'লে। ক্লাসের ভালো ছেলেদের মত স্বভাবতঃই রোজার ও-কথা স্বীকার করতে চায় না। ওরা ভাবে সেকেলে এই সব বিধি-নিষেধের ফাঁস না থাকলেই সর্বনাশ। সব জাহান্নমে যাবে। "সংযম ছাড়া সুখ হয় না" এই হ'লো তাদের মত। আর সংযম মানে তো শুধু নিজের রাশ টানা নয়, আশ পাশের সকলের সুদ্ধ।'

'তা হ'লে বিয়ে সম্বন্ধে আপনার মতটা কি?'

'দুটি মানুষের আশা আকাংক্ষা আনন্দের সুষ্ঠু সমন্বয়ের নামই বিবাহ। আমাদের জীবন দ্রাক্ষা-ক্ষেত, বুঝলেন! ওটা যৌথ সম্পত্তি, আমরা ভোগ করি যৌথ-ভাবে। এক সাথে মাটি চষি, ফসল ফলাই, ডালা ভ'রে ফল তুলি। কিন্তু তাই ব'লে যে হামেশা মুখোমুখি ব'সে সেই আঙুরের সুরা পান করতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। বাস্ পারস্পরিক সহজ সম্পর্কে আমাদের হৃদয়ের দেয়া নেওয়া। আনন্দ চাই, দাবী করি। সেই আনন্দ আবার বিলিয়ে দি; আর কারো মন যদি চায় সংযত হ'য়ে অন্য ক্ষেতে গিয়ে তার ফসল কাটা শেষ করার স্বাধীনতা, তাও ওই আনন্দের মধ্যেই আছে।'

'অর্থাৎ বলুন,' আনেৎ বলে : 'ব্যাভিচারের স্বাধীনতা।'

'ব্যাভিচার! নেহাৎ পুরানো পচা সেকেলে কথা হ'লো ওটা। ও-কথাটা আজকাল অচল। আমি বলতে চাই, যাকে আপনি ব্যাভিচার বলছেন, ব্যাভিচার তা নয়, তা হ'লো ভালোবাসার স্বাধীনতা। ভালোবাসার স্বাধীনতাই আসল স্বাধীনতা।'

'ওসব আমি বুঝি-টুঝি না। বিয়েটাকে আমি সাধারণের পার্ক বলে মনে করি না—যে, যত লোক আসবে যাবে সকলের সংগে ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে চলব ; সকলের কাছে নিজকে বিকিয়ে দেব। দেয়া চলে একজনকে। ধরুন একদিন যাকে ভালোবেসেছিলাম আজ সে দূরের মানুষ। মন হাত বাড়ায় লক্ষ্যান্তরে। তখন তার পথ থেকে একেবারে সরে আসব সব হিসেব চুকিয়ে—বাঁটোয়ারা করতে পারব না নিজকে। ভাগাভাগি আমি সইতে পারিনে।'

মার্সেল একটা বিদ্রূপের ভঙ্গি করে, যেন বলতে চায়: 'তাতে হ'লোটা কি ?...'

আনেৎ ব'লে চলে :

'সুতরাং দেখছেন, আমি এই শেষে যা বললাম সে-হিসেবে আপনার চেয়ে মোজারের সঙ্গেই আমার মিল বেশী।'

'তাহ'লে আপনিও দেখছি সনাতনী, অর্থাৎ সেই যে বলেছে "আমি তোমার পায়ের বেড়ী, তুমি আমার গলার ফাঁস" কেমন ! দু'জনেই দু'জনকে আচ্ছা ক'রে বেঁধে রাখবেন।' মার্সেল জোর দিয়ে বলে।

'ওই তো সৌন্দর্য। বিবাহের আসল রসই হ'লো একনিষ্ঠতা। অর্থাৎ তুমি আমার একমাত্র, আমি তোমার অদ্বিতীয়া। বিশ্বাসের সোনার সুতোয় দু'টি হৃদয় এক ক'রে বাঁধা। আসলই যদি নষ্ট হয়, সুদের কি দাম বলুন !'

'কমই বা কি ?'

'না না এতটুকুও দাম নেই ; আসল যা গেল তার কতটুকু ক্ষতিপূরণ হয় ওতে ?'

'বেশ তো, তাই যদি হয়, তাহ'লে আর নালিশ কিসের আপনার ! নিজের হাতেই তো দেখছি দোর আঁটছেন।'

'নিজের স্বাধীনতা বিলিয়ে দিতে মোটেই রাজী নই আমি। কিন্তু তাই ব'লে হৃদয়ের বেলায় স্বেচ্ছাচারও চাইনে। হৃদয় নিয়ে উঞ্ছবৃত্তি ভালো লাগে না আমার। ওটি যাকে দিলুম তো দিলুমই। চিরকাল তার জন্য আগলে রাখব। সে-ক্ষমতা আমার আছে।'

'সত্যি আছে ?' শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করে মার্সেল।

তাই তো! কেমন যেন সংশয়ে নড়ে ওঠে মনটা। কিন্তু মার্সেলের সামনে দুর্বলতা প্রকাশ করা চলে না। বলে :

'নয় তো কি! ও তো স্রেফ ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার।'

'সেকি? হৃদয়ের ব্যাপারেও হুকুম! তাহ'লে তো ডগডগে লম্বা আগুনকেও বলা যায়—তুমি সবুজ হ'য়ে যাও! বুঝলেন, প্রেম হ'চ্ছে একটা আলোক-স্তম্ভের মত। পেছনের আগুন বদলায়, কিন্তু আলোটি চিরন্তনী।'

ঘাড় বাঁকিয়ে আনেৎ বলে :

'হ'তে পারে তা; কিন্তু ও-বিধি আমার জন্য নয়। আমি ও মানিনে।'

অথচ আনেৎ জানে, মানে ও বিশ্বাস করে পরিবর্তন কত দরকার একটা জাগ্রত, জীবন্ত, বলিষ্ঠ জীবনের পক্ষে। এবং পরিবর্তন-শীলতার সাথে সাথে চাই স্থিতি। এই দুই বিপরীত ধর্মের যে-কোন একটাতে গোলযোগ ঘটলেই বিপদ ঘটে।

এই অহংকারী, জেদী মেয়েটিকে মার্সেল চিনে নিয়েছে ভালো ক'রে। তাই কো'ন প্রতিবাদ করলে না ওর কথায়। অতি শিষ্টভাবে মাথাটি ঝোঁকাল শুধু, যেন মেনে নিয়েছে আনেৎ-এর কথা।

লজ্জা পেল আনেৎ। বলল :

'দেখুন, আসলে আমি চাইনে...'

সত্যটাকে স্বীকার ক'রে নিতে চায় মন। বুকে যেন বল পায়। মনে হয়, এবারে ও নিশ্চিত ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এবারে আর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে না। কথায় বিশ্বাসের সুর লাগে। দৃঢ় কণ্ঠে বলে :

'কি চাই জানেন? চাই ভালোবাসায় থাকবে মুক্তি। ভালোবাসা আগল দেবে খুলে, বাঁধবে না। আপনাকে স্বরূপে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করবার, বিকশিত করবার, আপন সত্যকে খুঁজে নিয়ে সেই পথে চ'লবার অধিকার তাকে কখনও খোয়াতে হবে না। এক কথায় নিজস্ব সত্তার সত্য পরিচয়টি খুঁজে নেবার পথ তার সর্বদা নিরঙ্কুশ থাকবে, কারো কাছে তাকে আত্ম-বিসর্জন দিতে হবে না। এমন কি প্রিয়জনের কাছেও না। অন্তরাত্মাকে ছোট করার অধিকার কারো নেই। এর বাড়া পাপ নেই।'

'কথাগুলো শুনতে তো বেশ ভালোই,' মার্সেল বলে : 'কিন্তু আমার আত্মাটি আমার নাগালের বাইরে, ফ্যাসাদ তো সেখানে। রোজারের হয়তো আমার মত দুরবস্থা হয়নি। কিন্তু তবু ভয় হয় কোথায় জানেন? আপনার দৃষ্টিভঙ্গি রোজারের সাথে নাও মিলতে পারে। ব্রিসট্‌দের যতদূর জানি, আত্মা-টাত্মার ধার তারা ধারে না। রাজ-নীতি, অর্থ ও স্বার্থ নিয়ে ওদের কারবার। ওরা আর কিছু বোঝে না বড় একটা।'

'হ্যাঁ, ভালো কথা,' হাসি-মুখে আনেৎ বলে : 'কাল আমি বারগাণ্ডি যাচ্ছি ওদের ওখানেই। সপ্তাহ দু' তিন থেকে আসব।'

'ভালোই হ'ল। দু' পক্ষের মতামত, আদর্শ একেবারে মুখোমুখি পরখ হ'য়ে যাবে। ভারী আদর্শবাদী ওরা। বেশ মিলে যাবে হয়ত দু'জনের। আমারই ভুল হ'য়ে থাকবে।'

'দাঁড়ান না,' আনেৎ বলে : 'যখন ফিরব, দেখবেন একেবারে একখানা আস্ত ব্রিসট বনে গেছি।'

'দোহাই আপনার! ওটি করবেন না। আমাদের আনেৎটিকেই আমরা ফিরিয়ে চাই। ওটিকে খোয়াবেন না।'

'পারছি কোথায় খোয়াতে! পারলে যে বেঁচে যেতুম।'

'বড় দুঃখের কথা!··· এবার যাই বলুন।'

বিদায় নেয় মার্সেল।

দুঃখের কথাই বটে, কিন্তু মার্সেল যা ভেবেছে সে দিক থেকে নয়। মার্সেল ওকে দেখেছে নিরীক্ষণ ক'রে, কিন্তু লাভ হয়নি; কারণ আনেৎকে বোঝেনি ও; রোজারও বোঝেনি। ওকে বোঝা এই সব ফরাসী যুবকদের কাজ নয়—আরো 'ধর্ম-নিষ্ঠ' আত্মা এবং ধর্ম-নিষ্ঠ মুক্ত মন চাই। কিন্তু আসলে তা তো হয় না। যা চ'লে এসেছে ক্যাথলিক শাস্ত্রের রেওয়াজ হিসেবে—ধার্মিক হওয়া মানে ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে শাস্ত্রের বিধান মানতে হবে চোখ বুঁজে ইনটেলেকচুয়েল স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে [বিশেষতঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে]। আবার এর উল্টো আছে—স্বাধীন মতওয়ালারা আত্মাকে তুড়িমেরে উড়িয়ে দেয়। আত্মারও একটা দাবী আছে এবং সেই দাবী যে কত গভীর, তা তাদের মনেও আসে না।

[এগার]

পরের দিন এসে পৌঁছোয় আনেৎ। গাড়ী নিয়ে রোজার এসেছে বারগান্ডি ষ্টেশনে। ওকে দেখতেই আনেৎ-এর চিন্তা, ভাবনা, ভয় সব মুহূর্তে উড়ে গেল। দু'জনেই আনন্দে আত্মহারা। রোজারের মা দিদিরা, হয়তো খুঁজে বাড়ীতেই রয়ে গেছেন। ভালোই হয়েছে।

স্বচ্ছ বাসন্তী সন্ধ্যা। চষা-মাটি আর নূতন তৃণের আ-তরঙ্গায়িত বিস্তারকে ঘিরে সোনালী দিগ্বলয়। লার্কের দল গানে গানে মাতাল। গাড়ীটা ছুটে চলেছে তীব্র বেগে—বাতাস যেন চাবুক মারছে মুখে গালে। তরুণ সাথীর অতি কাছে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় বসে আছে আনেৎ। রোজার গাড়ী চালাতে চালাতে কথা বলছে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে। হঠাৎ ঝুঁকে প'ড়ে ও চুমু খায় আনেৎকে। বাধা দেয় না আনেৎ—ভালোবাসে সে রোজারকে। ভালোবাসে! একটু পরেই তো বিচার ক'রতে ব'সবে—তাকেও, নিজেকেও, এ বুঝতে ওর বাকী নেই। তা, ক'রবেই তো বিচার! বিচার আলাদা, ভালোবাসা আলাদা। ভালো ও সত্যি বাসে রোজারকে—যেমন ভালোবাসে এই আকাশ, বাতাস, মাঠের ঘন-সুগন্ধকে; রোজার যেন এক টুকরো বসন্ত। মনের সঙ্গে বোঝা পড়া কাল—আজ ছুটি। আজের এই অপূর্ব ক্ষণটিকে দেহ মন প্রাণ দিয়ে পরিপূর্ণ ক'রে গ্রহণ করা শুধু। আর কোন দিন আসবে না এ মুহূর্তখানি।...আনেৎ-এর মনে হয় যেন কোন ঊর্ধ্ব-লোকে উধাও হ'য়ে চ'লেছে ওরা।...

শেষের বাঁকটা ঘুরেই চড়াই একটা, তারই ওপরে বাড়ী। জোরে রাশ টেনে দিলে রোজার। কতক্ষণ কে জানে। তবু বাড়ী পৌঁছে মনে হ'ল, বড্ড তাড়াতাড়ি এসে গেছে।

ব্রিসটরা অতি সন্তর্পণে পা পা ক'রে চললেন। যত্নে বাছাই করা, অতি হাল্কা নরম নরম কথার কৌশলে ওর মনকে নাড়া দিয়ে বাবার স্মৃতিকে জাগিয়ে তুললেন। ওকে নিয়ে কি যে ক'রবে ওরা ঠিক পায় না। প্রথম দিন ও বাধা

দিলে না। নিজেকে ওদের হাতেই ছেড়ে দিলে। মন্দ লাগে না—বহুদিন গৃহের স্বাদ পায়নি। পায়নি কোন স্নেহ-পরিবেশের কোমল উষ্ণ স্পর্শ। আনেৎ অবশ্য জানে এ সব ভুঁয়ো। তবু ইচ্ছে ক'রেই ও ফাঁকিতে গা ভাসাবে আজ। ত্রিসটদের আনুকুল্যে ওর অসুবিধাও হয় না। ওর প্রতিরোধ শক্তি ঘুমিয়ে পড়ে।…

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। বহুকালের পুরানো বাড়ী। নিঝ্‌ঝুম চারদিক। একটা ইঁদুর কুট্‌কুট্‌ ক'রে কি যেন কেটে কেটে চলেছে…তার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ইঁদুর! ইঁদুর! মনে পড়ে ইঁদুরের ফাঁদের কথা। ভাবে: 'আমি ফাঁদে পড়েছি…,' বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। বোঝাতে চেষ্টা করে মনকে…না না ফাঁদে পড়বে কেন? কে চায় ফাঁদে পড়তে…

শরীরটা অবশ হ'য়ে আসে। কাঁধ দুটো ঘামে ভিজে যায়। 'কাল রোজারের সাথে একটা বোঝা পড়া ক'রে নিতেই হবে। আমার সত্যিকারের আমিটাকে ওর বুঝতে হবে। এক সাথে থাকতেই হবে যখন, তখন ভালো ক'রে একেবারে খোলাখুলি পরস্পরকে যাচাই ক'রে নেওয়া দরকার।'

কাল আসে। রোজারকে দেখে আনন্দে ও আত্মহারা হ'য়ে যায়। রোজারের প্রেমে আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে ওর বড় ভালো লাগে। বড় ভালো লাগে ওর হাত ধরে গ্রাম্য উন্মুক্তির বুকে বসন্তের মাতাল-করা রূপ মাধুরী দিয়ে বুক ভ'রে নিতে নিতে সুখের স্বপ্ন দেখা…[হয় তো অসম্ভব, কিন্তু কে জানে, কে জানে? হয় তো হাতের কাছেই আছে…শুধু হাতটা বাড়িয়ে দেওয়া…] আর বলা হয় না। কাল হবে 'খন। কাল…তারপর আবার কাল…আবার…

রাত্রি বেলা—রোজ রাত্রিতে নূতন ক'রে বেদনা জাগে। তীব্র মর্ম-ভেদী বেদনা…নূতন ক'রে বুকে আগুন জলে…

'না, না…আর দেরী নয়। বলতেই হবে…রোজারের ভালোর জন্যই বলতে হবে। ক্রমশঃই বেচারা বেশী জড়িয়ে প'ড়ছে। আমাকেও জড়াচ্ছে। এমন ক'রে চুপ ক'রে থাকার অধিকার আমার নেই…ওকে যে ঠকানো হবে তাহ'লে…'

ভগবান্! ভগবান্! এত দুর্বল আনেৎ! না, দুর্বল সে নয়। এমনি জীবনে ও এতটুকু দুর্বল নয়। কিন্তু প্রেম যে তপ্ত হাওয়ার মত। তপ্ত হাওয়া বইলে জ্বালায় অবসাদে হাড়-পাঁজর যেন চূর্ণ বিচূর্ণ আর হৃদয় অসাড় হ'য়ে যায়...

প্রেমও তেমনি। কি একটা সুখের আবেশে মানুষকে একেবারে ডুবিয়ে, আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। নড়তে ভয় করে...ভাবতে ভয় করে...। আত্মা তার স্বপ্নের জালে জড়িয়ে গুটি মেরে পড়ে থাকে—জাগতে ভয় করে। আনেৎ ভালো ক'রেই জানে একবার একটুখানি নড়লেই এ-স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাবে...

কিন্তু আমরা না নড়লেও, আমাদের হ'য়ে সময় আপনিই নড়ে। এবং ওই নড়াটুকুই যথেষ্ট। তাতেই ভেসে যায় যত ভ্রান্তি। নইলে সব মনের মধ্যে জমে থাকত। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যখন দুটো মানুষকে এক সঙ্গে থাকতে হয়—তখন ক'দিন গেলেই তাদের সত্যি চেহারাটা বেরিয়ে আসবেই আসবে। এর আর এদিক ওদিক নেই। মিথ্যেই পাহাড়া দেওয়া।...

ব্রিসট পরিবারেরও আসল চেহারাটা দু'দিনেই বেরিয়ে প'ড়ল। ওদের হাসিটা বাইরের ভড়ং।

আনেৎ ক্রমে ভেতর মহলে পা দেয়। দেখতে পেল এখানকার বাসিন্দারা ব্যস্ত-সমস্ত পুরো সংসারী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। এদের জগতে উল্লাস আছে—আনন্দ নেই; সেই নিরালোকের স্বাক্ষর এদের চোখে মুখে। ঐশ্বর্য যা আছে, তা আগ্‌লায়, নাড়ে চাড়ে মহা উল্লাসেই। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যেও তেঁতোর স্বাদ আছে। সমাজতন্ত্রের প্রশ্ন এখানে ওঠেই না। ওরা ভৌমিক; ভৌমিক-তন্ত্র ওদের এক-মাত্র উপাস্য দেবতা। অন্য কোন 'তন্ত্র' আর 'বাদের' উপদেবতার প্রবেশ বন্ধ সেই দেউলের আশে পাশে—শুধু পাঁচিল তুলে এদের দিন কাটে। বিশ্বাস নেই কাউকে, অতএব ঘাঁটি আগ্‌লায় নিজের চোখ। অনুজন, পরিজন, চাষী-বর্গাদার, ক্ষেতমজুর, প্রতিবেশী—সন্দেহ কাকেই বা নয়। পাহাড়াদারী খবরদারী প্রায়ই গেরিলা-যুদ্ধে গিয়ে উৎরায়।

খঁ সিয়ে ক্রিসাট ও টিকুটিকিগিম্বি ক'রে ফেরেন। এবং যার পেছনে চোখ একবার গেল তাকে জালে না ফেলতে পারা পর্যন্ত তার নিস্তার নেই। এবং শারণে তার আরম্ভ দেখে কে। কিন্তু তার হাসিটাই শেষ হাসি নয়। প্রতিপক্ষও দুর্বল নয়। কাঁদের শিকার পরদিনই হয়ত সুদে আসলে প্রতিশোধের হিসেব চুকিয়ে কেটে পড়ে। অতএব আবার প্রথম অংক থেকে পালা সুরু··· '

এসব ঝগ্‌ড়া-ঝাটির ব্যাপারে আনেৎকে বড় একটা টানে না কেউ। বসবার ঘরে বা খাবার টেবিলেই বিচার সভা বসে। পারিবারিক এসব সমস্যার আলোচনা এখানেই হয়। আনেৎ রোজার এই টগ্‌বগে আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও একান্ত হ'য়ে থাকে টেবিলের এক অন্তে। দেখে মনে হয় এ-সীমানার কোলাহল ও-সীমানায় পৌঁছোয় না। কিন্তু আনেৎ-এর উদগ্র চিত্ত চোখ মেলে থাকে—সূক্ষ্মতম কথাটিও সে-দৃষ্টির সামনে খোয়া যায় না। রোজারও হঠাৎ তন্ময়তার তল থেকে কখন ছিট্‌কিয়ে পড়ে ওধারের স্রোতে। পরিবারের সাধারণ স্বার্থের টানে যে স্রোত বয়, নিষ্ক্রিয় দর্শক হ'য়ে তার তীরে বসে থাকাই বা চলে কতক্ষণ! তারপর ভারী উত্তেজনা, হাওয়া গরম হ'য়ে ওঠে—বাক্‌-বিতণ্ডা, আলোচনা-সমালোচনায় সকলের উচ্চ কণ্ঠ এক সঙ্গে মিশে যেন তুফান ওঠে। আনেৎ-এর অস্তিত্বও কারো মনে থাকে না। হঠাৎ হয় তো কেউ ওকে সাক্ষী মেনে বসে এমনি বিষয়ে যার বিন্দু বিসর্গও বেচারা জানে না। কখনও বা শেষ মুহূর্তে কর্ত্রীর মনে পড়ে যায় উপেক্ষিতার কথা। স্রোতের মুখে তাড়াতাড়ি পাথর চাপা দিয়ে মন-গলানো হাসি হেসে ওর সামনে এসে বসেন। আশ্চর্য তৎপরতায় কথার মোড় ঘুরিয়ে দেন অপেক্ষাকৃত ফুল বিছানো পথে। সহজ আত্মীয়তার সুরে সহজ আলাপ চলতে থাকে তারপর। ওদের সাধারণ কথাবার্তায়ও সরলে কুটিলে আশ্চর্য মেশামেশি হ'য়ে আছে—যেমন ঔদার্য আর কার্পণ্য এক সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওদের সামন্ত-তান্ত্রিক জীবন ধারায়। খঁসিয়ে ক্রিসট দিল্‌-খোলা, হাসি-মুখ মানুষ। অনুপ্রাসে কথা বলেন। শ্রীমতী এবং পরিবারের অন্য সকলেই কাব্য আলোচনা করেন; এ বিষয়ে পাণ্ডিত্য-মত্ততা ওদের প্রায় সার্বজনীন। রুচির দিক থেকে ওরা আছেন দুই দশক আগের আমলে। তাল রাখতে পারেন না একালের সভ্যতার

সঙ্গে। আর্ট নামের কিছু হ'লেই হ'ল—জোর করেই মতামত বলবেন স্পষ্ট ক'রে। যার কথা বিশ্বে—'ইনস্টিটিউটের' অমুক, বহু খেতাবধারী মহা-পণ্ডিত [যার বিদ্যার পরখ হ'য়ে গেছে—] তাদের 'অমুক বন্ধু', এই কথা বলেছেন। এই পাকা বুর্জোয়াদের দল বাচাইয়ের মুখে প'ড়লে যা তয় পায়, তার কল্পনা করা যায় না। শিল্প রাজনীতি সব বিষয়েই নিজেদের মস্ত বড় পণ্ডিত মনে করে এরা। আসলে কোনটাতেই কানা কড়ির বিদ্যে নেই।

দুই বিষয়েই এরা সেই দলের মানুষ যারা যুদ্ধ জেতায় আগে কখনও যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসে না।

আনেৎ বেশ অনুভব করে এদের আর ওর মনে অনেক তফাৎ। ও দেখে শোনে, নিজেকে প্রশ্ন করে, এদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কোথায়? এদেরই কেউ না কেউ ওর অভিভাবক হ'য়ে ব'সবে ভাবতে ও শিউরে ওঠে না, হাসি পায় ওর। ভাবে, সিল্‌ভী এদের হাতে প'ড়লে কি ক'রত? উঃ কি বিশ্রী চিৎকার করে আর কি জোরে জোরে হাসে এরা। এত চেঁচায় কি ক'রে…!

মাঝে মাঝে বাগানে যখন একা থাকে ওদের হাসি শুনে নিজে হেসে ওঠে। একদিন রোজার শুনে ফেলে ওর মৃদু হাসি। অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে:

'ওকি, অমন একা একা হাসছ কেন? কি হ'লো?'

'কই, কিছু নয়, অমনি।' আনেৎ বলে।

খুব গম্ভীর হ'তে চেষ্টা করে। কিন্তু ক'রলে কি হবে। হাসি ফুলে ফুলে ওঠে। বেসামাল হ'য়ে পড়ে কুমারী আর শ্রীমতী ব্রিসট্-এর সামনেও। আনেৎ বিব্রত হ'য়ে মার্জনা চায়। প্রশ্রয়ের সঙ্গে বিরক্তি মিশিয়ে শ্রীমতী বলেন:

'ওই বেয়াড়া হাসিটি কিন্তু তোমায় ছাড়তে হবে লক্ষ্মী।'

কতক্ষণেরই বা ও হাসি। থেকে থেকেই মেঘের ছায়া ঘনিয়ে আসে। পরম অন্তরঙ্গতায়, পরম আনন্দে ঘন্টার পর ঘন্টা রোজারের সঙ্গ-সুখে কাটিয়ে অকারণে অকস্মাৎ বিষাদে, উদ্বেগে, সংশয়ে মন ছেয়ে যায়। এমনি হচ্ছে গত শরৎকাল থেকে—এলোমেলো হাওয়া বইছে মনের দিগ্‌-দিগন্তে। ওকে ওলট্ পালট্ ক'রে দিচ্ছে সেই হাওয়া। ও স্থির হ'তে পারছে না রোজারকে

'পক্ষে ঘনিষ্ঠতা হবার পর থেকে।" গত ক'মাস আরও বেড়েছে অস্থিরতা—মনটা সারাক্ষণ থাকে ভ্রূ কুঁচকে ; অদ্ভুত কুৎসিত মেজাজ, বাঁকা বাঁকা কথা, মানুষকে অকারণ খোঁচা দেওয়া, অহংকার করা যখন তখন ; অকারণ রাগ···। সামলাতে পারে না ও, ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ওঠে।

অনাবৃত রূপকে দেখে নিয়ে হাতে হাতে রেখে ওরা বলতে পারবে : ''যদসি হৃদয়ং তব, তদসি হৃদয়ং মম···আজ গ্রহণ করলাম তোমাকে, তোমার সর্ব দোষত্রুটি, দেবতা তোমাকে আর দানব তোমাকে, স্বীকার করলাম ছোট বড় তোমার সর্ব প্রয়োজনকে—তোমার জীবনের নিজস্ব ধারাপথকে। তুমি 'তুমিই' এবং সেই তোমার সত্য-স্বরূপের কণ্ঠে এই আমি দোলালাম আমার কণ্ঠের মালা···'

আনেৎ জানে এমনি মুক্তি দিয়ে প্রেমকে বরণ করার বলিষ্ঠতা ওর আছে। গত ক'টা দিন ধ'রে রোজারকেও উল্টে পাল্টে কেবলি দেখেছে। রোজার জানে না ওর দৃষ্টির মুকুরে সব কিছুই অতি স্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পরম নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছে রোজার—নিজের ওপরকার পাহাড়া পড়েছে খ'সে। অতর্কিতে যখন তখন ওর মধ্যেকার 'ব্রিসট'টি অত্যন্ত বে-আব্রু হ'য়ে পড়ে আনেৎ-এর সামনে—। অতটা হয়ত ভাবতেও পারেনি আনেৎ। এ রোজার স্বগোত্রীয়ের স্বার্থ-সংঘাতের সঙ্গে এক···শাঠ্যে এক···তাদেরই মত স্বার্থের রাস্তায় খিড়কীর দুয়ার দিয়ে কাটে দরকার হ'লে। এ রোজার কঠিন হয়, কূট হয়, নীচ হয়—আনেৎ বেদনা পায়। তবু কঠিন হাতে বিচার ক'রতে মন সরে না—যদিও ওর বিচার-শালায় অপর কোন অপরাধীর এ ক্ষমা মিলত না। চরিত্রের এই বিকৃতিগুলোকে আনেৎ রোজারের সত্যরূপ বলে মানে না—এ নকল-করা, ওপরকার জিনিস। ওর অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয় রোজার এখনও শৈশব অতিক্রম করেনি—নিজের পায়ের ওপর স্থির হ'য়ে দাঁড়াতেও শিখেনি—আত্মীয় স্বজনের খবরদারীর মধ্যে নেহাৎই আঁচল-ধরা ছেলে এখনও। মুখে বড় বড় কথা বলে কিন্তু পরম নিষ্ঠায় তাদের পা-ফেলা-পথে চলে ডাইনে বাঁয়ে এতটুকু না নড়ে—মুখ থাকে ভয়ে কালো হ'য়ে কখন ভুল হ'য়ে যায়। আনেৎ বুঝতে শুরু করেছে সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি রোজারের যত বড় বড় আদর্শের কথা তাও নেহাৎ খেলো। কাজে কথায় সামঞ্জস্য নেই, মতিরও স্থিরতা নেই।

আজ কাল আর ওর কথার আড়ম্বরে আনেৎ ভোলে না। ফাঁকটা ধরা পড়লেও আনেৎ-এর রাগ হয় না, কারণ বুঝে নিয়েছে ওটা ফাঁকই, ফাঁকি নয়। অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু রোগ ছাড়ে না। কারণ চেষ্টা করতে গিয়ে উল্টো ফল হয়—একটা প্রতিকূল, অত্যন্ত অস্বস্তিকর শুন্যতার মধ্যে ডুবে যায় ও। কিন্তু ওর স্বচ্ছ বুদ্ধি থাকে অক্ষুণ্ণ। তাই বিস্মিত হয়—ক্ষণে ক্ষণে এ মনোবিকার কেন; কেন এ মেঘ-রৌদ্রের খেলা। মনকে চোখ রাঙ্গায়, কিন্তু কোন ফল হয় না। বিশ্লেষণ করে নিজেকে, দেখে অজস্র অসম্পূর্ণতা রয়েছে নিজের। খানিকটা প্রশ্রয় আসে—আন্তরিক নয়, জোর করা—এই ভাঁড়দের ওপর। [বেয়াড়া মেয়ে, আবার !...না না, আর বলব না, ক্ষমা কর] কারণ রোজারের আত্মীয় এরা। রোজারকে গ্রহণ ক'রলে এদেরও ফেলা চলে না। আর বাদ বাকী। চুলোয় যাক্ আর সব। ওরা দু'জন তো রইল এক পক্ষে, তখন আর কি !

দু'জন! কেবল দু'জন! রোজার কি দাঁড়াবে ওর পাশে! রাখবে ওকে আড়াল ক'রে! আনেৎ রোজারকে গ্রহণ ক'রবে কিনা এ প্রশ্নের আগেও প্রশ্ন হ'চ্ছে রোজার পারবে কিনা। আনেৎ-এর স্বরূপ যখন সে দেখবে তখন কি আন্তরিক ভাবে তাকে স্বীকার ক'রতে পারবে সে ? কারণ এখন কতটুকুই বা ওর দেখেছে সে ! কেবল তো দেখলে ঠোঁট জোড়া আর চোখ দু'টো। কিন্তু সত্যিকারের আনেৎ যে কি ভাবে, কি চায়, তা জানতে বুঝতে রোজার কখনও তেমন চেষ্টা করেছে বা চেয়েছে ব'লে তো মনে হয় না। তার চাইতে আনেৎকে সে তৈরী ক'রে নেবে—তাই বেশী সুবিধের। আনেৎ অবশ্য আশা ক'রে পথ চেয়ে ব'সে আছে—ভালোবাসার শক্তিতেই ওরা ঋজু অকুণ্ঠ দৃষ্টিতে পরস্পরের হৃদয়ের নগ্নরাগকে দর্শন করবে উন্নত-শীর্ষে। রোজার যে আনেৎকে ছলনা ক'রতে চাইছে তা নয়। সে নিজেকেই ছলনা ক'রছে। মিথ্যা হ'লেও, ওই মিথ্যা নিয়েই ও বেঁচে আছে। সুতরাং মনটা বাঁকা হাসি হাসলেও কেমন মায়া হয় ওর জন্য আনেৎ-এর। রোজারের জন্যই ওই মিথ্যাকে সর্ব-প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা ক'রতে, বাঁচিয়ে রাখতেও প্রস্তুত ও। মাঝে মাঝে রোজারের 'আমিটা' অত্যন্ত উৎকট ভাবে অনাবৃত হ'য়ে পড়ে—কিন্তু আনেৎ বোঝে এর মধ্যেও ওর কোনও কৃত্রিমতা বা দুরভিসন্ধি নেই। তাই রাগ হয় না। আসলে লোকটা দুর্বল। ওর দোষই ওর দুর্বলতা। কিন্তু

দেখাবে যেন—ভারী শক্ত ও একেবারে লৌহ-শাসন।...বেচারা রোজার...ভারী করুণ মনে হয় ওর। মনে মনে হাসে আনেৎ; কিন্তু হৃদয়ের খনি-ভাণ্ডারে অফুরন্ত প্রশ্রয় আর ভালোবাসা। শত দোষ সত্বেও ও বোঝে ভালো ছেলে রোজার; উদার, আগ্রহশীল। মা যেমন শিশু সন্তানের ছোট ছোট দোষ ত্রুটি-গুলোকে স্নেহের চক্ষে দেখে স্নেহের শাসন করেন—আনেৎও তেমনি। ও যেন মা, আর ছোট্ট ছেলে রোজার। চরিত্রের যে দোষই থাক, তার জন্য ও দায়ী করে না রোজারকে। বরঞ্চ আরো মায়া হয়, আরও বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। আঃ! কিন্তু আনেৎ-এর চোখে শুধু মাতৃ-হৃদয়ের প্রশ্রয়ই নেই, প্রণয়ীর গভীর পক্ষপাতও আছে। ওদিকে দেহ বাঙ্ময়—জোরাল তার কণ্ঠ। এদিকে মুক্ত বিচার-বুদ্ধির নির্দেশ...কিন্তু শোনার মানুষ শোনে তার মনের রংএ রাঙিয়ে, তাইতে এই দোষগুলি দীপক হ'য়ে ওর কামনাকে জ্বালিয়ে তুলছে। আনেৎ সব স্পষ্ট দেখতে পায়। কোনও উন্মুক্ত স্থানের উঁচু নীচু সমস্ত স্তরকে ভালো ক'রে দেখতে হ'লে মানুষ যেমন মাথা নীচু ক'রে, চোখ আধা বন্ধ ক'রে একটা সামঞ্জস্য ক'রে নেয়, আনেৎও তেমনি রোজারকে এমন এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে যেখান থেকে ওর দোষ ত্রুটিগুলোকে আর অত উগ্র ব'লে মনে হয় না। রোজারের চরিত্র-বিকার থাকলে তাও হয়ত এখন ভালোবাসেত পারে আনেৎ। কারণ প্রেমাস্পদের অসম্পূর্ণতাকে যতই তুমি অন্তরে গ্রহণ ক'রবে, ততই আপনাকে তোমার আরও বেশী ক'রে দেওয়া হবে। আনেৎ ভাবে: 'এই ভালো, তুমি যে সম্পূর্ণ নও প্রিয়, এই ভালো। তুমি যদি জানতে আমার চোখ কি দেখেছে, তবে বিরূপ হ'তে আমার পর।...না_না...ক্ষমা করো! কিছু দেখিনি... কিছু না...। কিন্তু আমি তো তোমার মত নই। তুমিও দেখে নাও আমায়... আমার অসম্পূর্ণতাকে। আমি আমিই এবং তাই থাকব। আমার অসম্পূর্ণতাই আমার সত্যিকার আমি। তারই মধ্যে আমার স্বরূপকে আরো বেশী ক'রে দেখতে পাবে। আমায় যদি চাও, আমার ভালো মন্দ মিশিয়েই আমায় নিতে হবে। পারবে নিতে?...কিন্তু তুমি তো আমায় জানতে চাও না...বলতো কবে সত্যি ক'রে তুমি আমার দিকে চোখ তুলে চাইবে!'

[বার]

এতটুকুও তাড়া নেই রোজারের। আনেৎ অনেকবার চেষ্টা করেছে কথা বলার। কিন্তু বিপজ্জনক ব্যাপারটা থেকে রোজার পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সে-দিন তাই বেড়াতে বেড়াতে কথার মাঝখানেই হঠাৎ থেমে গেল আনেৎ। রোজারের দুটি হাত হাতের মধ্যে নিয়ে বললে :

'রোজার একটু কথা বলা দরকার যে!'

'সে কি! আরো কথা?' হাসতে হাসতে বলে রোজার : 'কথার কিছু কমতি হচ্ছে নাকি?'

'না না, আমি তা বলছিনে! কানে কানে ছুটো মিঠে কথা কওয়া নয়; কাজের কথা।'

রোজারের মুখে ভয়ের ছায়া পড়ে।

'ভয় পাচ্ছ কেন?' আনেৎ বলে : 'আমার নিজের বিষয়েই কিছু কথা ছিল।'

'তোমার বিষয়ে?' শান্ত ভাবে বলে রোজার : 'তাহ'লে তো শুনতেই হচ্ছে; তোমার কথা যে আমার কাছে অমৃত!'

'থামো তো!' একটু উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে আনেৎ : 'শুনেই নাও আগে, তারপর তেঁতো মিঠের বিচার ক'রো। শুনলে আর মিষ্টি বলবে না।'

'কি এমন নতুন কথা গো! আছে নাকি নতুন কথা আরো? আমরা এত কথা বললাম, তাও ফুরোয়নি?'

'আমি আর কোথায় কথা বলেছি!' হাসতে হাসতে আনেৎ বলে : 'যত কথা তো তুমিই বলেছ। আমি তো শুধু মাথা নেড়েছি আর ঠিক! ঠিক! বলেছি। আমায় কিছু বলতে দিলে কোথায়!'

'দুষ্টু মেয়ে!' রোজার তাড়া করে : 'তাই বুঝি! হ্যাঁ—, বলেছি তো বেশ করেছি। কিন্তু বলুন তো মহারাণী, কার স্তুতি গেয়ে এক মুখ আমার পঞ্চমুখ হয়েছে?'

'আমি কি অস্বীকার ক'রছি? আমার মুখের কথাও তো আমার হ'য়ে তুমিই বলো।'

'আমি বুঝি বড্ড বেশী কথা বলি?' সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করে রোজার।

আনেৎ ঠোঁট কামড়ায়।

'না গো না! আমি কি তাই বলছি? তুমি যখন কথা বল, শুনতে আমার ভারী ভালো লাগে। কিন্তু আমার কথা যখন বল আমি শুধু শুনি। এত সুন্দর! এত সুন্দর ক'রে বল তুমি যে আমি মনে মনে ভাবি, তাই হোক্! তাই হোক! কিন্তু সে-সব কথা তো সত্যি নয়!'

'ভারী অদ্ভুত তো! নিজের ছবি সুন্দর হোক মেয়েরা পছন্দ করে না, এই তোমাকেই প্রথম দেখলাম!

'ছবি দিয়ে কি করব?' আমি আমিই থাকতে চাই। তুমি তো সুন্দর ছবি ক'রে আমায় তোমার বাড়ীর দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবে ব'লে আমায় আনোনি! আমি তো ছবি নই—আমি যে জ্যান্ত মানুষ, রোজার, যার ইচ্ছে আছে, দুঃখ সুখ, ভালো লাগা, মন্দ লাগা আছে, চিন্তা করবার ক্ষমতা আছে। তার যা কিছু আছে সব নিয়ে সে তোমার ঘরে আসবে। সে যে পারবেই এ তুমি ঠিক জানো?'

'আমি চোখ বুজে তোমায় গ্রহণ করেছি।'

'কিন্তু আমি চাইছি তুমি চোখ খুলে রাখো।'

'তোমার মুখেই যে তোমার স্বচ্ছ অন্তরখানিকে প্রতি মুহূর্তে দেখছি!'

'হায় রোজার! একবার তাকিয়েও দেখবে না!'

'আমি তোমায় ভালোবাসি, ওর বেশী আর কিছু চাইনে আমি।'

'আমিও তো তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু আমার কাছে তো ওটুকুই যথেষ্ট নয়।'

'নয়?' হত-বুদ্ধি হ'য়ে যায় রোজার।

'না, আমি দেখে নিতে চাই।'

'কি দেখতে চাও?

'তুমি আমায় কেমন ভালোবাসো তাই।'

'সংসারে সব চাইতে তোমায় বেশী ভালোবাসি।'

'তাতো বাসবেই। কিন্তু কতটা ভালোবাসো, তা জিজ্ঞাসা করিনি। করেছি, কেমন ভালোবাস তাই।...তা, হ্যাঁ, আমি জানি, আমায় চাও তুমি; কিন্তু তোমার আনেৎকে নিয়ে ঠিক তুমি কি করতে চাও, বলতো!'

'কেন? আমার অর্ধাঙ্গিনী হবে!'

'এই তো!...কিন্তু বন্ধু! আমি তো আধখানা নই, আমি যে গোটা মানুষ!'

'ও সে একই কথা হ'লো। ভাষার হের ফের একটু, এই যা! মানে তুমি হ'লে আমি, আর আমি হ'লাম তুমি।'

'না, না, রোজার! দোহাই তোমার! তুমি 'আমি' হ'তে যেওনা। ওটা আমার জন্যই থাক!'

'আমাদের যুক্ত জীবনেও কি তুমি আমি এক হব না?'

'তাই তো ভাবছি। মনে হ'চ্ছে পেরে উঠব না।'

'কেন, কি ভাবছ বলতো? কিসের ভয়? আচ্ছা, কথাটা কি? তুমি আমায় ভালোবাসো, কেমন? বাসতো? বাস্—, ঐটেই তো আসল কথা! বাকী আর যা আছে, তা নিয়ে মাথা ঘামিও না! সে আমার কাজ, আমি দেখে নেব 'খন। আমি, আমার পরিবার সব তোমার। আমরা সবাই মিলে এমন ভাবে তোমার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবো যে তোমার কিচ্ছুটি ভাবতে হবে না। তোমার চলতেও হবে না। আমরা ঠিক তোমায় চালিয়ে নিয়ে যাব।'

আনেৎ নীচের দিকে তাকিয়ে পায়ের আঙুল দিয়ে মাটিতে অক্ষর কেটে যাচ্ছিল। ওর চোখে মুখে হাসি।

[বেচারা রোজার কিছুই বুঝতে পারছে না...]

চোখ তুলে ও রোজারের দিকে তাকায়। রোজারের মধ্যে কোনও অস্থিরতা, উত্তেজনা নাই। সম্পূর্ণ শান্ত ভাবে ও আনেৎ-এর উত্তরের প্রতীক্ষা করছিল।

'একবার তাকাও তো, রোজার! দেখতো, আমার পা দুটো বেশ ভালো, না?'

'চমৎকার! সত্যি খুব সুন্দর!' রোজার বলে।

'দূর। তাই বুঝি বলেছি,' তর্জনী নাচিয়ে আনেৎ বলে: 'মানে, বলছি—আমি বেশ ভালো হাঁটতে পারি, তাই না ?'

'নিশ্চয় ! খুব হাঁটতে পারো, আমারও খুব ভালো লাগে।'

'তাহ'লে—! আমি চলতে পারি, অথচ তোমরা আমায় চালিয়ে নিয়ে যাবে, তা কি ক'রে হয় বল তো ? সত্যি আমার জন্য অনেক ভাবছ তুমি ? কি ব'লে যে ধন্যবাদ দেব, জানিনে। কিন্তু লক্ষীটি ! আমায় চলতে দাও। পথ চলতে কষ্ট হবে ভেবে যারা আঁৎকে ওঠে, আমি সে-দলের নই। দয়া ক'রে ও কষ্টটুকু আমার কেড়ে নিও না। তাহ'লে যে আমার জীবনের রসই থাকবে না ! জীবনের সমস্ত স্পৃহা একেবারে উবে যাবে। বুঝতে পারছি—সমস্ত রকম কষ্ট থেকে তোমরা আমায় আগলে রাখতে চাও। আমার কোন কাজ থাকবে না, ইচ্ছে থাকবে না, পথ-নির্বাচনের দায় থাকবে না। আগে থাকতেই তোমরা সব ঠিক ক'রে, বিলি-ব্যবস্থা ক'রে—তোমার আমার তাদের, সকলের জীবন, মানে গোটা ভবিষ্যৎটাকে ভাগ ভাগ ক'রে নির্দিষ্ট খোপে খোপে সাজিয়ে রেখে দেবে। ও আমি চাইনে, চাওয়া উচিতও নয়। আমি বুঝতে পারছি, আমার সবে শুরু। খুঁজছি আমি। নিজকে খুঁজছি। আমি জানি, এ আমার একান্ত প্রয়োজন। আত্মদর্শন ক'রতেই হবে আমায়।'

'খুঁজবে ? তুমি আবার কি খুঁজবে ?' রোজারের মুখের ভাবে দাক্ষিণ্যের সাথে শ্লেষ মেশান। ও ভাবছে ছেলেমানুষের খাম-খেয়ালী এ। আনেৎ-এর খোঁচা লাগে। রেগে উঠে বলে

'দেখ, তামাশার কথা নয়। আমি জানি, আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। যা আমি নই, তা দেখাতে যাইনে। কিন্তু যাই হই, যৎটুকুই হই—আমি জানি আমি কি। যতটুকুই হোক—আমার একটা জীবন আছে। খুব দীর্ঘ জীবন নাই হোক, জীবন তো ! আর জীবন মানুষ একবারই পায়। সুতরাং আমার অধিকার আছে···না, থাক··অধিকার কথাটা নাই বললাম, ওটা গুমরের মত শোনায়। যাই হোক। এটুকু দেখতে হবে, কর্তব্য হিসেবে, মাত্র একটিবারের জন্য যা পেয়েছি তা অমনি না খোয়াই, হেলায় না ডালি দি।'

আনেৎ-এর কথা রোজারের মন স্পর্শ করলে না এতটুকুও, বরঞ্চ যেন আহত হ'লো রোজার। বল্লে:

'জীবনটাকে হেলায় ডালি দিচ্ছ! তাই ভাবছ? তোমার জীবনটা নষ্ট হ'য়ে যাবে! কে বললে? কত বড়, সুন্দর লক্ষ্য রয়েছে, মানো না তা?'

'মানি।...কিন্তু কি তা? আমায় তুমি কি দেবে? কি দান আছে তোমার ভাণ্ডারে?'

উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে রোজার। রাজনৈতিক জীবনের যে-স্বপ্ন ও দেখেছে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিপুল আশা আকাংক্ষা হৃদয়ে পোষণ ক'রছে, ব্যগ্র ভাষায় আর একবার তার বিবরণ দিতে আরম্ভ করে রোজার। আনেৎ গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে—তারপর কথার মাঝখানে ওকে থামিয়ে দিয়ে [এ সব কথা উঠলে রোজার থামতে চায় না] বলে:

'সত্যি, রোজার যা বলেছ, সত্যি সত্যি চমৎকার। কিন্তু আসল কথা কি জানো!...রাগ করোনা আবার...তোমার ঐ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ওপর আমার কেমন যেন আস্থা নেই।'

'সে কি! আস্থা নেই? কেন নেই? এর আগে তো ছিল। প্যারীতে আমাদের যখন প্রথম পরিচয়, তোমায় কত বলেছি এ সব কথা—তখন তো তোমার আস্থা ছিল!'

'আমি বদলে গেছি, রোজার।'

'কিন্তু কেন? কেন বদলে গেলে? কি হয়েছে?...না না, কে বললে বদলেছ...বদলাওনি। যদি বা লে থাকই, আবার বদলাবে...আবার আগের মত হবে আমি জানি। কত উদার আমার আনেৎ! এই সব গণ-কল্যাণের, সমাজ-সংস্কারের, কাজ থেকে সে কি দূরে সরে থাকতে পারে?'

'ওতে আগ্রহ আমার যথেষ্টই আছে; আগ্রহ নেই তোমাদের রাজনৈতিক কচকচিতে। ও আমার ভালো লাগে না।'

'একই কথা তো, তফাৎ কোথায়!'

'না, একই কথা নয়।'

'হয়ে দরে একই দাঁড়ায়—একটা হাসিল হ'লে আপনা থেকেই আর একটা হবে।'

'সন্দেহ আছে আমার।'

'তবু ও ছাড়া আর পথ নেই। জন-সেবা, সমাজ-সেবা যাই বলো, ও ছাড়া গতি নেই।'

[আনেৎ মনে মনে যোগ ক'রে দেয়···আসলে নিজের সেবাই। পরক্ষণেই চোখ রাঙায় নিজকেই আবার এসব কথা মনে আসার জন্য।]

'আমার তো মনে হয় অন্য পথও আছে, ওই একমাত্র পথ নয়।' আনেৎ বলে।

'শুনি কি পথ আছে!'

'পুরানো পথটাই এখনও সর্বোত্তম পথ—যে পথে গেছেন খৃষ্টের অনুগামীরা—ত্যাগের পথ, সন্ন্যাসের পথ। অর্থাৎ গণ-দেবতার দেউলে যেতে হ'লে সব বিলিয়ে সব পেছনে ফেলে পথে বেরতে হবে।'

'নিছক স্বপ্ন—'

'হয়তো তাই। আজ তোমার ইউটোপিয়ায় বিশ্বাস নেই রোজার। কিন্তু একদিন বিশ্বাস করেছ বোধ হয়। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়েছিল। অবশ্য এখন আর হয় না। রাজনীতির মধ্যে বাস্তব খুঁজে পেয়েছ তুমি। তোমার প্রতিভা আছে—তুমি জয়যুক্ত হবেই এ আমি ধ্রুব জানি। তোমার আদর্শে সংশয় থাকলেও তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ গৌরবময় হবে। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি একটা পার্টীর নেতৃত্ব করছ তুমি—বক্তা ব'লে দেশ-জোড়া তোমার খ্যাতি—পার্লামেন্টে অধিকাংশের সমর্থন লাভ করেছ। মন্ত্রী হয়েছ···'

'থামো, থামো! সেই 'ম্যাকবেথ্ তুমি রাজা হবে,' তাই না? ভবিষ্যৎবাণী!'

'হ্যাঁ, ভবিষ্যৎবাণীই বটে—। হাত গুণতে পারি আমি—তবে নিজের পারিনে, এই হচ্ছে মুস্কিল।'

'মুস্কিল কোথায়! আমি যদি মন্ত্রী হই তুমিও তার ভাগী হবে। আচ্ছা, সত্যি বলতো, একেবারে মন খুলে বল—তুমি খুশি হও না?'

'মানে মন্ত্রী হ'লে! সর্বনাশ! কস্মিন্ কালেও না। খুশি আমি নিশ্চয়ই হব। কিন্তু সে তুমি খুশি হয়েছ ব'লে। আর আমি যদি তোমার কাছে থাকি, বিশ্বাস কর, যতদূর সাধ্য আমার কাজ আমি করব। এবং আমা দ্বারা যদি তোমার কোন সাহায্য হয়, খুশি হব। কিন্তু সত্যি কথা বলছি [তুমিই তো মন খুলে বলতে বলেছ] যে এতে আমার জীবন ভরবে না— এতটুকুও না।'

'তা আমি বুঝি। রাজনীতির ক্ষেত্রে হাজার যোগ্যতা থাকলেও মেয়েরা কেবল ওই গণ্ডীর মধ্যেই নিজেদের ধ'রে রাখতে পারে না। এই ধরনা মাকেই—! মেয়েদের আসল কর্ম-ক্ষেত্র গৃহ। আর তার উপযুক্ত কাজ বা বৃত্তি যাই বলো—সে মাতৃত্ব।'

'আমি জানি তা।' আনেৎ বলে: 'ও নিয়ে তর্ক করার কিছু নেই। কিন্তু···[ভয় হচ্ছে···বোঝাতে পারব কিনা জানি না]···এখনও আমি জানিনে মাতৃত্বের মধ্যে কি আমি পাব। এমনিতেই ছোট ছেলেপুলে আমি ভালোবাসি। হয়তো আরও বেশী ভালোবাসব যখন আমার নিজের সন্তান হবে···['নিজের' বলেছি, পছন্দ হচ্ছে না বুঝি কথাটা! তোমার ওপর আগ্রহ কমে গেছে, না?] হয়তো তাদের নিয়েই একেবারে ডুবে থাকব··· জানিনে···হয়তো তাই হবে···হয় তো নয়···। কিন্তু এখনও যা অনুভবই করিনি, সে-সম্বন্ধে বলতে চাইনে কিছু। তবে সত্যি বলছি, নারীর ঐ যে বৃত্তি না পেশার কথা বললে, অর্থাৎ মাতৃত্ব—তার তাগিদ কিন্তু এখনও তেমন বুঝছিনে। আশায় ব'সে আছি—আজও যা জানিনে, জীবনের মধ্যেই একদিন তার গুণ্ঠন-মোচন হবে। কিন্তু তবু মানবোনা, শুধু সন্তান নিয়ে সমস্ত জীবন ডুবে থাকাই নারীর একমাত্র ধর্ম। [ভ্রূ কুঁচকিও না, বাপু!] সন্তান পালন করবে বৈকি; ঘর-সংসারও দেখবে, নিষ্ঠা দিয়েই দেখবে। এবং সেই সঙ্গে যা সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে প্রয়োজন তার জন্যও নিজের কিছুটা রাখতে হবে।'

'সব চেয়ে বড়?—'

'আত্মা।'

'বুঝতে পারছিনে।'

'কি ক'রে বুঝবে? এ যে জীবনের একেবারে অলখ্‌পুরীর কথা! সেকি বোঝান যায়! কথা দিয়ে বোঝান যায় না। কথায় সে-শক্তি, সে-আলো, সে-গভীরতা কোথায়! আত্মা!…সেকথা বলতে যাওয়াই পাগলামো…আত্মা কি? তার অর্থ কি? কি তা, বোঝাতে পারব না। কিন্তু আত্মা আছে… তার অর্থ আছে। আমিই আত্মা, রোজার! আমার সত্যতম গভীরতম সত্তাই আত্মা!'

'তোমার সেই সত্যতম, গভীরতম ভেতরকার মানুষটিকে কি আমায় দাওনি, আনেৎ?'

'সব কি দেখা যায়, রোজার?' আনেৎ বলে।

'তাহ'লে আমায় ভালোই বাসনা তুমি।'

'ভালোবাসি বইকি, খুব ভালোবাসি। কিন্তু তবু সব দেখা যায় না।'

'তোমার ভালোবাসা সম্পূর্ণ নয়। ভালোবাসায় খানিকটা দেখা আর খানিকটা রাখার হিসেব থাকেই না। যেখানে ভালোবাসা সেখানে সব-দেখা। ভালোবাসো আনেৎ…ভালোবাসো…ভালোবাসো…'

বক্তৃতার জোয়ার খুলে যায় রোজারের…ভালোবাসায় আত্ম-দান, প্রিয়ের সুখের জন্য ত্যাগের আনন্দ ইত্যাদির সম্বন্ধে মর্ম-স্পর্শী ভাষায় ওজস্বিনী বক্তৃতা দেয় রোজার। আনেৎ শোনে। [ভাবে: এসব কথা বলছ কেন? ভাবছ, এসব আমার অজানা? ভাবছ, তোমার জন্য প্রয়োজন হ'লে আমি ত্যাগ করতে পারি না এবং সেই ত্যাগে আমার আনন্দ হবে না? তা নয়। সব পারি, কিন্তু এক সর্তে—যে তোমার তরফ থেকে তার দাবী থাকবে না। আচ্ছা দাবী কেন কর তুমি?…কেন এ তোমার প্রাপ্য ব'লে আশা ক'রে থাক? অধিকার বলে কেন মনে কর তুমি। আমার ওপর বিশ্বাস কেন নাই তোমার, রোজার?]

রোজারের কথা শেষ হ'লে আনেৎ বলে:

'চমৎকার! তোমার মত অমন সুন্দর ক'রে ছাই এসব কথা কি আমি ব'লতে পারতাম! কিন্তু বোধ হয় বলতে না পারলেও সময় এলে, প্রয়োজন হ'লে, বুঝতে পারব।'

'বোধ হয় ? সময় হ'লে ?' রোজার উত্তেজিত হ'য়ে বলে।

'তুমি ভাবছ বড় কম হ'লো, না ? কিন্তু যত কম ভাবছ তত নয়··· যেটুকু করতে পারব, তার বেশী [কমই হবে] প্রতিশ্রুতিও দিতে চাইনে। অত ভবিষ্যতের হিসেব কষতে পারিনে। কি হবে ভবিষ্যতে কে বলতে পারে। কিন্তু পরস্পরের ওপর বিশ্বাস আমাদের রাখতেই হবে। আমাদের কারো মধ্যেই ফাঁকি নেই। আমরা দু'জনেই দু'জনকে ভালোবাসি, তাই না রোজার ? আমাদের ক্ষমতায় যতদূর আছে তা করব বৈকি ?'

'যতদূর ক্ষমতায় আছে ?' রোজার বলে।

হেসে আনেৎ ব'লে চলে

'দেখ, আমায় শক্তি দাও তুমি। এখনও যে অনেক কথা বাকী !'

'বলে যাও ·'

'আমি তোমায় ভালোবাসি রোজার, কিন্তু আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে চাই। ফাঁকি মেশাতে চাইনে ভালোবাসার মধ্যে। ছোট বেলা থেকে বড় একা থেকেছি এবং যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা পেয়েছি। বাবা আমাকে পুরো স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, কিন্তু তার অপব্যবহার আমি কখনও করিনি। কারণ আমার স্বাধীনতা ছিল সুস্থ, স্বাভাবিক। কাজেই আমার কতগুলি অভ্যাস গড়ে উঠেছে, যা এখন ছাড়া বা বদলানো কঠিন। আমি বুঝি যে আমাদের সমাজের আমার সমবয়সী মেয়েদের মধ্যে আমি কেমন বেখাপ্পা। আলাদা সব থেকে। তবু মনে হয়, সত্যিকারের তফাৎ নেই। আমার মন, অনুভূতি, আমি যা ভাবি, তা সাহস ক'রে ব'লতে পারি, আর বিবেক আমার সচেতন। এই যা তফাৎ। তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যুক্ত করতে বলছ তুমি। আমিও তাই চাই। দু'জনেই আমরা একান্ত ক'রে জীবনের দোসর খুঁজেছি। আমার সে দোসর তুমিই হ'তে পার, রোজার, অবশ্য যদি তুমি চাও···'

'যদি আমি চাই ! কি বলছ !' রোজার আবেগ-ভরা স্বরে বলে · 'ঠাট্টা করছ নাকি ? শুধু চাওয়া, আর কিছুই করিনে আমি ?'

'তাই যদি চাও, যদি সত্যি আমার জীবনের সাথী হ'তে চাও···তবে

ভেবে দেখ ভালো ক'রে···ঠাট্টা করছি না। বেশ বুঝে দেখ। মিলনের অর্থ বা উদ্দেশ্য কাউকে দাবিয়ে রাখা নয়। আচ্ছা বলতো···আমায় কি দেবে তুমি··· বুঝতে পারছি, কথাটা ভাবোনি। তা, ভাববে কি ক'রে? অসম মিলনই তো চ'লে আসছে আবহমান কাল থেকে। দুনিয়া তাতেই অভ্যস্ত হ'য়ে আছে। কিন্তু আমার কাছে একেবারে নতুন···অদ্ভুত···। কেবল ভালোবাসা নিয়েই তুমি আসোনি আমার কাছে। এসেছ তোমার সব নিয়ে—তোমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব-মক্কেল, তোমার নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ-জীবন, তোমার পাকা ক'রে ছকা কর্ম-পন্থা, তোমার দল ও দলীয়তা, তোমার পরিবার ও পারিবারিক ঐতিহ্য···এই সব নিয়েই তোমার জগৎ এবং সেই পুরো জগৎটাই তুমি। আমারও একটা জগৎ আছে এবং আমি নিজেই একটা জগৎ। অথচ তুমি আমায় বলছ: 'আনেৎ, ছেড়ে চলে এস তোমার ঐ জগৎ। এস আমার ঘরে আমার পাতা আসনে।' আসব বলেই তো বসে আছি, বন্ধু। কিন্তু খণ্ডিত হ'য়ে আসব না। এখন বলো আমি ঠিক যা সে-ভাবে আমায় গ্রহণ করতে পারবে তো!'

'আমি সবটাই তো চাই গো। কিন্তু তুমিই যে বললে সবটা দিতে পারবে না আমাকে!' রোজার বলে।

'তুমি বোঝনি। আমি বলছি, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকব, তবুও তুমি আমাকে গ্রহণ করতে পারবে কিনা এবং কিছু বাদ না দিয়ে আমার সবখানিকেই মেনে নিতে পারবে কিনা।'

'স্বাধীন!' সংশয়ের সুরে জিজ্ঞাসা করে রোজার 'সেই '৮৯ সনের পর থেকে ফ্রান্সে প্রত্যেকটি মানুষই তো স্বাধীন·[আনেৎ হাসে। সেই চিরকেলে কথার ম্যাজিক!] যাক্‌গে, আসলে দু'জনেরই দু'জনকে ভালো ক'রে বুঝে নেওয়া দরকার। বিয়ের পর তোমার পুরো স্বাধীনতা থাকতে পারে না, তা তো মানবে! বিয়ের দায়িত্ব হিসেবেই কতগুলো দায় এসে প'ড়বে।'

'ওই দায় কথাতেই তো আমার আপত্তি। দায় হ'তে যাবে কেন? যেখানে দুটো মানুষের একই জীবন, একই ক্ষেত্র, সেখানে যাকে ভালোবাসি, তার সুখে দুঃখে সংগ্রামে আমি তো সানন্দে স্বেচ্ছায়ই অংশ নেব। আমার

কর্তব্য তা। এবং সে-কর্তব্য যতই কঠিন হবে, ততই ভালোবাসার ধর্মেই তা আমার প্রিয় হ'য়ে উঠবে। কিন্তু তাই ব'লে আমার নিজের জীবনের কর্তব্য তো বিসর্জন দিতে পারিনে। তাও এক হাতে রাখতে হবে।'

'আবার কি কর্তব্য। তুমি নিজের কথা আমায় যা বলেছ, বা আমি নিজেও যতদূর জানি, এতদিন তোমার জীবন তো একেবারে নিঝঞ্ঝাটে পুরো শান্তির মধ্যেই কেটেছে। সেরকম গুরুতর ঝামেলা কিছু পোয়াতে হ'য়েছে ব'লে তো মনে হয় না। তাহ'লে কিসের এমন তাগিদ, বুঝতে পারছিনে তো! এতদিন যে সব কাজ কর্ম করছিলে তার কথা বলছ? সে-সবই চালিয়ে যেতে চাইছ? কিন্তু দেখ আমার মনে হয় ঐ ধরনের জিনিস মেয়েদের পক্ষে একেবারেই সঙ্গত নয়। বিশেষ ক'রে বৃত্তি হিসেবে। গার্হস্থ্য-জীবনের মোটেই অনুকূল নয়—গার্হস্থ্য-জীবন ভগবানের একটি মহৎ দান, বুঝলে! তোমার কাছে কি বোঝা মনে হচ্ছে তা? আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছিনে। তুমি যে বড্ড বেশী স্বাভাবিক। পুরো পুরি রক্ত মাংসের মানুষ! হুজুকে মাতা, বা ভাবাবেগে ভেসে যাওয়া তো তোমার স্বভাব নয়। চমৎকার একটি ভারসাম্য রয়েছে তোমার মধ্যে।'

'কোন বিশেষ বৃত্তির কথা হ'চ্ছে না। তাহ'লে তো গোলমালই থাকতো না। বৃত্তি হ'লেই তা অবশ্য পালনীয় হ'তো। তুমি যে আমার জীবনের তাগিদ, ঝামেলা ইত্যাদির কথা ব'লছ অত সহজে তার সংজ্ঞা-নির্ণয় করা যায় না। খুব একটা নির্দিষ্ট চেহারা নেই, কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক।...প্রত্যেক জীবন্ত মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন ..পরিবর্তনের অধিকার।'

প্রায় চীৎকার ক'রে ওঠে রোজার: 'সর্বনাশ! বলো কি? পরিবর্তন! প্রেমেও?'

'আমি এক-নিষ্ঠ প্রেমেরই পক্ষপাতী, এবং আমার জীবনে এক-নিষ্ঠ প্রেমকেই আমি গ্রহণ করেছি। কিন্তু এক-নিষ্ঠ থেকেও পরিবর্তনের অধিকার আছে...। বুঝতে পেরেছি, রোজার! 'পরিবর্তন', কথাটাতেই আঁৎকে উঠছ। আমারও মনে দ্বন্দ্ব চলছে।...জীবনের মুহূর্তগুলি যদি সত্যি সুন্দর হয়, তবে কদাপি পাদমেকং ন গচ্ছামি। মানুষ দুঃখ করে, কেন সুন্দর মুহূর্তগুলিকে চিরকালের

জন্ম ধরে রাখা রাখা যায় না !···তবু বলব ধরে রাখা উচিত নয় ! তাছাড়া ধরে রাখা যায়ওনা। চির-স্থির তো কেউ নয় ! মানুষ যে জীবন্ত ; সে বেঁচে থাকে, সামনের দিক এগিয়ে চলে। যেতেই হয়, পেছনের ঠেলা রয়েছে যে ! এগিয়ে যেতেই হবে আমাদের। এতে ভালোবাসার কোনো তো ক্ষতি হয় না। প্রেম যে সঙ্গে সঙ্গেই থাকে আমাদের। কিন্তু প্রেম যদি পায়ের বেড়ী হ'যে মানুষকে পেছনে টেনে রাখতে চায়, তাকে নিয়ে একটি মাত্র রঙীন ভাবনায় মশগুল হ'য়ে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে জীবন কাটিয়ে দিতে চায়, তবে তাতে কল্যাণ হয় না। রঙীন প্রেম হয়তো সারা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, কিন্তু জীবন তাতে ভরে না, রোজার !···

'ভেবে দেখ, লক্ষ্মীটি। ভালো ক'রে বুঝে দেখ, এমনও তো হ'তে পারে যে তোমার কর্ম-জগতে, তোমার চিন্তা-ধারার সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না নিজেকে [এখনও তো পারছি না]। অথচ ঠিক আগের মতই ভালোবাসি তোমাকে। নিজের জন্য যে-পথ তুমি বেছে নিয়েছ, তা উত্তম জেনেই নিয়েছ। তার নিন্দে করব, বা তা নিয়ে ঝগড়া করব এ-কথা ভাবতে পারিনে। কিন্তু যেহেতু ওটা তোমার পথ, তাই ব'লে ওটা আমার ওপর চাপিয়ে দেবে, তাই বা কেমন ? ঘরের মধ্যে যদি হাঁপিয়ে উঠি, তবে জানালাটা একটু খুলে দেবার অধিকার আমার দেওয়া উচিত কিনা বলো, রোজার ! দরকার হ'লে ধরো, দরজাটাও [ভয় নেই, বেশী দূর যাব না !]। আমার জ্ঞান-জীবনের প্রবৃত্তি-প্রেরণা দিয়ে আমার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ক্ষমতা অনুসারে ছোট একটুখানি কর্ম-ক্ষেত্র রচনা ক'রে নেব, যাতে এত বড় দুনিয়াটার একটা মাত্র বিন্দুতে বদ্ধ না থেকে, একই দিকে তাকিয়ে না থেকে, দৃষ্টিটাকে আরও ছড়িয়ে দিতে পারি, একটু হাওয়া বদল ক'রে নিতে পারি, দরকার হ'লে অন্য জায়গায় চলেও যাব···[দরকার হ'লেই, বুঝেছ !···এখনও দরকার হয়নি ··]। কিন্তু সে যাই হোক, আমি এটুকু অনুভব ক'রতে চাই যে এ করার স্বাধীনতা আমার আছে·· আমি স্বাধীন ভাবে ইচ্ছা-শক্তিকে কাজে লাগাতে পারি, স্বাধীন ভাবে নিশ্বাস ফেলতে পারি। এমন কি স্বাধীন হবার স্বাধীনতাও আমার আছে [হয়ত' কোন দিনই সে-স্বাধীনতার ব্যবহার হবে না]।···

'ক্ষমা করো রোজার। হয়ত হাসছ, হয়তো ভাবছ ছেলেমানুষী আব্দার, শুধু পাগলামো। কিন্তু তা নয়, এ আমি তোমায় ব'লে দিলুম। এ আমার সত্যিকারের প্রয়োজন—এ না হ'লে আমি বাঁচব না। এ আমার নিশ্বাস, আমার প্রাণবায়ু। ও টুকু যদি কেড়ে নাও, তাহ'লে সত্যি আমি বাঁচব না। ভালোবেসে আমি সব ক'রতে পারি। কিন্তু জবরদস্তির মধ্যে বাঁচতে পারিনে আমি। আমায় বাঁধবে কেউ এ চিন্তাই আমায় বিদ্রোহী ক'রে তোলে। উদ্বাহ তো উদ্বন্ধন নয়, রোজার। বিবাহের মন্ত্রে দুইটি হৃদয়ই পূর্ণ-বিকশিত হ'য়ে উঠবে। একের স্বচ্ছন্দ বিকাশে আর একজন ক্ষুব্ধ না হ'বে পরম আনন্দে পাশে গিয়ে দাঁড়াবে সহায় হ'য়ে, সহযোগী হ'বে—এই তো আমি বুঝি রোজার। এখন বল, পরিপূর্ণ মুক্তির মধ্যে, এমন কি তোমার সম্বন্ধেও মুক্তি দিয়ে পারবে কি আমায় ভালোবাসতে ?'

[আনেৎ ভাবে : তাই যদি হব, তোমার হ'তে পারব আরো বেশী ক'রে।]

রোজার শোনে উদ্বিগ্ন ভাবে। ও বিচলিত হ'য়েছে, একটু বিরক্তও হয়েছে। অস্বাভাবিক নয়, সকলেই হ'ত। আনেৎ অবশ্য আর একটু বুদ্ধি খরচ করতে পারত, আর একটু সাবধানে পা ফেলতে পারত। কিন্তু রোজারকে ফাঁকি দিচ্ছে ভেবে আর একটা বোঝা-পড়ার জন্য ও অস্থির হ'য়ে পড়েছিল। তাইতে একটু বাড়াবাড়ি হ'বে যেত প্রায়ই। ওর মনের দ্বন্দ্ব একটু উগ্র হ'য়েই প্রকাশ পেত। তাইতে চমকে গিয়েছিল রোজার এবং ভুল বুঝে বসল ওকে। আর একটু বলিষ্ঠ ভালোবাসা হ'লে এ-ভুল বোঝার সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু সর্বোপরি রোজারের অহমিকায় ঘা লেগেছে। একবার ভাবছে এই মেয়েলী খাম-খেয়ালীকে ও আমলেই আনবে না। আর একদিকে অসহ্য লাগছে এই নৈতিক বিদ্রোহ। বিষম অন্তর্দ্বন্দ্বে ও পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বিদ্রোহিনীর বিদ্রোহের মধ্যেকার আকুলতাটুকু রোজারের অন্তরে পৌঁছোয় নি। সে শুধু এটুকু বুঝল যে প্রচ্ছন্ন রূপে আঘাত এল ওর মালিকানায়। নারী-জাতির সঙ্গে ব্যবহারের কৌশল ওর জানা নেই ; নইলে আজ মনের বিরক্তি মনে চেপে ও ঔদার্য দেখিয়ে আনেৎ যা চাইত তাই দেবে বলে অঙ্গীকার ক'রে যেত। 'প্রেমিকের পণ!

সে তো হাওয়ার খেলা শুধু! তবে আর অত কার্পণ্য কেন?…’ কিন্তু রোজারের যেমন দোষ ছিল তেমন গুণও ছিল। রোজার সেই যাকে বলে ‘ভালো ছেলে।’ নিজেকে নিয়েই ডুবে আছে মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না, তাদের সঙ্গে মেশেও নি। তারপর মনের ভার গোপন করতেও জানে না। বিরক্ত হয়েছে আনেৎ-এর কথায়, লুকোতে পারলে না। আনেৎ আশায় আশায় আছে যে উত্তরে দু'হাতে দাক্ষিণ্য ঢেলে দেবে রোজার। কিন্তু নিরাশ হতে হ'ল। কারণ, শুনতে শুনতে শুধু নিজের কথাই ভাবছিল সে। তাই বললে :

‘আনেৎ, তুমি যে সত্যি কি চাও আমার কাছে তা একটুও বুঝতে পারছিনে। বিয়েকে ভাবছ জেলখানা। সেই জেলখানা থেকে পালাতে চাও তুমি। আমার বাড়ীর দরজা জানালায় গরাদ আঁটা নেই। যথেষ্ট বড় বাড়ী, বেশ আরামে হাত পা ছড়িয়ে থাকা যায়। কিন্তু তাই ব'লে সব দরজা জানালা হা ক'রে খুলে রেখে সদর অন্দর এক ক'রে তো আর থাকা চলে না। থাকার জন্যই তো বাড়ী-খানা তৈরী হয়েছে। অথচ তুমি বলছ, তোমার থাকা চলবে না এখানে ; তোমার নিজস্ব জীবন আছে, তার কাজ-কর্ম আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে। আর যদি ঠিক বুঝে থাকি, এও বলছ যে খুশিমত বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার—আর…জানিনে বাপু কিসের যে অসুবিধে তোমার এখানে—হ্যাঁ, আর যে-দিন ইচ্ছে ফিরে আসার অধিকারও নাকি তোমার আছে…আচ্ছা, তাই কি হয়, আনেৎ! তুমিই বলো! পারে কোন স্বামী স্ত্রীকে এ ভাবে একটা গোলক ধাঁধার মধ্যে ছেড়ে দিতে? আর স্বামীর পক্ষেই বা কতখানি অপমান ভাবতো! তুমি নিশ্চয়ই সত্যি সত্যি বলছ না, ঠাট্টা করছ। তাই না আনেৎ?…’

রোজারের কথার মধ্যে শুভবুদ্ধি ছিল না তা নয়। কিন্তু হৃদয়ের স্পর্শ-বিহীন নিছক শুষ্ক শুভ বুদ্ধি নিতান্তই অর্থহীন। আনেৎ বিচলিত হয়। কিন্তু মনের চাঞ্চল্য ঢাকা প'ড়ে যায় মুখের গর্বিত কাঠিন্যে। বলে :

‘রোজার, যে মেয়েকে ভালোবাসবে তাকে বিশ্বাস করা দরকার। বিবাহিত জীবনে তোমার মান সম্মানকে সে আপনার ক'রে নেবে না এ-কথা যদি ভাবো

তবে তাকে অপমান করা হয়। তুমি কি ভাবো যাতে তোমার মাথা নীচু হয়, এমন কাজ কখনও করতে পারি আমি? তোমার অপমান যে আমারও অপমান! তোমার যতখানি তুমি আমার হাতে তুলে দেবে তাকে আগলে রাখার দায় আমায় কতখানি জানো? যতই আমি মুক্ত হব, সে দায় আমার ততই বাড়বে। আমায় আর একটু মর্যাদা দিতে হবে, রোজার! একটুও বিশ্বাস ক'রতে পার না আমায়?'

রোজার বোঝে অবিশ্বাস দিয়ে বেঁধে রাখা যাবে না এ মেয়েকে। তারপর ভাবে—দূর ছাই। এসব মেয়েলী খেয়াল! তাই নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করার দরকারই বা কি? তার চাইতে আমলেই আনবে না। যথেষ্ট সময় আছে—সব ঠিক হ'য়ে যাবে (অবশ্যি যদি তত দিন মনে থাকে আনেৎ-এর)।

সুতরাং প্রেমিক-সুলভ ব্যগ্রতার সঙ্গে বলে:

'বিশ্বাস, আনেৎ! সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তোমার ওই সুন্দর চোখকে বিশ্বাস না ক'রে বাঁচবো কি ক'রে! তুমি শুধু আমায় এইটুকু বলো যে চিরকাল আমায় তুমি ভালোবাসবে···শুধু আমায়, আর কাউকে না···আর কিছু চাইনে তোমার কাছে আমি।'

জীবন মরণের প্রশ্ন আনেৎ-এর। সোজাসুজি উত্তরটাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে রোজার ঠাট্টা তামাসা ক'রে। ওর এই হাল্কা ধরণটা বিদ্রোহিনী মেয়ের ভালো লাগল না। শক্ত হ'য়ে উঠল ও।

'না রোজার, ও প্রতিজ্ঞা করতে পারব না। তোমায় সত্যি আমি খুব ভালোবাসি। কিন্তু তাই ব'লে যে-ব্যাপারের সবখানি আমার হাতে নেই তা নিয়ে যদি অমন একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে বসি তাহ'লে ফাঁকিই দেওয়া হবে তোমায়। কিন্তু তোমায় ঠকাতে তো পারব না আমি। শুধু এটুকু কথা আজ তোমায় আমি দিতে পারি, তোমার কাছ থেকে কোন দিন কিছু লুকোবনা। যদি এমন দিন কখনও আসে যে তোমার ওপর আমার ভালোবাসা নিঃশেষ হ'য়ে গেছে, অথবা আর কাউকে ভালোবাসছি, তবে সে-কথা সব চেয়ে আগে এমন কি আমার বন্ধুরও আগে তোমাকেই জানাবো। তুমিও তাই করো, রোজার। আমাদের মধ্যে যেন কোন ছলনা না থাকে।'

মনঃপূত হ'লো না রোজারের। অপ্রিয় সত্য দ্বারে এলে, বাড়ীতে কেউ নেই ব'লে ফিরিয়ে দেওয়াই ব্রিসটদের ধর্ম। রোজারের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হ'লো না। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে বলে ও :

'...কি সুন্দর তুমি, আনেৎ।...কিন্তু এসব কথা এখন থাক...চল অন্য কথা বলি।'

[তের]

আনেৎ নিরাশ হ'য়ে ফিরল। ওর আশা ছিল বেশ ভালো রকম খোলাখুলি কথা হ'য়ে যাবে। কাজটা খুব সহজ হবে এ ভরসা না থাকলেও অন্ততঃ রোজারের হৃদয়ের আলো তার অন্তরকে পথ দেখাবে এ আশাটুকু করেছিল। কিন্তু সব চেয়ে ওর দুঃখ যে রোজার ওকে বুঝলও না, বুঝতে চেষ্টাও করল না। দেখল শুধু ওপর ওপর, আর তাও নিজের দিক থেকে। আনেৎ-এরও যে একটা দিক আছে তা একবারও ভাবল না। ওর মত তীব্র সংবেদনশীল মনের কাছে এর বাড়া দুঃখ বুঝি আর নেই।

কিন্তু নিজকে ফাঁকি দেয়নি আনেৎ। রোজার ওর কথা শুনে বিব্রত হয়েছে, বিরক্ত হয়েছে; কিন্তু ওর কথার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রতে পারেনি। ভেবেছে, এসব ও-মেয়ের উদ্ভট খেয়াল। ও পাগলা নূতন কিছু করতে চায়। কিন্তু রোজারের মা তো যেমনকে তেমন থেকেই দিব্যি সবার ওপর দিয়ে চলছেন। সবার অবশ্য এ গুণ থাকে না! আনেৎ-এর অন্য কতগুলো গুণ আছে—যার বিশেষ দাম এতদিন রোজার দেয়নি। কিন্তু আজ এইক্ষণে ওগুলোকেই আঁকড়ে ধরল ও। এবং এই ব্যাপারে ওর মনের চাইতে দেহের ক্রিয়াই বেশী। আনেৎ-এর আবেগ-ঢালা উৎসাহ-ব্যাকুল মনটাকে ওর অত্যন্ত ভালো লাগে। অবশ্য যতক্ষণ রোজারের অসুবিধায় পড়বার মত কোনও ব্যাপারে উৎসাহটি সক্রিয় হ'য়ে না ওঠে। তার প্রকৃতির সহজ-ঋজুতায় গোপন রাখেনি আনেৎ যে সে রোজারকে ভালোবাসে। এটুকু রোজার পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে যে কিছুতেই আনেৎ এ বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না।

এদিকে পাশের মানুষটির চিত্তের রঙ্গমঞ্চে বিবেকের যে খেলা চলছে, ভাবতেও পারেনি রোজার। এত ভালোবাসে রোজারকে আনেৎ যে মানুষটার আজের এই দীন কৃপণ মূর্তি দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না ও। নিজেরই দেখার ভুল। এই কথাই বিশ্বাস ক'রতে পারলে যেন বেঁচে যায় ও। হাতড়ে বেড়ায়, যদি আর কোন অবলম্বন পায় হাতের কাছে। আচ্ছা বেশ তো। স্বাধীনতা যদি নাই দেয় রোজার—তার জীবনের কোন অংশে প্রতিষ্ঠা ক'রবে সে একে! কিন্তু মন যেন কিছুতেই শুনতে চায় না যদিও বাধ্য হ'য়ে আজ নূতন পথে পা বাড়াতে হয়েছে। ওর স্থান হবে শুধু খাবার টেবিলে, ড্রইংরুমে আর শয়ন-কক্ষে। ঐটুকুতেই ওর গণ্ডী রচিত হবে রোজারের আত্ম-প্রাধান্যে—যার মধ্যে এক বিন্দুও ছলা-কলা নেই, কৃত্রিমতা নেই। নিজের কথা মিঠে ক'রে সে শোনাবেও হয়ত, আনেৎ-এর থাকবে শুধু মাথা নেড়ে সায় দেয়া। সহকর্মীর মত স্ত্রীর সাথে সে তার রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করবে, তার পর মর্শ নেবে, সে-মানুষ রোজার নয়। সামাজিক জীবনে স্ত্রীর পৃথক সত্তাকে যেমন সে স্বীকার করে না, এ অধিকারও সে নিশ্চয়ই দেবে না। যে মেয়ে ওকে ভালোবাসবে সে তার সবখানি ওকে দেবে আর ওর কাছ থেকে ছিটে ফোঁটা পেয়ে সে ধন্য হবে—রোজারের মতে স্বাভাবিক রীতি তাই। আবহমান কাল থেকে তাই হ'য়ে আসছে। শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে চিরকাল পুরুষ জেনে এসেছে সে যা দেয় নারীকে তার ওজন বেশী না হ'লেও দাম অনেক বেশী। সনাতন সেই শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ওর মজ্জায়। কিন্তু ফরাসী পুরুষের স্বভাব-সৌজন্যে তা স্বীকার করবে না রোজার। যদি কোনদিন আনেৎ স্বামীর নজীরে স্ত্রীর অনুরূপ অধিকার দাবী করতে যায় তবে হয়তো হেসে সে বল্‌বে :

'দুটো এক কথা নয়।'

'কেন নয়?'

হয়ত উত্তর এড়িয়ে যাবে রোজার। বিশ্বাসকে তর্কের হাটে নামালে ভাঙার ভয় বেশী থাকে। অন্তরের বদ্ধ-মূল বিশ্বাসকে নিবারণ সে করবে না। আনেৎ ওর বিশ্বাস ভাঙতে চাইবে। কিন্তু ভুল পথে। প্রথমতঃ নিজের মত ওর ওপরে চাপাবার ব্যর্থ প্রয়াস, বোঝাবুঝির একটা সাধারণ সূত্র খুঁজে পাওয়ার, এবং

আবেদন নিবেদনের চেষ্টা, সব কিছুই যেন নূতন ক'রে আনেৎ-এর ওপরে ওর ক্ষমতার সাক্ষ্য দেবে। অহংকারী হ'য়ে যেন ওঠে মানুষটা। সহসা হয়ত আনেৎ-এর ধৈর্য-চ্যুতি ঘটবে। কথা ব'লতে গিয়ে গলার স্বর কেঁপে উঠবে। রোজার সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে ; ওরা যা চায়,—প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে তথাস্তু ব'লে যায় অকাতরে। এই ওর কৌশল। যেন গানের সুর। সব যেন ওর কাছে গান। এর অপমান গিয়ে মর্মে বাজে।

আরো অনেক প্রশ্ন আছে। সিল্‌ভীর সঙ্গে সম্পর্কের ওপরেও আঘাত আসবে। কারণ এ-সমাজে স্বাধীনাদের স্থান নেই। তারপর সিল্‌ভী দরজীর কাজ করে। এমন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে—সে নিজেদের হোক আর বৌ-এর হোক—কিছুতেই মুখে চুন-কালি মাখতে রাজি হবেন না ব্রিসটরা। লুকিয়ে রাখতে হবে ব্যাপারটা। কিন্তু কিছুতেই রাজি হবে না সিলভী, আনেৎ নিজেও হবে না। কারণ ওদের আত্ম-সম্মানে ঘা পড়বে। আনেৎ রোজারকে ভালোবাসে। তাকে ও আরও তীব্র কামনা দিয়ে চায়। কিন্তু তাই ব'লে সিল্‌ভীকে বিসর্জন দিতে পারবে না। সিল্‌ভীকে ও অতিরিক্ত ভালোবাসে। ও ভোলেনি, এই ভালোবাসাই ওকে বার বার মানস-লোকের গভীরতম গভীরে নিয়ে গেছে। ও ছাড়া আর কেউ জানেনা এ খবর। সিল্‌ভীও নয়। হয়ত বা খানিকটা আন্দাজ ক'রে থাকবে ও। রোজারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপনের মুহূর্তে সিল্‌ভীর কথা বলেছে আনেৎ একেবারে প্রাণ ঢেলে দিয়ে। কৌতুকে মনে মনে হেসেছে রোজার। হৃদয় যেন ছুঁয়েও গেছে। হয়তো বা এ আনেৎ-এর জীবনের পেছনে ফেলে-আসা অধ্যায় বলেই। বর্তমানেও এই সম্পর্কের জের চলুক এ চায় না রোজার। বরঞ্চ কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে গোপনে এর উচ্ছেদ সাধন করবে, এই সংকল্পই ও ক'রে রেখেছে মনে মনে। নিজের স্ত্রীর ভালোবাসার ব্যাপারে কারো সঙ্গে বখরাদারী করতে ও চায় না। তাই তো ! 'নিজের স্ত্রী…' যেমন 'এই কুকুরটা আমার…' মালিকানার পাকা হিসেব…যে পরিবারের মানুষ…

থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। তবু রয়ে গেল আনেৎ। বাইরে আদর আপ্যায়নে পরিবৃত আনেৎ। কিন্তু মালিকানার ফাঁস দিনে দিনে দিনে শক্ত

হ'য়ে ওঠে। মা মেয়ের গার্হস্থ্য-বৈরতন্ত্র হাজারো খুঁটিনাটির মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করে। হরেক রকমের মশলায় ওদের মন তৈরী—। ওরা সব জানে—সংসারের কথাই হোক আর বিশ্ব-সমস্যাই হোক; রোজকার আট-পৌরে জীবন হোক অথবা জীবন-সমস্যাই হোক। ওদের পৃথিবীটা, চিরকালের জন্য পাকা-পোক্ত ক'রে কংক্রীটে গাঁথা হ'য়ে গেছে। সব গোনা গাঁথা, মাপা। আগে থেকে বন্দোবস্ত করা আছে সব। কোনটাকে সুখ্যাতি করবে—কোনটা গ্রহণ, কোনটা বর্জন করবে—একেবারে তালিকা-বন্দী করা আছে সব। মানুষের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, চিন্তা কাজ সব কিছুর বিচার হবে ওদের বিচার-শালায়;—ওখানে আপীল চলবে না। ওদের বাঁকা হাসি আর কথার ভঙ্গি শুনে তর্ক করার ইচ্ছেই হয় না।

'মনের রাস্তা দুটো হয় না, বাছা!' ওরা প্রায়ই বলে।

একটাই বা কেন হবে, ওর নিজস্ব রাস্তা একটা আছে বৈকি—এই কথাটাই আনেৎ মাঝে মাঝে বোঝাতে চেয়েছে।

মৃদু হাসির সঙ্গে জবাব এসেছে: 'পাগলী মেয়ে!'

আনেৎ এক মুহূর্তে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে।

আনেৎ এ বাড়ীর বৌ হ'বেই ওরা ঠিক ক'রে নিয়েছিল। একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে এই যা। পাঠ আরম্ভও ক'রে দিয়েছে—একেবারে প্রথম থেকে। ব্রিসটদের আপন পাঁজি-পুঁথি—তার আলাদা বার-তিথি মাস বছর, পাল-পার্বন; এখানে সমাজ রয়েছে, রয়েছে পারীতে; আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব—তাদের সাথে আসা যাওয়া, মেলা-মেশা, ভালমানুষি, কুটুম্বিতা, ডিনার ইত্যাদি, অজস্র কর্ম তালিকা। বাইরে 'আর পারিনে,' ব'লে হাঁপান বটে গৃহিনীরা, কিন্তু এগুলো আছে ব'লেই তাঁরা আছেন। এসবই ওদের আসল গর্বের বস্তু। আর সর্বদা এই সব নিয়ে ব্যস্ত থেকে থেকে—কাজ করছি ব'লে মিথ্যে হ'লেও, সান্ত্বনা মেলে। চব্বিশ ঘণ্টায় এই কেতা-দুরস্ত যান্ত্রিক জীবন আর তার মিথ্যে গ্লানি অসহ্য লাগে আনেৎ-এর। সব যেন একেবারে আগে থেকে ধরে বেঁধে দেওয়া। কাজ, স্ফূর্তি—হাঁ স্ফূর্তিও আছে বৈকি ওদের··· সব আগে থেকে ঠিক করা, বিধি-বদ্ধ ভাবে।

…উঃ কি মজাই না হয় যখন হঠাৎ উৎপাৎ আসে…। কিন্তু যত উৎপাৎই আসুক, কোন অজুহাতেই ছুটি নেই। আনেৎ-এর মনে হয় ওকে যেন একটা পাঁচিলের মধ্যে ইঁটের মত ক'রে গেঁথে দিয়েছে·কেউ চুন সুরকী দিয়ে…।

অসহ্য লাগে এ-জীবন।

মনে হ'তে পারে আনেৎ-এর মত অমন অফুরন্ত কর্ম-শক্তিকে দাবিয়ে রাখা যায় না কিন্তু ও যেন একটা বিষম স্নায়বিক উত্তেজনার ঘোরে চলেছে। যে-ভাবনা মন জুড়ে আছে, অহোরাত্র ভাবনার ফলে সেটা কে অন্যরকম দেখায়। দিনের বেলা ছোট খাট দু'চারটে যে-কথা শোনে, রাতের বেলা, ওকে একলা পেয়ে সেই কথারা দৈত্য-দানব হ'য়ে ওঠে। অনবরত তাদের সঙ্গে লড়াই চলে; নিজেই ভয় পেয়ে যায় সে-সাংঘাতিক লড়াই দেখে। কেবলি মনে হয়, এবারে হার। আর কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে বুঝি পারবে না। সে-শক্তি কোথায় দেহে? বড় দুর্বল লাগে, নিজের ওপরে বিশ্বাস নেই; ভয় করে নিজের প্রকৃতিকে। বারে বারে কোথা থেকে একি চাঞ্চল্য ওর পীড়িত মনটাকে কেবলি নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে আচমকা এই দমকা হাওয়ার ঝট্কা এসে সব তচ্‌নচ্ ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারে না আনেৎ। জানে না ঐশ্বর্যময়ী আনেৎ, ওর সত্তার বিভব-বৈচিত্রের মধ্যে নূতন একটা সঙ্গতির সুর বাজছে; ধীরে ধীরে জীবনের মধ্যেই তার উপলব্ধি হবে। আজ তারই সৃষ্টির আলোড়ন চলছে ওর মধ্যে। তাই এ বিক্ষোভ, তাই দেহ-মনের এ চাঞ্চল্য। আজ চারদিকে ওর বিপদ্।

ভালোবাসার মধ্যে আজ সংশয় আনেৎ-এর, তাই এ-চাঞ্চল্য। জানে না ও—মনে হয় প্রেম ওর শুকিয়ে গেছে…তবু যেন 'পাত্র মোর রিক্ত হয় নাই…'। দ্বন্দ্ব চলেছে হৃদয়ে আর মনে; মনে আর ইন্দ্রিয়ে। মনের ভুল ভেঙ্গে গেছে, ঘুচে গেছে তার চোখের রং। সত্যকে সে দেখছে। কিন্তু ভুল ভাঙ্গেনি হৃদয়ের। কামনার বস্তুকে হারাবার ভয়ে ব্যাকুল দেহ…প্রবৃত্তিও বলে—ছাড়ব না।

আনেৎ বোঝে। মাথা ওর হেঁট হ'য়ে যায়। বলিষ্ঠ মন দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ তোলে:

'আমি ভালোবাসিনে, আর ভালোবাসিনে…!' কেন ভালোবাসিনে, রোজারের মুখেই তার জবাব খুঁজে পায় ওর বিদ্রোহী চোখ।

রোজার বোঝে না কিছুই। স্নেহ দিয়ে, প্রেম দিয়ে, ফুলে, উপহারে, আনেৎকে ঘিরে রেখেছে ও। ভেবেছে খেলায় জিৎ হয়েছে ওর। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেনি পোষ-না-মানা ওই মেয়ে আড়াল থেকে ওরই দিকে তাকিয়ে ব'সে আছে, বরণ-মালা হাতে। 'তোমায় আমি স্বীকার ক'রলেম' ব'লে যে-মানুষ ওর সামনে দাঁড়াবে তারই কণ্ঠে ওই মালা পরাবে বলে হৃদয় ওর উন্মুখ হ'য়ে আছে। কিন্তু রোজার ওই যাদু-মন্ত্র উচ্চারণ ক'রতে পারল কই? [হয়ত' তার কারণ ছিল ওর] বরঞ্চ অবিমৃষ্যভাবে বিপরীত কথা ব'লে আনেৎকে আঘাত দিয়েছে। ওপর থেকে বোঝা যায়নি, কিন্তু ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে গেছে ওর হৃদয়। পর-মুহূর্তেই রোজার ভুলে গেছে। কিন্তু ভোলেনি আনেৎ। ওর বুকের মধ্যে গাঁথা হ'য়ে গেছে সব কথা—দশ দিন, দশ দিন কেন, দশ বছর পরেও প্রতিটি কথা ও মুখস্থ ব'লে যেতে পারত—স্মৃতি ওর এতটুকু ম্লান হয়নি, শুকোয়নি ওর বুকের কাচা ঘা। কিছুতেই ভুলতে পারলে না। কেমন ক'রে ভুলতে হয় জানে না ব'লে নিজকে ও তিরস্কার কম করেনি। মেয়েরা ভোলে না, ভুলতে জানে না। এমন কি জ্ঞানে গুণে শ্রেষ্ঠ যে মেয়ে, প্রিয় জনের অপরাধ ক্ষমা করতে পারলেও, ভুলতে পারে না।

মিহি সুতোয় মিহি ক'রে বোনা প্রেমের বস্ত্রখানিতে ছিদ্র দেখা দিল। কাপড়খানা বেশ টান ক'রে আঁট সাঁট ক'রে মেলা, তবু এতটুকু নিশ্বাসেই তা কেঁপে ওঠে। পারিবারিক বৃত্তের মধ্যে, বংশগত দোষ-গুণ-বৈশিষ্ট্যে-আঁট ব্রিসট রোজারকে দেখে, তার কঠিন নীরস বাগাড়ম্বর শুনে এবং সাধারণ মানুষের প্রতি ওর অবহেলা দেখে আনেৎ ভাবে :

'রোজার ঝ'রে যাচ্ছে! আজ ভালো লাগার মত যাও বা আছে, ক'বছর পরে তাও তো থাকবে না ও!'

দিব্য চক্ষুতে ও দেখতে পেল—বিবাহের পর চব্বিশ ঘণ্টার জীবনের প্রাঙ্গনে যেদিন এসে দাঁড়াবে, বড় বেদনাকর ভাবে মোহ-ভঙ্গ হবে সেদিন। সংঘর্ষ বাধবে যা দু'জনের পক্ষেই অত্যন্ত গ্লানিকর হবে।

রোজারকে এখনও ভালোবাসে বলেই পরিণতিকে ও দুহাতে ঠেকাতে চায় আজ।

ইষ্টারের দুদিন আগে—রাতে ও একেবারে মন স্থির ক'রে ফেলল।···কি ভয়ানক রাত···কি ভয়ানক তার ইতিহাস···কত উত্তপ্ত কামনার কণ্ঠরোধ করতে হ'ল···কত অবাধ্য দুর্মর আশাকে পায়ের তলায় দলে পিষে ফেলতে হ'ল···। কল্পনায় ঘর বেঁধেছিল রোজারের সঙ্গে···কল্পনার তুলি দিয়ে আঁকা কত সুখের কত গান গেয়েছিল আপন মনে···সব ছেড়ে যেতে হবে···পথের মাঝে দু'হাতে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে যেতে হবে সব···! এতদিন পরে মানতে হবে, সব ভুল! যা কিছু এতদিনকার জানা, মানা···সব ভুল! মানতে হবে সুখ নেই মানুষের অদৃষ্টে!···

অন্য মেয়ে হ'লে এত বড় সৌভাগ্যটাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারত না। কেন, ওই বা কেন পারলে না গ্রহণ করতে!···একটু খানি ছেড়ে দিতে পারলে না!···না, পারলে না আনেৎ। কি বিশ্রী এই জীবন! প্রেমও চাই, আবার মুক্তিও চাই···। দুটোর কোনটাই না হ'লে জীবন চলে না। কিন্তু সামঞ্জস্যের পথ কোথায়? লোকে বলে—ত্যাগ। ত্যাগ নইলে কিসের ভালোবাসা! কিন্তু বৃহৎ প্রেমের অধিকারী যারা, তারাই যে আবার মুক্তি-পাগল। বলিষ্ঠ মানুষ তারা—অন্তরে বাহিরে সব খানিই বল। প্রেমের কাছে মর্যাদাকে বিলিয়ে দেওয়া···তারা মনে করে আত্মাবমাননা···প্রেমের অবমাননা···। না, অত সহজ নয় এই প্রেম তত্ত্ব···খৃষ্টীয় শাস্ত্রের কথা, নীটশের নীতি কথা, অহংকার-নিরংকার-তত্ত্বের মত অত সহজ নয়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য: তেমনি প্রেমও বলহীনের দ্বারা লভ্য নয়। বল কাকে বলে? দুর্বলতার উল্টোটাই বল নয়, যেমন পাপের উল্টো পিঠে নয় পুণ্য। দু'টোই বিপরীত-ধর্মী পৃথক পৃথক শক্তি-সত্তা, গুণ, ধর্ম।···আমাদের সত্যকার জীবন-দর্শনে সামঞ্জস্যই একমাত্র সত্য ধর্ম হওয়া উচিত। কিন্তু মানুষের সমাজ মিথ্যের রাংতায় মোড়া তথাকথিত ত্যাগ আর নিপীড়নকেই একমাত্র ধর্ম ব'লে জেনে ও মেনে এসেছে। কিন্তু আনেৎ মিথ্যে বলবে কি ক'রে?

তাহ'লে? কঃ পন্থাঃ? পলায়ন? এই গোলক ধাঁধা হ'তে যত শিগ্‌গির পারো, পালাও আনেৎ। যে ক'রে হোক যেতেই হবে! যখন ভালো ক'রে জেনেইছ এই বিবাহে তুমি বাঁচবে না—তখন আর দেরী কেন? কালই তাহ'লে··· 'ছিন্ন করো ফুলের মালা, ঘুচিয়ে দে তোর সজ্জা···'! শেষ ক'রে দাও এই মিথ্যে!'

শেষ? কল্পনার চোখে দেখতে পায় আনেৎ···সমস্ত পরিবার স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে এই আকস্মিক ব্যাপারে; ওর নিন্দায় মুখর হ'য়ে উঠবে চারদিক।··· উঠুক! এ সব তো যেমন তেমন। কিন্তু···রোজার!···অন্ধকারের মধ্যে রোজারের মুখখানা ভেসে ওঠে···কি নিদারুণ ব্যথা পাবে সে।···বাঁধ ভেঙে নূতন আবেগের উন্মত্ত জোয়ার নামে···সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। বুকের মধ্যে আগুন জ্বলছে···চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে বিছানায় আনেৎ স্তব্ধ হ'য়ে··· কঠিন হিম-শিলার মত; চোখ খোলা, হাত দু'খানি বুকের ওপর, যেন অশান্ত হৃদ্‌পিণ্ডটাকে দুই হাতে চেপে রেখেছে।···'রোজার! আমার রোজার!···' অন্ধকারের বুকে ওর নীরব মিনতি আছড়ে পড়ে: 'আমায় ক্ষমা কর! ব্যথা তোমায় না দিয়ে পারলেম না। দিতে চাইনি···না: পারছিনে! পারছিনে!'

তারপর প্রেমের এমনি উত্তাল বন্যা নামে সব ছাপিয়ে ভাসিয়ে, অনুশোচনায় মরে যায় ও। প্রায় ছুটে যায়···ঘুমন্ত রোজারের শয্যাপ্রান্তে লুটিয়ে প'ড়ে ওর হাত দু'খানিতে চুমু খেয়ে বলবে:

'সব ক'রব আমি, তুমি যা চাও তাই ক'রব···'

সে কি? এখনও রোজারকে ভালোবাসো আনেৎ?···বিদ্রোহিনী মাথা নেড়ে ওঠে: 'না, কক্ষনও না···আর ভালোবাসিনে, একটুকুও না···'

এ যে কত বড় মিথ্যে কথা!···

'ভালোবাসিনে?' মিথ্যে···মিথ্যে ছলনা! ভালোবাসা ওর মরে নাই, আরও উজ্জীবিত হ'য়ে উঠেছে। হয় তো এ-ভালোবাসা ওর সত্তার উত্তমাংশের উপচার নয় [কিন্তু কিইবা উত্তম, আর কিই বা অধম!]! তা বৈকি! উত্তমও আছে, অধমও আছে। দেহ আর আত্মা।···শ্রদ্ধা

ফুরিয়ে গেলে ভালোবাসাও যদি ফুরিয়ে যেত! ভারী আরামের হ'তো!···
প্রিয়ের হাতের নিপীড়ন কখনও নারীর প্রেমকে হত্যা ক'রতে পারেনি।
কিন্তু জীবন বিড়ম্বিত হয়েছে, যেখানে ভালোবাসতে হ'য়েছে জোর ক'রে।···
আজ আহত বেদনায় জর্জর আনেৎ—কোথাই বা সান্ত্বনা! বিশ্বাসের ভূমি
নাই—আত্মবিশ্বাস নাই, রোজারের গভীর প্রেম নাই। মনের গোপনে
নিরালায় ব'সে যত আশার জাল বুনেছিল, সব আজ ছিঁড়ে গেছে। আশা-
ভঙ্গের তীব্র বেদনায় ও জর্জরিত। রোজারকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে একান্ত ক'রে
ভালোবাসে ব'লেই ও রোজারের কাছ থেকে ওর স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতি
চেয়েছিল। চেয়েছিল সাধারণ মেয়ের মত নিজেকে ডালি দিয়ে যৌথ-জীবনের
নিষ্ক্রিয় অংশীদার শুধু না হ'য়ে আরও বেশী কিছু হ'তে। স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে ও
তার শ্রদ্ধাবতী, নিষ্ঠাবতী সহচারিণী হবে। কিন্তু রোজার তা বুঝল না তার
কাছে ওর এ মহা-দান মূল্য পেল না। লাঞ্ছিত প্রেমের ক্রোধে ও বেদনায়
আনেৎ মুহ্যমান হ'য়ে পড়ে।···

'না না আমি ভালোবাসিনে আর রোজারকে—বাসিনা—বাসবনা' দেহ
অবসন্ন···বিদ্রোহের হুংকার মিলাব'র আগেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ও। সুষুপ্ত
গভীর রাত্রির নীরবতা···মুক্তির হিম-শৈলের নীচে ব'সে আনেৎ আগুন হ'য়ে
জ্বলে···কেবলি আনেৎকে গ্রাস করতে না চেয়ে রোজার যদি একটুখানি নিজেকে
দিত—দয়া ক'রে করুণা ক'রেই না হয়, যদি আভাসে, ইঙ্গিতে একটু জানতে
দিত তাহ'লে পরম আনন্দে ও ওর সব বিলিয়ে দিতে পারত ওর কাছে।
একথা জানাতে পারবে না আনেৎ, চায়ওনা—থাক ওর মনে মনেই। কেবল
একবার ভুবার খোল তুমি রোজার। ছাড়তে তোমায় কিছুই হবে না···কোন
ত্যাগ-স্বীকার করতে হবে না···শুধু হৃদয় মেলে একবারটি জানতে দাও তুমি
আমায় সত্যি ভালোবাসো···। কিন্তু তাতো হবার নয়। রোজার ভালোবাসে
তার নিজের ধরনে—আনেৎ-এর ফরমায়েস-মত নিরীখ সে পাবে কোথায়! এ
দিক দিয়ে ও ভাবেওনি। আনেৎ-এর এইসব দাবীকে ও নেহাৎই গুরুত্বহীন
মেয়েলী দাবী ব'লে নিয়েছে—যা হাসিমুখে শুধু শোন। কি চায় ও? অমন
ক'রে কাঁদছে কেন ছাই! রোজারকে ভালোবাসে, বেশ তো—তার কি?···

'তুমি আমায় ভালোবাসো, বাসো না? বলো, বাসো…আর চাইনে কিছু…ওই আমার সব চাওয়ার সার।'

'আঃ আবার ওই কথা! ভোলোনি দেখছি…!'

অশ্রুর সঙ্গে হাসি মেশে। বেচারা! রোজার রোজারই। সে-দোষ তো ওর নয়। আমার যা তাই থাকব। বদলাতে চাই না। না ও, না আমি। শুধু একসাথে থাকা আমাদের চলবে না…

চোখ মোছে আনেৎ।

আর নয়…আর দেরী নয়…এবারে অবসান হোক্…

[চোদ্দ]

সারা রাত ঘুম হয়নি। শেষ রাতের দিকে ঘণ্টাখানেকের জন্য চোখের পাতা দুটো লেগেছিল মাত্র। ভোরে উঠল মন একেবারে সংকল্পে বেঁধে। দিনের আলোর সাথে সাথে মন অনেকটা সুস্থ। উঠে কাপড় চোপড় পরে নিলে,—রোজকার মত পরিপাটি ক'রে চুল বাঁধলে, অন্যদিনকার চেয়ে আর একটু বেশী যত্ন ক'রে প্রসাধনও ক'রলে। কঠিন হাতে মনের দুয়ারে জানালা এঁটে রেখে দিলে, পাছে আবার দ্বিধা আসে।

দু'টা আন্দাজ অন্য দিনের মতই রোজার বুকে খুশি দুলিয়ে ওর দরজায় এসে ঘা দিল—বেড়াতে যাবে দু'জনে। রোজ যায় এমনি। সঙ্গে চল্ল একটা কুকুর—ছট্‌ফটে, চঞ্চল জীব, এক মুহূর্ত স্থির হ'য়ে থাকতে পারে না—যেন একটি মূর্তিমান ঘূর্ণি হাওয়া। ঘেঁষা ঘেঁষি গাছে ছাওয়া ঘন বন—গাছের তলায় তলায় পায়ে হাঁটা পথ। তাই ধরেই চলল ওরা। তরুণ শস্পে প্রকৃতির যৌবনের স্বাক্ষর! শ্যামল বনানীর মর্মে মর্মে আলোর তীর বেঁধা। গাছের শাখা পাখীর কলস্বরে আর সঙ্গীতে মুখর। আনেৎদের পায়ের শব্দে শব্দে ওরা উচ্চকিত হ'য়ে ওঠে; ডানার ঝটপট্, পাতার খস্‌খস্, ডালে ডালে সংঘর্ষের আওয়াজ তুলে সারা বনময় তাদের উদ্‌ভ্রান্ত পলায়ন—আর ছোটাছুটি। কুকুরটাও মেতে ওঠে,

কান খাড়া ক'রে, নাক তুলে হাওয়া থেকে গন্ধ শুষে নিয়ে সেও এদিক আর ওদিক দৌড়ে ঝড় তোলে। দাঁড়কাকের দল কর্কশ স্বরে কোলাহল করে; ওক গাছের নিরালা কোটরে বসে ঘুঘু মিথুন ডেকে চলে…। আর দূরে…বহু দূরে…দূর হ'তে দূরে…আরো দূরে কোকিলটা আকাশের গায়ে ডানার লেখায় বৃত্ত রচনা ক'রে ক'রে তার শাশ্বত কালের আনন্দের ঝরণা-ধারা ঝরিয়ে যায়… শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন। বসন্ত…বসন্ত এসেছে…বসন্তের নেশায় মাতাল হয়েছে পাখীটা…

উল্লসিত প্রকাণ্ড একটা কুকুরের মতই কোলাহলে, হাসিতে, ঝাপাঝাপিতে কুকুরটাকে মাতিয়ে তোলে রোজার। কয়েক পা পেছনে পেছনে চিন্তাকুল মনে নিঃশব্দে চলেছে আনেৎ। এখানেই বলি!…না থাক…ওই মোড়টায় গিয়ে…

রোজারকেও দেখছে নিরীক্ষণ ক'রে, আর শুনছে বনানীর সঙ্গীত…ও বলার পর কেমন হবে এই বনটার চেহারা!…মোড়টা চলে গেল…বলা হ'ল না…ধরা গলায় একবার ডাকল—'রোজার!' নিশ্বাসের মত ফোলাল স্বরটা। রোজার শুনতে পেল না, খেয়ালও করল না কিছু। আনেৎ-এর সামনে নীচু হ'য়ে—কিছু ভায়োলেট ফুল তুলে নিল—তারপর আবার বক্ বক্ ক'রে চলল… আনেৎ আবার ডাকল—'রোজার!' ওর স্বরে এমন একটা ক্লেশ ফুটে উঠল, রোজার-এর কান এড়াল না। চমকে উঠে ফিরে তাকাল ও…আনেৎ-এর মুখে অস্বাভাবিক একটা পাণ্ডুরতা; কি যেন থম্ থম্ করছে ওর চোখে মুখে। কাছে এল রোজার…কেমন ভয় করতে লাগল।

আনেৎ বলল:

'রোজার! আমাদের ছেড়ে যেতে হবে।'

রোজার স্তম্ভিত…নির্বাক…। ওর মুখে চোখে হতাশা কালো হ'য়ে ওঠে। বলতে গিয়ে কথা মুখে বেধে যায়:

'কি, কি, বলছ তুমি? কি বলছ?'

ওর চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে আনেৎ দৃঢ়ভাবে বলে:

'আমায় চলে যেতে হবে রোজার। জানি কষ্ট হবে, তবু যেতে হবে। আমি পরিষ্কার বুঝেছি, তোমার স্ত্রী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না…'

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল ও, রোজার বাধা দিল : 'না না, তা নয়, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। শান্ত হও, শান্ত হও আনেৎ! তুমি কি পাগল হ'লে!...'

'না রোজার, আমায় যেতেই হবে।' আনেৎ বলে।

'যাবে? তুমি?' চীৎকার ক'রে ওঠে রোজার : 'দেবনা যেতে...'

আনেৎ-এর বাহু দুটো ধরেছে রোজার নিষ্ঠুর কঠিন হাতের মুঠোয়, কোমল মাংস যেন পিষে যাচ্ছে। তারপর চোখ পড়ে আনেৎ-এর মুখের দিকে...উদ্ধত গর্বে কঠিন মুখ, বরফের মত শীতল : সমস্ত শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে আছে ও-মুখ। রোজার বোঝে, আর আশা নেই...ওর পরাজয় সম্পূর্ণ হয়েছে।

'আনেৎ! আমার রাণী! যেয়োনা, যেয়োনা...। কে বললে অসম্ভব! মোটেই অসম্ভব নয়...কি হয়েছে বলতো! কি করেছি আমি?'

কঠিন মুখখানিতে আবার করুণা জাগে। 'চল বসিগে, রোজার।' আনেৎ বলে।

[একটা শেওল-ঢাকা পাথরের ওপর নেহাৎ বাধ্য-শিশুর মত আনেৎ-এর পাশে বসে রোজার। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আনেৎ-এর মুখের দিকে... প্রতি কথায় মিনতি ঝরে।]

'শান্ত হও, শান্ত হও! শোন, বলছি। শান্ত হও, লক্ষ্মী! বিশ্বাস করো, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, কিছুতেই পারছি না...আমি কথাও বলতে পারছি না...'

'আর কথা নয়। কিছু শুনব না আমি।' চীৎকার করে রোজার : 'এ তোমার পাগলামী।'

'কিন্তু বলা যে দরকার।'

রোজার ওর মুখ চেপে ধরে। আনেৎ সরিয়ে নেয় নিজেকে। অন্তরের তীব্র দ্বন্দ্ব সত্বেও ওর সংকল্প শিথিল হয়নি। রোজার সে অনমনীয় শক্তির কাছে শক্তিহীন, পরাজিত, অভিভূত...প্রতিরোধ ছেড়ে শ্রান্ত, অবসন্ন দেহে, অসহায় হ'য়ে শোনে আনেৎ-এর কথা। ওর চোখের দিকে তাকাবার সাহস

নেই। আনেৎ ব'লে যায় তার সিদ্ধান্তের কথা, যা আজ ওর বলা চাই-ই।‧ না বললে চলবে না। তুহিন-হিম, আবেগহীন, বেদনা-ক্ষরা স্বর। হঠাৎ হঠাৎ গলা বেঁধে যায়। নিশ্বাস নেবার জন্য থামলও দু'একবার। ভাষা অতি-স্পষ্ট, অনুগ্র, সুনির্বাচিত এবং সেই কারণেই অমোঘ বজ্রের মত তার জোর। আনেৎ এক সঙ্গে থাকতে সত্যি চেয়েছিল। প্রাণ মন দিয়ে, একান্ত ক'রে চেয়েছিল। প্রথম প্রথম আশাও ছিল। কিন্তু সে-সাধ, সে-স্বপ্ন ওর পূর্ণ হলো না। চিন্তায়, পরিবেশে, কাজে, সবটাতেই দু'জনের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। নিজেকেই দোষ দেয় আনেৎ। ও হৃদয় দিয়ে বুঝেছে, বিবাহিত জীবন ওর জন্য নয়। ওর নিজের অভিধানে, জীবন ও স্বাতন্ত্র্যের যে সংজ্ঞা রয়েছে তা কোন দিক দিয়েই রোজারের সঙ্গে মেলে না। হয়তো রোজারই ঠিক। ভুল আনেৎ-এরই। অধিকাংশ মানুষই, মেয়েরা সুদ্ধ, হয়তো রোজারের মত ক'রেই ভাবে। আনেৎ-এরই ভুল হ'য়ে থাকবে। কিন্তু ভুল হোক আর ঠিক হোক—আনেৎ যে কি রকম তা তো বোঝাই গেছে। সুতরাং আর অনর্থক একজনকে কষ্ট দেওয়া কেন? নিজেও তো কষ্ট কম পায় না। ওকে একাই থাকতে হবে—ঐ জন্যই ওর সৃষ্টি। অতএব রোজারকেও তার প্রতিশ্রুতির দায় হ'তে মুক্তি দেবে; নিজেও নেবে। আর বাদ বাকী যা আছে—তার জন্য কারো দায় নেই। কারণ দু'পক্ষের মধ্যে কোন রকম ছলনা ছিল না।

রোজারের মুখের দিকে ইচ্ছে ক'রেই তাকায় না। ঘাসের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে আনেৎ। কানে আসে ওর দ্রুত নিশ্বাসের শব্দ। এমনি ক'রে শেষ পর্যন্ত ব'লে যাওয়া, সে এক কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু তবু বলে গেল, তারপর সাহস ক'রে তাকাল একবার ওর মুখের দিকে। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগল। রোজারের মুখ যেন জলে ডোবা মানুষের মুখ। লাল টক্‌টকে মুখ; ঝড়ের মত নিশ্বাস বইছে। কাঁদবে তারও শক্তি নেই, মুঠো করা হাত দুটো উদ্‌ভ্রান্তের মত নাড়ছে। অনেক কষ্টে একটা নিশ্বাস নিয়ে—অত্যন্ত কাতর স্বরে বলে:

'না না না···আমি পারব না···'

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

বনের শেষে একটা ক্ষেত থেকে আসছে হল্‌ চলার কোলাহল। একজন চাষী কি যেন বলছে—তার কণ্ঠ ভেসে আসছে।

বিহ্বল আনেৎ হঠাৎ এসে রোজারের হাত ধরে। টানতে টানতে নিয়ে যায় পথ ছেড়ে বনে ; তারপর আরো দূরে, দূরে একেবারে বনের গভীরে…। বিবশ রোজার—তার দেহে এতটুকু শক্তি নাই। যন্ত্রের মত চলেছে সে আনেৎ-এর সাথে।

'না না…আমি পারব না…কি হবে আমার !'…অশ্রান্ত আর্তনাদ।

…রোজারকে শান্ত ক'রতে চেষ্টা করে আনেৎ ; কিন্তু হতাশায় বিহ্বল, উন্মাদ রোজার—বিধ্বস্ত তার প্রেম, বিধ্বস্ত পৌরুস ; যে-সুখ একেবারে ঘরের দুয়ারে এসে পৌঁছেছিল তাও মিলিয়ে গেছে…দশের দেশের কাছে অপমানে মাথা হেঁট…

জীবনের সংগ্রামহীন আরামে বিগড়ে-যাওয়া ওই বৃদ্ধ-শিশুটি কোন দিন শাসন পায়নি, প্রতিবাদ পায়নি। হাত বাড়ালেই মুঠি ওর ভরে উঠেছে। তাই আজের এই হার ওর সইল না ! একেবারে ভেঙে পড়ল। নিশ্চিত ব'লে যা কিছু ছিল সব ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। নিজের ওপর বিশ্বাস আর রইল না ; রইল না পায়ের তলায় মাটি। বেরুবার পথ পাচ্ছে না রোজার। এই গভীর বেদনা আনেৎকে গিয়ে আঘাত করে।

'ছিঃ লক্ষ্মীটি, কেঁদো না…কেঁদো না অমন ক'রে ! আবার ফলে ফুলে ভ'রে উঠবে জীবন…আমাকে দরকারই হবে না আর…'

তবু কান্না থামে না রোজারের।

'না না ওকথা বলো না…বলো না…' রোজার বলে: 'তোমায় ছাড়া আমার চলবেই না ; কোন কিছুতে আমার আর বিশ্বাস নেই…নিজের জীবনেও নয়…'

আনেৎ-এর সামনে নত-জানু হ'য়ে বসে পড়ে ও :

'যেয়ো না আনেৎ ! আমায় ফেলে যেও না…যা চাও, তাই হবে…সব…সব ঠিক যেমনটি চাও…'

আনেৎ জানে আজের এ-জোয়ারের মুখের কথা কাল আর থাকবে না। মনটা যেন কেমন হ'য়ে যায়। অতি কোমল ভাবে বলে :

'তা হয় না, বন্ধু! জানি অন্তর থেকেই বলছ, কিন্তু প্রতিশ্রুতি তো তুমি রাখতে পারবে না। যদিই বা পারো, কষ্ট হবে—তোমারও আমারও। চব্বিশ ঘণ্টা ঠোকাঠুকি চলবে...'

জগদ্দল পাথর! কিছুতেই নড়বে না। আনেৎ-এর পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে ছোট শিশুর মত বিহ্বল হ'য়ে কাঁদতে থাকে রোজার।

করুণায়, ভালোবাসায়, আনেৎ-এর বুকে আঘাত লাগে শেলের মত। সারা দেহ অবশ হ'য়ে আসে। এতক্ষণ শক্ত হ'য়ে ছিল, কিন্তু ওই অশ্রুর বন্যায় সব ভেসে যায়। নিজের কথা আর ভাবতে পারছে না, চিন্তায় ছেয়ে আছে শুধু রোজার। ওর হাঁটুর ওপরে রোজারের মাথাখানি—ওর অতি আদরের ধন। মাথায় গভীর আদরে হাত বুলিয়ে দেয়, সান্ত্বনা দেয়, সান্ত্বনা দেয় গভীর স্নেহ-সিক্ত ভাষায়। অসহায় শিশুটির মুখ দুই হাতে তুলে ধরে নিজের রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেয়। হাত ধরে ওঠায়, জোর ক'রে নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করে। অবশ ভাবে আনেৎ-এর হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয় রোজার। শুধুই কেঁদে চলেছে ও, অঝোর বুক-ভাঙা কান্না। এগিয়ে চলেছে দু'জন। মুখে গাছের ডাল পালা এসে লাগে। খেয়াল নেই। বনের দিকেই পা চলেছে ওদের...কিছু দেখছে না, কিছু বুঝছে না...জানে না কোথায় যাবে। আনেৎ টের পাচ্ছে ওর বুকের মধ্যে আবেগ আর ভালোবাসার ঢল নামছে। রোজারকে জড়িয়ে ধ'রে বলে :

'কেঁদোনা লক্ষ্মী! আমার রোজার! আমার সোনা! আমি সইতে পারছি না। কেঁদনা...আমি তোমায় ভালোবাসি।...সত্যি ভালোবাসি, রোজার!'

'না...বাসোনা।' রোজার আকুল হ'য়ে বলে।

'বাসি। এতদিন ধরে তুমি আমায় যত ভালো বেসেছ, তার সহস্র গুণ ভালোবাসি...বলো, বলো কি চাও তুমি! কি ক'রতে হবে আমায় বলো...। যা বলো করব...রোজার, আমার রোজার...'

সীমা শেষ হ'য়ে আসে। রিভিয়ারদের হাতা এসে যায়। নিজেদের বাড়ীখানা আনেৎ চিনতে পারে...। রোজারের দিকে তাকায় ও। সারা দেহ

জুড়ে কামনার ঝড় নেচে ওঠে, শিরায় শিরায় পেশীতে পেশীতে কামনার ঢেউ জাগে। যেন আগুনের ঝড়—ফোটা একেশিয়া ফুলের নেশা-ধরানো সৌগন্ধের মত কি যেন এক নেশায় মেতেছে ওর সমস্ত ইন্দ্রিয়। রোজারকে টানতে টানতে দরজার দিকে ছুটে চলে ও। নিরালা নির্জন পরিত্যক্ত বাড়ী। ঝিলমিলি সব বন্ধ। ভেতরে গাঢ় অন্ধকার। বাইরের কড়া রোদ থেকে এসে ভেতরের অন্ধকারে চোখ যেন অন্ধ হ'য়ে যায়। রোজার কি একটা আসবাবে ধাক্কা খায়। রোজারকে চালিয়ে নেয় আনেৎ-এর জলন্ত দু'খানি হাত—যে-হাতের মধ্যে ও ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে···না কিছু ভাবছে, না দেখছে, না জানছে। নীচের তলার অন্ধকার ঘরগুলো পেরিয়ে চলেছে আনেৎ···ওর অদৃষ্ট যেন ওকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে পেছন থেকে।···বাড়ীর পেছন দিককার সেই ঘরখানি, গত শরতে যে-ঘরে ওরা দু'বোন ছিল···আজও ওর আর সিলভীর দু'জনের শুভ্র দেহের সুবাস মিশে আছে আঁধারে···শয্যায় আজও সুপ্ত দেহের স্পর্শ লেগে আছে··· এগিয়ে চলে আনেৎ-এর পা, আর হাতে ধরা রোজার···উচ্ছ্বসিত করণায়, আর মাতাল আনন্দে আনেৎ আপনাকে উৎসর্গ ক'রে দেয়—প্রিয়ের হাতে।

[পনর]

নেশা যখন ভাঙল, অন্ধকার চোখে সয়ে এসেছে। ঝিলমিল্-এর ফাঁকে ফালি ফালি আলোর দল, বাইরে যে সুন্দর দিনটার সুরু হয়েছে তারি খবর নিয়ে নাচতে নাচতে ঘরের মধ্যে আসে। চুম্বনে চুম্বনে আনেৎ-এর নিরাবরণ শুভ্র দেহ ছেয়ে দেয় রোজার। ওর অন্তরের কৃতজ্ঞতা মুখের ভাষায় ফোটে না···

বলা শেষ হ'য়ে গেলে হঠাৎ নীরব হ'য়ে যায় ও। আনেৎ-এর বুকের পাশটায় মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকে···আনেৎও স্তব্ধ···নিথর···নিস্পন্দ···কি যেন স্বপ্নে ডুবে আছে। বাইরে পাঁচিলের কাছটায় গোলাপ-ঝাড়ে ভ্রমরের দল গুঞ্জনে মেতেছে। আনেৎ শোনে দূর হ'তে দূরে মিলিয়ে-যাওয়া গানের রেশের মত আকাশের দিগন্তে ওই মিলিয়ে যাচ্ছে রোজারের ভালোবাসা···

রোজারের ভালোবাসায় এরি মধ্যে ভাটা পড়েছে সে নিজেও বুঝেছে··· লজ্জায় দুঃখে মরমে মরে যাচ্ছে রোজার, তবু স্বীকার করতে মন সরে না। আসলে আনেৎ-এর এই অপ্রত্যাশিত আত্মদানে ওর মন বিরাট ধাক্কা খেয়েছে। বিচিত্র প্রকৃতি পুরুষের। নারীকে সে কামনা করে কিন্তু দয়িতের কাছে তার শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার অকুণ্ঠ আত্ম-নিবেদনকে সে রমণীর শ্লথ চরিত্রের পরিচয় হিসেবে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে।

আনেৎ একটু ঝুঁকে ওর মাথাটা দুই হাতে তুলে ধ'রে অনেক ক্ষণ চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে—কিছু বলে না, নীরবে বিষণ্ণ হাসি হাসে। রোজারের মনে হয় ওই গভীর দৃষ্টি ওর মর্মে গিয়ে পৌঁছেছে। সচকিত হ'য়ে ওঠে। সত্যটা জানতে দিলে চলবে না আনেৎকে। একটা কৃত্রিম মুগ্ধতায় গদগদ হ'য়ে বলে :

'আনেৎ, আর তো যেতে পারবে না তুমি। এবার বিয়ে আমাদের হতেই হবে।'

আবার আনেৎ-এর মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে। রোজারের মনটা পড়ে নিয়েছে খোলা পুঁথির মত ক'রে :

'না গো না' বলে আনেৎ : 'কিছুতেই হবে না।'

রোজার দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে :

'আমি চাই—'

'আমি চলে যাব।' আনেৎ বলে।

'কেন? কেন যাবে?' রোজার বলে।

কেন-র জবাব রোজার নিজেই জানে, তবু আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে ইচ্ছে হয়। আনেৎ ওর মুখ চেপে ধরে ; রোজার ক্রোধে, আবেগে ওর হাতে চুমু খায়···। কত ভালোবাসে ও আনেৎকে! এই ছলনায় নিজের কাছেই ছোট মনে হয় নিজেকে। আনেৎ কি দেখতে পেয়েছে ওর মন?···ওর ঠোঁটের ওপর আদর বুলিয়ে দিতে দিতে মিষ্টি হাতখানা যেন বলে :

'না না আমি কিছু দেখিনি···।'

দূর গ্রাম থেকে ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসে···। নিস্তব্ধ ঘর···। আনেৎ

নীরব···ওর বুক ভেঙে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে···আজই শেষ···আজই শেষ···চাপা স্বরে বলে : 'রোজার, চলো ফিরে যাই···'

দেহ দুটি বিচ্ছিন্ন হয়। খাটের পায়ের দিকে নতজানু হ'য়ে বসে রোজার আনেৎ-এর পাদুকাহীন পা দু'খানি কপালে চেপে ধরে···যেন সব দিয়ে প্রমাণ করতে চায়—'আনেৎ আমি তোমারি···' কিন্তু মন যে অন্য কথা বলে !

আনেৎ পোষাক পরবে, ঘরের বাইরে চ'লে যায় রোজার। সামনের দিকের বারান্দার দেয়ালে কনুই ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করে ; কানে আসে পল্লীর কর্ম কোলাহল ; এই মাত্র যে সুখের মুহূর্তগুলি শেষ হ'য়ে গেল তারই সুবাসে বুক ভরে আছে। দুর্বলতা আর গর্ব আর পরিতৃপ্ত কামনার আনন্দে বিহ্বল রোজার। নিজের কৃতিত্বে ও গর্বিত। মনে মনে বলে :

'বেচারা আনেৎ !'

আবার শুধরে বলে :

'আমার রাণী আনেৎ !'

বেরিয়ে আসে আনেৎ। সেই চির শান্ত প্রতিমা। কিন্তু বড় মলিন, বড় পাণ্ডুর···কে বলবে ওর নিরালার···একার আর একান্তের এই স্বল্পায়ু ক্ষণ ক'টিতে কত বড় ইতিহাস রচিত হ'লো কামনায় অনুশোচনায় আর ত্যাগের বেদনায়—? রোজারের চোখে কিছুই পড়ে না, সে আপনাতে আপনি ডুবে আছে। রোজার এগিয়ে যায় আনেৎ-এর সামনে, বলতে চায় : 'না, আনেৎ যেওনা।' আনেৎ নিজের মুখে আঙুল চেপে নীরবে ইঙ্গিত জানায় : 'চুপ, কথা কয়োনা।' বাগানের বেড়ার ধারে এসে একটা ঙ'থর্ণের ডাল ভেঙে নেয়, তারপর সেটাকে দু'খানা ক'রে আধখানা রোজারকে দেয়। গেটের কাছে এসে রোজারকে চুমু খায়।

আবার বনের পথে নীরব চলা। আনেৎ-এর মিনতি—কথা কয়োনা। রোজারের হাতে ওর হাত—ওর চোখ আধখোলা, মুখে মৃদু হাসি, রোজারের স্পর্শে দরদ। এবারে পালা বদলেছে···রোজার চালায়, আনেৎ চলে। রোজারের মনেও পড়ে না—একটি মাত্র ঘন্টা আগে এই পথেরই ধুলো ওর চোখের জলে ভিজেছে।

বনের গভীরে মহোল্লাসে সোগ্ন তুলে শিকারের পেছনে ধাওয়া ক'রে চলেছে কুকুরটা।

[ষোল]

পরের দিনই বিদায় নিল আনেৎ। বলল বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে—বুড়ী পিসীর ভারী অসুখ। এই ছলে ত্রিসটরা অবশ্য ভুলল না। কিছুদিন থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল যে আনেৎ ওদের হাত থেকে ফস্কে যাচ্ছে। কিন্তু আত্ম-সম্মানের দিক থেকে বাইরে সম্ভাবনাটাকে স্বীকার করতে পারেনি ; এবং হঠাৎ চলে যাবার জন্য যে কারণ আনেৎ দেখিয়েছে তা যে নেহাৎই ছল তা বুঝলেও না-বোঝার ভান ক'রতে হয়েছে। আনেৎ মাত্র কদিনের জন্য যাচ্ছে এই ভিত্তিতে সাময়িক বিদায়ের পালা অভিনয় করেছে শেষ পর্যন্ত।

আনেৎ ব্যথা পেয়েছে এই ছলনায়। কিন্তু তবু রোজারের অনুরোধে সে স্বীকার করেছে পারী পৌঁছুবার আগে কিছুই প্রকাশ করবে না। সামনা-সামনি অত বড় কঠিন কথা উচ্চারণ করাও সহজ নয়। অতএব বানানো হাসি, পালিশ করা কথা, কোলাকুলি—সবই রইল ওদের বিদায়ের পালায় ;—রইল না শুধু হৃদয়।

রোজার সঙ্গে এল ষ্টেশনে। অত্যন্ত বিষণ্ণ দু'জনেই। আবার ও অনুরোধ করে : 'বিয়েতে রাজী হও, আনেৎ!' রোজার ভদ্রলোক, এবং অতিমাত্রায় ভদ্রলোক। তাই ওর মনে হয় বিয়ে করতে ও বাধ্য। তাছাড়া মনও বলে—ওরে তোর জোর আছে যে! আনেৎ-এরই কল্যাণে ওকে সেই জোর বুঝিয়ে দেবার তোর অধিকার আছে। রোজার ভাবে, আনেৎ তো আত্ম-সমর্পণ ক'রেইছে ; তার নিজস্বতা সে পরিত্যাগ করেছে, সুতরাং আজ আর উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে আগেকার সে সাম্যের ভিত্তি নেই। সুতরাং বিবাহ ও দাবীই করবে এখন। আনেৎ স্পষ্ট দেখতে পায়—এখন যদি বিবাহে ও রাজী হয় তবে আগেকার চাইতে সহস্র গুণ শক্ত ক'রে প্রভুত্বের রাশ টানবে রোজার। অবিশ্যি ঔচিত্য হিসেবে বিবাহের অনুরোধ ক'রে ঠিকই করেছে ;

রোজার এবং আনেৎ সে জন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু তবু...প্রত্যাখ্যান করে। রোজার মনে মনে বিরক্ত হয়...আনেৎকে ও বুঝতে পারে না। [ওর ধারণা আনেৎ ওর কাছে চিরকাল খোলা-পুঁথি ছিল।] বিচার হ'য়ে ওঠে কঠোর—কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করে না। আনেৎ বোঝে—বেদনার সাথে মেশে ব্যঙ্গ কিন্তু জেগে থাকে চির-দরদী চিত্ত...[এ যে রোজারই...]

ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে ওর দস্তানা-ঢাকা হাতখানা ও রোজারের হাতের ওপর রাখে। রোজার চমকে ওঠে।

'আনেৎ!'

'ত্রুটি মনে রেখোনা রোজার, আমিও রাখব না। মার্জনায় সম্পর্কটাকে সহজ ক'রে নি চলো।' আনেৎ বলে।

রোজার কথা বলতে চায়, পারে না। হাত ধরাই থাকে। কেউ কারো দিকে চাইতে পারে না, কিন্তু অনুভব করে পরস্পরের চোখে উদ্বেল অশ্রুর সাগর কঠিন প্রয়াসে স্তব্ধ হ'য়ে আছে।

ষ্টেশন। এবারে সংযত হওয়া দরকার। রোজার আনেৎকে গাড়ীতে তুলে দেয়। আরো যাত্রী আছে—সাধারণ সৌজন্যের সীমা লংঘন করা চলে না, কিন্তু পরস্পরের চোখ প্রিয়ের প্রতিমাখানি যেন আকণ্ঠ পিপাসায় গণ্ডূষ ভরে পান করতে চায়। বাঁশী বাজে।

'আবার দেখা হবে—'

মনে সে-বাণীর প্রতিধ্বনি জাগে: 'হবে না, হবে না।' গাড়ী চোখের আড়াল হ'য়ে যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। রোজার বাড়ীর পথ ধরে। রাগে দুঃখে ও বিহ্বল। নিজের ওপরে রাগ, আনেৎ-এর ওপরে রাগ; ও যেন ফেটে খান খান হ'যে যাচ্ছে। মনে হয়...ছিঃ লজ্জা,...আরাম, আরাম, মুক্তি...

নির্জন রাস্তা...গাড়ী থামায় রোজার...ঘৃণায়, ভালোবাসায়, কান্নায় ও ভেঙে পড়ে।

[সতর]

আনেৎ বুঁর্ব হাউসে ফিরে এল এবং ঘরের মধ্যে বন্দী হ'য়ে রইল। ব্রিসটদের কাছে চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়ে ও বাইরের সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলে দিল। বন্ধুরা কেউ জানতেই পারল না যে ও ফিরে এসেছে। চিঠিগুলি অবধি খুলল না। দিনের পর দিন ঘরের মধ্যে কাটতে লাগল। এক পা বেরুল না। বুড়ী পিসী খেয়ালী মেয়েকে বোঝেনি কোনদিন। না বোঝাটাই অভ্যেস হ'য়ে গেছে। কাজেই ওর এই নির্জন বাসে তিনি ব্যাঘাত দিলেন না। আনেৎ-এর বহির্জীবনের পথ রুদ্ধ হ'ল। কিন্তু অন্তর্জীবনের দ্বার গেল খুলে। আহত কামনার তুফানে ওর চিত্তলোকের মৌন আকাশ পর্যুদস্ত; একলা থেকে সেই তুফানে নিজকে ও ছেড়ে দেয়···হাওয়ার বেগে ওলট্ পালট হ'য়ে যতক্ষণ না শ্রান্তিতে দেহ অসাড় হ'য়ে যায়। বেরিয়ে যখন আসে দেহ একেবারে ভাঙ্গা; ধমনী থেকে সমস্ত রক্ত যেন শুষে নিয়েছে; সারা মুখ গলা অবধি শুকিয়ে কাঠ; কপাল আগুন; হাত পা হিম বরফের মত। তারপর আসে তন্দ্রার অধ্যায়—স্বপ্নের ঠাস বুনট্ করা। দিনের পর দিন স্বপ্নে বুঁদ হ'য়ে থাকে ও। চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নেবারও চেষ্টা করে না। চারদিক থেকে এলোমেলো ভাবে মনটাকে তচ্‌নচ্ ক'রে দিয়ে যায়···গুরু গম্ভীর দুঃখ কখনও; কখনও তিক্ত-মধুর; মুখে ছাই-এর মত স্বাদ কখনও বা; কত হতাশা, বুককে দুলিয়ে-দেওয়া কত স্মৃতি—যখন তখন তীব্র নৈরাশ্যে সব আঁধার হ'য়ে যায়; কত গর্ব ও আবেগ; কখনও বা মনে হয়, সব ভেঙ্গে চুড়ে ধ্বংশ হ'য়ে গেল। কোন প্রতীকার নাই; অমোঘ নিয়তি,—যার কাছে মানুষের যত চেষ্টা যত প্রয়াস সব বৃথা···প্রথমে মনে হয় যেন ও পিষে যাচ্ছে, তারপর গভীর বেদনা···তারপর তাও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় বহু দূরগত ক্লান্ত বেদনার রেশের মধ্যে, যার সাথে মিশিয়ে আছে বিচিত্র এক সব-ভোলান অদ্ভুত নিবৃত্তি রাত···স্বপ্ন দেখে আনেৎ···

বনের মধ্যে একা ও।

দিশে-হারা হ'য়ে ছুটে চলেছে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে···গাছের ডালে ডালে কাপড় বেঁধে যায়, শিশির-ভেজা লতা-গুল্ম ওকে জড়িয়ে ধরে। নিজেকে মুক্ত করে অতি কষ্টে; কাপড় ছিঁড়ে ফালি ফালি হ'য়ে যায়। নিজের দিকে চোখ পড়ে···অর্ধ অনাবৃত দেহ···লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে আনেৎ। নত হ'য়ে ছেঁড়া বসন দিয়ে আপনাকে আড়াল করতে চায়। হঠাৎ চোখ পড়ে সামনে মাটিতে শুক্‌নো পাতার নীচে একটা ডিম্বাকৃতি ছোট ঝুড়ি···। হলদে পাতা নয়, নয় সোনালী; রজতের মত, বার্চের কাণ্ডের মত শুভ্র, সূক্ষ্মতম, শুভ্রতম বস্ত্র দিয়ে ঢাকা। উৎসুক দৃষ্টিতে ঝুড়িটার পাশে ঝুঁকে বসে পড়ে ও। বস্ত্র খানি নড়ে। আনেৎ-এর বুক দোলে। হাত বাড়িয়ে দেয়···বুক দোলে···দোলে···কেন দোলে?···আনেৎ জানেনা···জানেনা···বোঝে না···

দিন যায়, সপ্তাহ যায়; আনেৎ ব'সে ব'সে এই মহা-বিশ্বের কথা ভাবে···।

'প্রেম, এ কি তুমি! যেদিন দু'হাত মেলে তোমায় আমি ধরতে গিয়েছিলেম, তুমি পালিয়েছিলে। এইবারে ধরেছি তোমায়, আর ছাড়ব না, ছাড়ব না। আর পালিয়ে যেতে পারবে না। ওগো ছোট্ট বন্দী আমার! এই এই আমার দেহের বাঁধনে তোমায় বন্দী করলাম আমি। নাও, প্রতিশোধ নাও, আমায় গ্রাস কর! গ্রাস কর আমায়, আমার প্রাণ-মূলকে নিঃশেষে শোষণ কর। আমার শোণিতে তোমার দেহ পুষ্ট হোক! তুমিই তো আমি, তুমি আমার স্বপ্ন। বাইরের পৃথিবীতে তোমায় খুঁজে পাইনি আমি···তাই আমারই মাংস আর শোণিতে তোমায় আমি রচনা করেছি···। আজ তাই তোমায় আমি পেয়েছি, ওগো প্রেম! আমি তো সেই—সেই পরম প্রিয় যাকে আমি ভালোবাসি···'